Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বাংলায় বাম আন্দোলনের বিতর্কিত অধ্যায়

লাল রাজনীতি

সরদার আবদুর রহমান

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

@PDF বইয়ের সমাহার

বাংলায় বাম আন্দোলনের বিতর্কিত অধ্যায়

লাল রাজনীতি

সরদার আবদুর রহমান

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশন্স

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

@PDF বইয়ের সমাহার

প্রকাশকের কথা

দীর্ঘকাল ধরেই বাংলা অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাস নানা ঘাত-প্রতিঘাত, চড়াই-উতরাই আর রদবদলের মধ্য দিয়ে গেছে। বিশেষত ব্রিটিশ উপনিবেশকালে এ অঞ্চলে রাজনৈতিক আন্দোলন ও দল-উপদলের তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো। সেইসব লড়াই, সংগ্রাম ও তৎপরতার একটি উল্লেখযোগ্য জায়গা দখল করে ছিল বামপন্থি আন্দোলন।

স্বরাজ আন্দোলনের সিলসিলায় শুরু হলেও বাংলায় বাম আন্দোলন ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয়েছে শহর থেকে দুর্গম পাহাড়ি পল্লিতে, উদারপন্থা থেকে চূড়ান্ত উগ্রবাদী ধারায়। পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বামপন্থি তরুণদের প্রত্যক্ষ মদতে দানা বেঁধে উঠেছে রক্তক্ষয়ী কৃষকবিদ্রোহ, বিপ্লবের স্লোগান তুলে কায়েম করা হয়েছে দখল আর লুটতরাজের লাগামহীন ত্রাসের শাসন। কখনো স্বরাজ, কখনো তেভাগা, কখনো-বা নকশালবাড়ি আন্দোলন—ইতিহাসের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে ত্রাসের মশাল হাতে এগিয়ে এসেছে 'অনুশীলন', 'যুগান্তর'-এর মতো অসংখ্য গেরিলা সংগঠন।

কমিউনিস্ট বিপ্লব আর সমান রুটির লোভনীয় আশ্বাসে কলেজপড়ুয়া অজস্র তরুণ অবলীলায় জীবন বাজি রেখেছে, লাঙল-কোদাল-খন্তি ফেলে রাইফেল হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সহজ-সরল গ্রামের কৃষক। অরবিন্দ ঘোষ, ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী, ইলা মিত্র, চারু মজুমদার, সূর্যসেনের মতো বামপন্থিদের পূজনীয় নায়কেরা মুক্তির জয়গান আর সাম্যের জয়ভেরি বাজিয়ে অস্ত্রের মুখে সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছে, থানা লুট করেছে, সুযোগ পেলেই নেমে পড়েছে শ্রেণিশত্রু খতমের 'নির্দোষ ও জরুরি' কর্মে।

৪৭ ও ৭১-এর দু-দুটি স্বাধীনতার পর বামপন্থার সেই 'কর্মমুখর' সুদিন আজ আর নেই। পার্টিগুলো তাদের জৌলস হারিয়ে মৃতপ্রায়, নেতারা যোগ দিয়েছে ডানপন্থি বুর্জোয়া শিবিরে। হতাশা, ধরপাকড়, জেল-জুলুম, অন্তঃকোন্দল, বিভক্তি আর বিশৃঙ্খলায় বাম রাজনীতির হাড় জিরজিরে দেহ আজ খোদ জন্মভূমিতেই ব্রাত্য। এতসব ক্ষয়ের মাঝে সাম্যের স্বপ্ন, বিপ্লব নিশ্চয়ই আছে—তবে সেটা নিরাভরণ নস্টালজিয়ায়। বাংলায় বাম রাজনীতির ইতিহাস দীর্ঘ উত্থান ও আকস্মিক পতনের; যেন আবেগ, উত্তেজনা আর ত্রাসের রোমাঞ্চে ঠাসা রক্তমাখা জীর্ণ ত্রিশূল।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

@PDF বইয়ের সমাহার

বাংলায় বাম আন্দোলনের ঘটনাবহুল ও বিতর্কিত এই অধ্যায় দারুণ নিষ্ঠায় মলাটবদ্ধ করেছেন বিশিষ্ট গবেষক সরদার আবদুর রহমান। তার *লাল রাজনীতি* বইটি একাধারে বাংলায় কমিউনিস্ট রাজনীতির সুপাঠ্য আলেখ্য এবং বাম তৎপরতার প্রামাণ্য দলিল। বইটি প্রকাশ করতে পেরে গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স আনন্দিত ও উচ্ছ্বসিত। সম্মানিত লেখক ও বইটি নির্মাণ প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, তাদের কারণেই আজ এই গুরুত্বপূর্ণ বইটি আলোর মুখ দেখল। যথেষ্ট সাবধানতা সত্ত্বেও বইটিতে কিছু ভুল থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পাঠক এ ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আমরা তা শুধরে নেওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব। সবাইকে আন্তরিক মুবারকবাদ।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
১২ জুন, ২০২৩

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রাক-কথন

বিংশ শতাব্দীর পুরোটা সময়জুড়ে বিশ্বের একটা বিপুল অংশের জনগোষ্ঠীকে প্রায় মোহাচ্ছন্ন করে রাখে যে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক মতাদর্শ, তার সাধারণ নাম 'সমাজতন্ত্র'। তবে এটি কমিউনিজম ও সোশ্যালিজম নামেও পরিচিত। একই সঙ্গে বিশ্বব্যাপী এটি 'বামপন্থা' নামে পরিচিতি পায়। এর কিছুটা ধাক্কা লাগে ভারতে এবং সেইসঙ্গে বাংলা ভূখণ্ডে। এই মতাদর্শের রূপ-স্বরূপ যেমন বিপুল বিতর্ক তৈরি করে, তেমনই এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়েও মতভেদের শেষ ছিল না। এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, সমাজতন্ত্র তথা বামপন্থা তার যৌবনের সময়গুলোতে বিপুলসংখ্যক মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এমনকি এই মতবাদের ভিত্তিতে কিছুসংখ্যক রাষ্ট্রও পরিচালিত হয়। বাংলা অঞ্চলের এই মতবাদের অনুসারীদের একটি অংশ যে গণতান্ত্রিক বা শান্তিপূর্ণ উপায়ে কর্মতৎপরতা চালাতে আগ্রহী ছিল সেটা সত্য, তবে মূলধারার বামপন্থিরা প্রধানত সশস্ত্র সন্ত্রাসের পথেই তাদের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে মনোযোগী ছিল।

ইতিহাসের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, এ দেশে সশস্ত্র পথ ও পদ্ধতির প্রথম প্রয়োগ করে স্বদেশিরা এবং এরই ধারাবাহিকতায় রাজনৈতিক মতবাদ প্রতিষ্ঠার কৌশল প্রবর্তন করে বামপন্থিরা। এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়বস্তু এই মতবাদ বা তন্ত্রের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়েই আবর্তিত হয়েছে। আর এই প্রক্রিয়া হলো 'সশস্ত্র' পন্থা। অর্থাৎ, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অস্ত্রের জোরে এর জন্য পথ করে দেওয়া। ফলে চলতি সময়ে যাকে জঙ্গি, চরমপন্থি, উগ্রবাদী, সন্ত্রাসবাদী প্রভৃতি নেতিবাচক শব্দ দিয়ে উল্লেখ করা হয়ে থাকে—এসবই এই সশস্ত্রপন্থার শামিল।

বাংলা-ভারতে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা উৎখাতের জন্য একটি অংশ স্বদেশি নামে যে জঙ্গি ও সশস্ত্র পথ অবলম্বন করে, তারই ধারাবাহিকতায় এবং প্রক্রিয়া-পদ্ধতিসমূহ ধারণ করেই বামপন্থার বাস্তবায়নেও অগ্রসর হতে দেখা যায় এর নীতিনির্ধারক ও কর্মীদের। ফলে রাইফেল-বন্দুক, পিস্তল-রিভলবার, গুলি-বোমা, ছুরি-চাকু প্রভৃতি হয়ে ওঠে অসংখ্য মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের ভাগ্যনির্ধারক।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ব্রিটিশ আমলে যে সশস্ত্র কর্মতৎপরতা স্বরাজপন্থিদের মাধ্যমে পরিচালিত হতো, সেটিই বাংলাদেশে বামপন্থিদের একটি অংশের প্রধান মাধ্যম হয়ে ওঠে।

পর্যালোচনায় দেখা যায়, সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজম প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ও উৎসাহী দল বা গোষ্ঠীগুলো বহুধা বিভক্ত হলেও এর মূল সূত্র ও চেতনা একই—একটি শ্রেণিহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা; যদিও এর সম্ভাব্যতা নিয়ে হতাশাও বিদ্যমান। বহু গ্রুপ ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত নেতা-কর্মী-সমর্থকরা এর আদর্শিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পাশাপাশি প্রক্রিয়া-কৌশল নিয়ে পরস্পরবিরোধী অবস্থানে থেকে লড়াই চালিয়ে গেছে। বিশেষ করে বাংলা অঞ্চলে এই অবস্থান এতটাই তীব্র হয়ে পড়ে যে, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্মঘাত তাদের অস্তিত্বই বিপন্ন করে ফেলেছে।

এই সশস্ত্র তৎপরতা চালানোর পেছনের চালিকাশক্তি হিসেবে ইতিহাসে যাদের নাম চিহ্নিত হয়ে এসেছে, তারা শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক আপস ও ভাগাভাগির মাধ্যমে নিরাপদ থাকতে পেরেছেন। তবে এর নির্মম বলি হয়েছে কেবল মাঠের কর্মীরা। এর বেশির ভাগ নেতৃত্ব শুধু টিকেই যাননি, রীতিমতো পুরস্কৃত হয়েছেন। রাজনীতির পথরেখাও তারা নির্ধারণ করে দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। বামপন্থা নিয়ে যে বিপুল গ্রন্থ ও সাহিত্য রচিত হয়েছে, তাতে এসব নেতিবাচক কর্মকাণ্ডকে 'মহান' এবং 'বীরত্বগাথা' হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। হত্যা-রাহাজানি, খুনোখুনি, বোমাবাজি-বন্দুকবাজিকে নিন্দা করা হয়েছে খুবই কম।

কিছু বাম বুদ্ধিজীবী ও লেখকের রচনায় সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ ও নষ্ট রাজনীতি মেরামতের উপদেশ ও পরামর্শমূলক বাণী প্রচার করতে দেখা যায়। দেখে মনে হয়, অন্য কোনো গ্রহ থেকে কেউ এসে এই সন্ত্রাসী ও নষ্ট কর্মকাণ্ড চালিয়ে গেছে। এসব যে মূলত বাম-রাজনীতিরই অবদান, সে কথা তারা ভুলিয়ে দিতে চান। সশস্ত্রপন্থার সমর্থক বামপন্থিদের অনেকেই এই লাইনে ব্যর্থ হয়ে এর সমালোচনা শুরু করেন এবং এর সংশোধনের পক্ষে বক্তব্য দিতে থাকেন।

এই গ্রন্থে বামপন্থার সফলতা-বিফলতা বিচার কিংবা এ বিষয়ে ব্যাপক পর্যালোচনা করার কোনো লক্ষ্য ছিল না। বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ, উগ্রপন্থা ও সন্ত্রাসবাদ গত দুই দশকজুড়ে এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতেও বিশেষভাবে আলোচিত। তবে এর সঙ্গে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের বিষয়ও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাই এই জঙ্গি ও উগ্রপন্থার অতীত সন্ধান করার বিষয়টি মাথায় আসে। তাতে যে ভয়াবহ চিত্র উঠে আসে, সেগুলো একত্রিত করে পরিবেশন করাই এই গ্রন্থের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। গ্রন্থের পরিধি নয়, সুসংবদ্ধ তথ্যই এর মূল প্রতিপাদ্য হয়ে ওঠে। বিশেষ ব্যক্তি বা দলের কর্মকাণ্ড নয়; বামপন্থার মতাদর্শ

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রতিষ্ঠায় যে বা যারা এই নেতিবাচক কর্মতৎপরতা চালিয়েছে, অনিবার্যভাবে তাদের প্রসঙ্গই এখানে উঠে এসেছে।

বামপন্থাবিষয়ক গ্রন্থাদি দুই বাংলায় খুবই অপ্রতুল। তবে গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে একাধিক বাম রাজনৈতিক মহলের কর্মকাণ্ড বিচার করতে গিয়ে কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এগুলো প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে বিশেষভাবে সহায়ক। এইসব গ্রন্থের উদ্ধৃতি ও তথ্যকে 'লাল রাজনীতি—বাংলায় বাম আন্দোলনের বিতর্কিত অধ্যায়' শিরোনামে গ্রন্থে গুরুত্বের সাথে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া পরিশিষ্টে কয়েকটি সহায়ক প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে।

এই গ্রন্থ রচনায় যাদের সহযোগিতা মিলেছে, তাদের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। এর মধ্যে কবি ও গবেষক ড. ফজলুল হক তুহিন, গল্পকার দেওয়ান মোহাম্মদ শামসুজ্জামান, কবি ও গবেষক এডভোকেট খুরশীদ আলম বাবু প্রমুখের নাম উল্লেখ করতে হয়। এছাড়া প্রত্যেকের প্রতি সবিশেষ কৃতজ্ঞতা। বইটি প্রকাশে এগিয়ে আসায় ঢাকার অভিজাত প্রকাশনী গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্সকে ধন্যবাদ জানাই। বইটি পাঠকমহলে বিশেষভাবে সমাদৃত হবে বলে আমরা আশাবাদী।

সরদার আবদুর রহমান
জানুয়ারি, ২০২৩

@PDF বইয়ের সমাহার

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভূমিকা

১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের রুশ বা বলশেভিক বিপ্লব ছিল মূলত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। এই বিপ্লবের মূল স্লোগানসমূহ ছিল—'শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের লড়াই', 'ধনিকশ্রেণির বিরুদ্ধে সর্বহারার লড়াই', 'পুঁজিপতির বিরুদ্ধে পুঁজিহীনের লড়াই' প্রভৃতি। এই বিপ্লব সমাজতন্ত্রকে একটি মতাদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে পুরো পৃথিবীতে পরবর্তী প্রায় শতবর্ষব্যাপী একটা আলোড়ন তুলতে সমর্থ হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটি টিকে থাকতে পারেনি। কারণ, সমাজতন্ত্রের মূল চেতনা যেমন বহুবিধ মতভেদের কারণে বিভক্তির শিকার হয়, তেমনই এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া-পদ্ধতি নিয়ে মতভেদও অনুসারীদেরকে খণ্ডবিখণ্ড করে দেয়। ফলে প্রায় সারা পৃথিবীতে এটি তার গৌরব হারিয়ে ফেলে।

গবেষণাসূত্রে দেখা যায়, বাম রাজনীতির স্রষ্টা হচ্ছেন দুই জার্মান মনীষী কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস। তাদের চিন্তাধারা সাধারণভাবে মার্কসবাদ নামে এবং মার্কসবাদের অনুসারীগণ কমিউনিস্ট নামে পরিচিত। নানা পরিচয় ও অবয়বে উপমহাদেশের রাজনীতিতে সক্রিয় থেকে কমিউনিস্টগণ যে রাজনৈতিক ধারার জন্ম দিয়েছেন, তা বাম রাজনীতি নামে পরিচিত। অর্থাৎ, সাধারণ অর্থে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার নীতিতে বিশ্বাসীদের বামপন্থি বলা হয়। তবে কমিউনিস্টদের এক বিরাট অংশ পরবর্তীকালে মাও সেতুং-এর চিন্তাধারাকে বিশেষভাবে অনুসরণ করেছে। গণতন্ত্রের অনুসারীগণ যেমন গণতন্ত্রী এবং সমাজতন্ত্রের অনুসারীগণ যেমন সমাজতন্ত্রী নামে পরিচিত, বামপন্থিদের বোঝাতে তেমন সুনির্দিষ্ট কোনো অভিধা নেই। তবে এ কথা সত্য যে, বামপন্থি শব্দটি রাজনৈতিক অবস্থানজ্ঞাপক শব্দ।

এই মতাদর্শ আজ মোটাদাগে 'বামপন্থা' ও 'বামপন্থি' অভিধায় পরিচিত। বলতে দ্বিধা নেই, এই মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা ও প্রচার হয়তো গরিবের কল্যাণচিন্তা করেই অগ্রসর হয়েছিল। কালের আবর্তনে রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতিতে এর কিছু প্রভাব প্রতিষ্ঠাও পেয়েছে। তবে 'প্রগতিশীলতা'র আবরণে সমকালে এর মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়াও লক্ষ করা যায়। কোনো কোনো রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠানের ভেতরে তার প্রভাব বিদ্যমান। মানুষের সাধারণ কিছু আবেগ,

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চিন্তাচেতনা ও মূল্যবোধের দিকগুলোকে অস্বীকার করে এটি এগিয়ে যেতে চেয়েছিল। ফলত মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেতে এটি ব্যর্থ হয়। তবে পৃথিবীর কিছু কিছু অংশে যে এটি এখনও কিছুসংখ্যক মানুষের মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, এ কথা অস্বীকার করার জো নেই।

ভারত উপমহাদেশে বাম মতবাদ প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ার ওপর প্রভাব ফেলে পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভারতে ব্রিটিশ-তোষণ বনাম ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব, মস্কো বনাম পিকিং মনস্তাত্ত্বিক লড়াই ও বিভাজন, স্বাধীনতার জন্য পরপর দুটি সংগ্রাম প্রভৃতি। এসব ঘটনা বাম আন্দোলনের মোড় বদলে সাহায্য করে। এই মোড় বদল কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংগঠনগুলোকে পরস্পরবিরোধী অবস্থান গ্রহণের দিকে ঠেলে দেয়। এসব টানাপোড়েনের মধ্যেই এই বামপন্থি আন্দোলনকে গণতান্ত্রিক ও স্বাভাবিক প্রক্রিয়া-পদ্ধতির চেয়ে গোপন ও সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ডের প্রতি ঝুঁকে পড়তে দেখা যায়। শুরুর দিকে ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের ধারা গ্রহণ করে 'স্বদেশি' নামক আন্দোলন। পরবর্তীকালে এই পদ্ধতি লুফে নিয়ে এর সঙ্গে একাকার হয়ে যায় বামপন্থি সংগঠনগুলো। যদিও স্বদেশিদের ভাবধারা ছিল ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক, কিন্তু বামপন্থিরা এই স্বদেশি আন্দোলনকর্মীদেরই নিজেদের হিরো হিসেবে বরণ করে নেয়। তাদের কর্মতৎপরতাকে 'বিপ্লবী' আখ্যা দিয়ে স্বদেশি নির্যাস আত্মস্থ করতে থাকে। এক পর্যায়ে এটি 'লাল রাজনীতি' থেকে 'লাল সন্ত্রাস' এবং 'বাম রাজনীতি' থেকে 'বাম সন্ত্রাস' নামে পরিচিত হতে থাকে।

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ জুন ঢাকায় বিরোধীদের দ্বারা কমিউনিস্ট পার্টির এক জনসভা পণ্ড হওয়ার অজুহাতে পার্টি প্রকাশ্য রাজনীতির পথ পরিহার করে। এরপর গোপনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির গৃহীত রনদীভের নীতি অনুযায়ী শুরু করে সশস্ত্র সংগ্রাম। মনি সিংহের নেতৃত্বে ময়মনসিংহের দুর্গাপুর অঞ্চলে টংক-বিরোধী আন্দোলন, ইলা মিত্রের নেতৃত্বে রাজশাহীর নাচোল অঞ্চলে, সুব্রত পালের নেতৃত্বে সিলেটের সানেশ্বর এলাকার কৃষক বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। এ ছাড়াও যশোর ও খুলনা জেলার কোনো কোনো অঞ্চলে কৃষকদের জোতদারবিরোধী সশস্ত্র আন্দোলন পরিচালিত হয় কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে। ময়মনসিংহের টংক আন্দোলন এবং নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ ছিল অপেক্ষাকৃত ব্যাপক ও অধিক সংগঠিত। এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক, এসব কৃষক বিদ্রোহ সংগঠিত করা হয় মূলত উপজাতি ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ব্যবহার করে। মুসলমান কৃষকদের মধ্যে এসব বিদ্রোহ তেমন কোনো সাড়া জাগাতে পারেনি; বরং মুসলমানরা কমিউনিস্টদের 'দেশদ্রোহী' এবং 'নাস্তিক' ভেবে শত্রু জ্ঞান করত।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাত্র এক বছরের মধ্যে ভারতীয় পার্টির অনুকরণে কমিউনিস্টদের সশস্ত্র কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার এ নীতি গ্রহণ ছিল প্রকৃতপক্ষে হঠকারিতার নামান্তর। ফলে কমিউনিস্টরা ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কাছে হয়ে উঠেছিল অগ্রহণযোগ্য।

এই ধারায় প্রবেশের জন্য 'রণদীভের তত্ত্ব' কাজে লাগানো হয় এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এর প্রথম প্রয়োগ ঘটায় কমিউনিস্ট পার্টি। চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল নামক জনপদে তাদের একটি আক্রমণেই চাকরিরত চারজন পুলিশ সদস্যকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। পঞ্চাশ দশকের সদ্য স্বাধীন একটি দেশে এই ঘটনাকে সহজভাবে গ্রহণ করা হয়নি। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টি আরও কিছু সশস্ত্র ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটায়। তাদের পরিচালিত আন্দোলনসমূহ প্রধানত সশস্ত্র ধারায় পরিচালিত হয়। পরবর্তীকালে তারা এই ধারা পরিত্যাগ করে এবং প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাঁধে সওয়ার হয়ে নিজেদের লক্ষ্য হাসিলে সচেষ্ট হয়। দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে পুলিশ হত্যাসহ এ রকম সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রথম প্রবর্তনকারী হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টির নাম ইতিহাসে লেখা হয়ে গেছে।

তৎকালীন পাকিস্তানের রাজনীতিতে যতগুলো বাম মনোভাবাপন্ন সংগঠন গড়ে উঠেছে, এর সবগুলোর পেছনেই কোনো না কোনোভাবে কমিউনিস্টদের হাত কাজ করেছে। ফলে বাম মতবাদ প্রতিষ্ঠায় যত প্রাণ অযথাই এবং অকালে ঝরেছে, তার দায় কমিউনিস্ট পার্টিকে যে বহন করতে হবে—এ কথা অস্বীকারের উপায় নেই। অন্য ধারার বামপন্থি দলের বড়ো অংশ প্রকাশ্য ও স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার বদলে গোপন ও সশস্ত্র পন্থাকেই অব্যাহত রাখে। ক্ষমতা দখলের জন্য তারা শ্রেণিশত্রু খতম, গলা কাটার রাজনীতি, জমি ও গোলার ফসল লুট, পুলিশ ও জনপ্রতিনিধিদের হত্যা, থানা ও ফাঁড়িতে হামলা করে অস্ত্র ও গোলাবারুদ লুট, ঘরে বসে বোমা বানানো, ব্যাংক ও ট্রেজারি লুট, দূতাবাসে আক্রমণ, সেনানিবাস ও সেনাক্যাম্পে অফিসারদের ধরে ধরে হত্যা করা প্রভৃতি সকল প্রকার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের রোমহর্ষক নজির স্থাপন করে। সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়েই এ সকল তৎপরতা পরিচালিত হয়, যার হাজার হাজার উদাহরণ ইতিহাসের পাতায় রক্ষিত আছে।

ব্রিটিশ তাড়ানোর সশস্ত্র আন্দোলন হোক অথবা পাকিস্তানের শাসনকালে পুলিশ মারার আন্দোলন—এগুলোকে জনগণের মুক্তির আন্দোলন বলে একটা কৈফিয়ত দেওয়ার সুযোগ আছে। এসব আন্দোলনে হতাহতদের শহিদ কিংবা গাজি অথবা মহান সৈনিক, জাতীয় বীর ইত্যাদি উপাধিও দেওয়া যেতে পারে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তবে সাধারণ মানুষ এসব তকমা কখনোই গ্রহণ করেনি। যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি ছাড়া সশস্ত্র পথ-পদ্ধতি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হয় না। পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামেও বামপন্থিরা ঐকমত্য প্রকাশ করার বদলে দ্বিধাবিভক্ত ছিল। তাদের একটি অংশ সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়, একটি অংশ একইসঙ্গে পাকিস্তানি বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং অপর একটি অংশ সরাসরি পাক বাহিনীকে সহযোগিতা করে। এটিও ইতিহাসের এক নিরেট সত্য।

দীর্ঘ চার দশকেরও বেশি সময় পর 'গলা কাটা রাজনীতি'র অনুসারী অনেকের ভেতরেই অনুশোচনার সৃষ্টি হয় এবং এ বিষয়ে বহু আলোচনা-পর্যালোচনার পালা অতিক্রান্ত হয়। কিন্তু তাতে কোনো সমাধান হয়নি। এই দীর্ঘ অরাজকতার আবহে রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতিতে যে গভীর ক্ষত তৈরি হয়েছিল, তার মেরামত আজও সম্ভব হয়নি। এসবের দায়ও কেউ স্বীকার করেনি; বরং সেই সময়ের সৈনিকদের মহান বিপ্লবী অভিধায় আখ্যায়িত করার প্রবণতা এখনও বিদ্যমান। বামমহল থেকে হয়ত বলা হবে, নষ্ট রাজনীতি ও প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থার বিপরীতে এই রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার বিকল্প ছিল না। সেক্ষেত্রে যে কেউ এই আদলে কার্যক্রম চালিয়ে একই কৈফিয়ত দিলে তাদেরও তো দোষ দেওয়ার উপায় থাকে না।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে কমিউনিস্ট ও বামপন্থিদের একটা ভূমিকা আছে। একে খাটো করে দেখারও অবকাশ নেই। তবে বামপন্থিদের বিষয়ে তাদের নিজেদেরই মূল্যায়ন এ রকম যে, কমিউনিস্ট ও বামপন্থিরা বাংলাদেশের মাটি ও মানুষ থেকে দূরে থেকেছেন। কথাটির ব্যাপক অর্থ এই—তারা এ দেশের ইতিহাস, সমাজ-সংস্কৃতি অনুধাবন করার চেষ্টা করেননি কখনো। জাতীয় ইতিহাস, জাতীয় অর্থনীতি, জাতীয় সংস্কৃতি নিয়ে তারা কখনো ভাবেননি। যে সমাজকে বদলাব তাকে জানব না, এটা তো হতে পারে না। অথচ যুগের পর যুগ তারা সেই পথেই হেঁটেছেন। ক্রমাগত বিভক্ত হয়েছেন, সংকীর্ণতায় ভুগেছেন আর বর্তমানে বুর্জোয়াদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে চলেছেন। মোটকথা, তারা বহুলাংশেই জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন। এই অবস্থা থেকে সহসাই তারা নিজেদের উত্তরণ ঘটাতে পারবেন—এমনটাও মনে হয় না।

বামপন্থি ঘরানায় কিছু নিজস্ব পরিভাষা চালু আছে, যেগুলো সম্পর্কে খুব সীমিতসংখ্যক মানুষই ধারণা রাখে। তারা এসবের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাও জানে না। ফলে এত বছরেও সাধারণ মানুষের কাছে এগুলোর কোনো আবেদনও সৃষ্টি হয়নি। কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি বলে পরিচিত যেসব মানুষের পক্ষে দাবি

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বা স্লোগান উচ্চারিত হয়, সেগুলো নিছক কিছু সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা আর বড়োজোর মালিকের পকেট ফেঁড়ে কিছু আদায় করে নেওয়ার মধ্যেই সীমিত থাকে। তবে বাম সংগঠকদের একটা কৃতিত্ব হলো—এই আন্দোলনে তারা তারুণ্যকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিল। বহু মেধাবী তরুণ এতে শামিল হয়েছিল। এখনও এর সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষদের নিজেদের মেধাবী বলে তৃপ্ত হতে দেখা যায়। কিন্তু যে তত্ত্ব সাধারণ মানুষের হয়ে উঠতে পারে না; যে মতবাদের অনুসারীরা ঘৃণা, বর্ণবাদী মনোভাব এবং অস্পৃশ্যতার ছুৎমার্গ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না, তাদের কর্মকাণ্ড বৃহত্তর পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা পাবে—সে আশার গুড়ে বালি।

কোনো কোনো বামপন্থি রাজনীতিবিদও স্বীকার করেন—'অহংকার' বামপন্থি সুনামের ক্ষতি করেছে এবং বামপন্থি রাজনীতিবিদদের জনগণ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশেও বহু বামপন্থিদের নাস্তিক পরিচিতি রয়েছে, যার দরুন তাদের পক্ষে তৃণমূল স্তরে শক্তিশালী নেটওয়ার্ক এবং একটি স্থিতিশীল নির্বাচনি এলাকা তৈরি করা কঠিন হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া প্রায়শই আপাত বামপন্থিদের মধ্যে স্থান করে নেয় সুবিধাবাদ। এর ফলে বামপন্থি নেতারাও ক্ষমতার টোপ গিলে ফেলেন অবলীলাক্রমে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশের সার্বিক বামপন্থি আন্দোলন। এ সমস্ত কারণে আজ থেকে প্রায় শতাব্দীকাল আগে চর্চা শুরু হলেও এতদঞ্চলে বামপন্থি রাজনীতির অন্তর্নিহিত সংকট কমেনি; বরং ক্ষেত্রবিশেষে তা গাঢ় হয়েছে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর ষাটের দশকে এসে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনে নতুন নতুন উপাদান যুক্ত হয়। একপর্যায়ে দলীয় কোন্দল ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভেদ এ দেশের আন্দোলনেও ছেদ সৃষ্টি করে, যার প্রভাব স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে ১৯৬৬ সালের শেষ দিকে। এরপর কমিউনিস্ট পার্টি খণ্ডবিখণ্ডিত হয়েছে বছরের পর বছর ধরে। অবশ্য আশির দশকে ঐক্য আন্দোলনেরও সূত্রপাত হয়। তবে ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন কমিউনিস্ট আন্দোলনে চূড়ান্ত বিপর্যয় ঘটায়।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

@PDF বইয়ের সমাহার

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

বামপন্থার আদর্শিক ও রাজনৈতিক পরিচয় ২০
বাম-সংশ্লিষ্ট শব্দ ও পরিভাষা ২৩
সন্ত্রাসবাদ ও চরমপন্থা সম্পর্কে ২৮
উপমহাদেশে লাল রাজনীতির উত্থান ৩০

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বরাজ এবং বাম সন্ত্রাস ৩৮
পূর্ববঙ্গে সন্ত্রাসের বিস্তার ৪৮
স্বদেশি থেকে বামে মোড় ৫৯

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলায় সেভিয়েতপন্থি কমিউনিস্টদের সন্ত্রাস ৭০
রণদীভ লাইনের সম্প্রসারণ ৭৫
কমিউনিস্টদের সশস্ত্র বাহিনী ৮০

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশ পর্বে বামপন্থি ধারা ৯৩
বাংলাদেশে তৎপরতা ১০০
শ্রেণিসংগ্রাম ও গেরিলা যুদ্ধ ১০৪
অন্তকোন্দল ও হানাহানি ১১০

পঞ্চম অধ্যায়

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ও গণবাহিনীর উত্থান ১২৫
গণবাহিনীর সন্ত্রাস ১৩০
পারস্পরিক সংঘাতের বলি ১৪৫

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাম হঠকারিতার পর্যালোচনা ১৪৯
বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙ্গন ১৫৬
উপসংহার ১৫৯

পরিশিষ্ট

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোল সম্পর্কে একটি বিদ্রোহ ১৬৩
বাংলাদেশের বাম রাজনৈতিক দলের পরিচয় ১৬৮
বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টির তালিকা ১৭২
গ্রন্থ ও তথ্যপঞ্জি ১৭৮
১৮০

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রথম অধ্যায়

@PDF বইয়ের সমাহার

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বামপন্থার আদর্শিক ও রাজনৈতিক পরিচয়

বামপন্থি শব্দটি আধুনিক কালের সচেতন মানুষদের নিকট বহুল পরিচিত। সাধারণভাবে সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজমে বিশ্বাসী ও অনুশীলনকারীদের 'বামপন্থি' অভিধায় উল্লেখ করা হয়ে থাকে। একে 'সাম্যবাদ' হিসেবেও পরিচিত করানো হয়ে থাকে। বাংলায় 'লাল রাজনীতি' বলতে বামপন্থি নীতি, আদর্শ ও রাজনীতির লালনকারীদের দ্বারা সৃষ্ট সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ডকেই বোঝানো হয়েছে। এই অধ্যায়ে 'বাম' শব্দের উৎপত্তি, সন্ত্রাসবাদ ও উগ্রবাদের পরিচয়, ভারতে বামপন্থার আগমন এবং লাল রাজনীতি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে।

'বাম' শব্দের উৎপত্তি

১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসি বিপ্লবের সময় বিশেষ অর্থে ইংরেজি left শব্দের উৎপত্তি হয়। তখন পার্লামেন্টের ডান দিকে বসত শাসকদল এবং সভাপতির বাম পাশের আসনগুলোয় বসত বিরোধী দল। বাম দিকে বসার জন্য তাদের বলা হতো বামপন্থি বা লেফটিস্ট। পরবর্তীকালে ফ্রান্সের অনুকরণে অন্যান্য দেশের আইনসভাতেও বিরোধী দলের বাম দিকে বসার রীতি চালু হয়।[১২] কালের ধারাক্রমে সমাজতন্ত্রীদেরই এখন সাধারণভাবে বামপন্থি বলা হয়। মহিউদ্দিন আহমদ বাম রাজনীতির পরিচয় দিয়েছেন এভাবে—

> 'বিদ্যমান রাজনৈতিক পদ্ধতি ও শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের মতাদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিচালিত এটি একটি রাজনৈতিক উদ্যোগ। সাধারণভাবে এ উদ্যোগটি হলো প্রয়োজনে চরমপন্থা অবলম্বন করে

---

[১] হারুনুর রশিদ : *রাজনীতিকোষ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ২৬৯।

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, আইনগত ও অর্থনৈতিক কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে পরিচালিত একটি রাজনৈতিক আন্দোলন। টমাস পেইন (১৭৩২-১৮০৯), ভলটেয়ার (১৬৪১-১৭৭৮), বেনথাম (১৭৪৮-১৮৩৪), কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) প্রমুখ চিন্তাবিদ আধুনিক বাম ভাবাদর্শিক রাজনীতির প্রবক্তা।'[৩]

কমিউনিজম-এর পরিচয়

গবেষক মুর্শিদা বিনতে রহমান 'কমিউনিজম'-এর পরিচয় দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন—

> 'মানবসভ্যতার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার একটি আদর্শগত রূপ হলো কমিউনিজম। রাষ্ট্রহীন, শ্রেণিহীন, অনাড়ম্বর সর্বোপরি উৎপাদনের ওপর সর্বজনীন মালিকানা প্রতিষ্ঠা হলো কমিউনিস্ট সমাজের মূলভিত্তি। কমিউনিজম Communism শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন শব্দ Commuin থেকে; যার অর্থ ভাগ বা সাধারণ। ইংরেজি কমিউনিজম শব্দটি প্রথম ব্যবহার করা হয় ১৮৪১ সালে এবং সাম্যবাদ শব্দটি ব্যবহৃত হয় ১৮৪৩ সালে। কমিউনিজম-এর ব্যাপক ও সংকীর্ণ অর্থ আছে। ব্যাপকার্থে তা বোঝায় গঠনকে আর সংকীর্ণার্থে গঠনের উচ্চতর পর্যায়কে। এ ধারণা দিয়ে মূলত একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে বোঝানো হয়, যার বিকাশের দুটি স্তর বা পর্যায় রয়েছে। সমাজতন্ত্র হলো এই গঠনের নিম্নতম পর্যায় আর কমিউনিজম হলো উচ্চতর। একটি আদর্শিক উদ্যোগ হিসেবে কমিউনিজম উনিশ ও বিশ শতকে বিভিন্ন মহলকে আকৃষ্ট করে।'[৪]

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র

সমাজতন্ত্রের সাধারণ ধারণা ছাড়াও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রীগণ মনে করেন—

১. কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন : জমি, জল, জঙ্গল প্রভৃতি সৃষ্টি করেনি। সুতরাং সেগুলোর ওপর কোনো ব্যক্তির মালিকানা থাকা উচিত নয়। তাই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বলে—এইসব প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর সকলের সমান অধিকার রয়েছে।

---

[৩] মহিউদ্দিন আহমদ : *বাংলাপিডিয়া* (খণ্ড-৭), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ২৯।

[৪] মুর্শিদা বিনতে রহমান : বাংলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ধারা (১৯৬৬-১৯৯১), পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, ২০১৫-১৬, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২. বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রীগণ সকলের কাজের অধিকার দাবি করে। তারা মনে করে, বেকারদের কাজের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব।

৩. পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় অল্পসংখ্যক মানুষের কাছে বিপুল পরিমাণ অর্থ সম্পদ জমা হয়, ফলে শ্রমিক শ্রেণি থাকে নিঃস্ব ও রিক্ত। তাই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রীরা বলেন, সম্পদের বণ্টনে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে মালিক ও শ্রমিক শ্রেণির বৈষম্যের অবসান ঘটবে।

৪. বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য হলো—উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটানো এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানা স্থাপন করা। এর ফলে পুঁজিবাদ ও উৎপাদন নিয়ে প্রতিযোগিতা ও শোষণের অবসান ঘটবে।

৫. বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রীবাদীরা শ্রেণিহীন, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেন। এরূপ সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার নেতৃত্ব দেবে সর্বহারা শ্রমিকগোষ্ঠী। এভাবে রাষ্ট্রে সর্বহারার একনায়কত্ব স্থাপন হবে।[৫]

@PDF বইয়ের সমাহার

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বাম সংশ্লিষ্ট শব্দ ও পরিভাষা

সমাজতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রী, কমিউনিজম ও কমিউনিস্ট, সাম্যবাদ ও সাম্যবাদী, বুর্জোয়া-সর্বহারা, শ্রেণিশত্রু ও শ্রেণিসংগ্রাম প্রভৃতি শব্দবন্ধসমূহ মূলত বামপন্থি মহলের একান্ত নিজস্ব পরিমণ্ডলে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলো সামগ্রিকভাবে প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য এই তন্ত্রের প্রায় পুরোটা ইতিহাসজুড়ে সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদ, উগ্রবাদ ও চরমপন্থা ইত্যাদি প্রক্রিয়া কার্যকর থেকেছে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, সাধারণভাবে প্রচলিত উদার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই মতবাদের প্রতিষ্ঠা কার্যত অসম্ভব। ফলে নিজেদের সংজ্ঞা অনুযায়ী 'শ্রেণিশত্রু' ও 'বুর্জোয়া' বাছাই করে সন্ত্রাসবাদ, উগ্রবাদ, চরমপন্থা প্রভৃতি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এদের 'নির্মূল' করা এখানে জরুরি কর্ম। এ পর্যায়ে বামপন্থাসংশ্লিষ্ট শব্দ ও পরিভাষাগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উল্লেখ করা হলো, যাতে মূল আলোচনার মধ্যে ব্যবহৃত এসব শব্দ সম্পর্কে পাঠকের সহজ উপলব্ধি ঘটতে পারে।

সাম্যবাদ

সাম্যবাদ সমাজতন্ত্রেরই উচ্চতর একটি পর্যায়। সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সাম্যবাদের পার্থক্য প্রকারগত নয়, বরং মাত্রাগত। সমাজতান্ত্রিক পর্যায়ে যৌথ খামার এবং সমবায়ী মালিকানা উভয়েরই অস্তিত্ব থাকে, কিন্তু সাম্যবাদী পর্যায়ে থাকে একধরনের ব্যবস্থা—রাষ্ট্র বা সমগ্র জনগণের মালিকানা। সমাজতান্ত্রিক পর্যায়ে শ্রমিক এবং যৌথ খামারের কৃষকদের মধ্যে প্রভেদের অস্তিত্ব থেকে যায়, কিন্তু সাম্যবাদী পর্যায়ে তা সম্পূর্ণ লোপ পায়। সাম্যবাদী সমাজে উৎপাদন ও বণ্টনের মূলকথা হলো—'প্রত্যেকে তার সাধ্যানুযায়ী শ্রম দেবে এবং প্রত্যেকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী জীবনধারণের উপকরণ পাবে।' সাম্যবাদী সমাজে অর্থনীতির পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উপরিকাঠামোরও পরিবর্তন ঘটে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাম্যবাদী বিকাশের পর্যায়ে রাজনৈতিক ও আইনগত প্রতিষ্ঠানসমূহের অবলুপ্তি ঘটে। সমগ্র জনগণ সাম্যবাদী জীবনপদ্ধতির কতগুলো সাধারণ ও সর্বজনগ্রাহ্য নিয়ম মেনে চলে।[৬]

সর্বহারা

সমাজতন্ত্রীদের দৃষ্টিতে, যেসব মানুষের নিজেদের কোনো জমি কিংবা উৎপাদনের উপকরণ নেই, যারা বেঁচে থাকার জন্য সারাজীবন মজুরির বিনিময়ে অন্যের সম্পত্তিতে কাজ করে, তারাই হলো সর্বহারা শ্রেণি। মার্কসীয় দৃষ্টিতে মজুরির আয়ে জীবন কাটানো এই শ্রেণির মানুষের অর্থনৈতিক উৎপাদনব্যবস্থায় সাম্য বলে কিছু থাকে না। সর্বহারা মূলত শ্রম বিক্রয়ের ওপর নির্ভরশীল। আর শ্রম যেহেতু কায়িক ব্যাপার, ফলে সর্বহারা শ্রেণি এখানে বুর্জোয়া শ্রেণি দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শোষিত হয়। বুর্জোয়াশক্তির বিরুদ্ধে শ্রেণিসংগ্রাম সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের সর্বাপেক্ষা বড়ো চালিকাশক্তি। কৃষক ও অন্যান্য শোষিত শ্রেণিকে এই সংগ্রামে সর্বহারা শ্রেণি নেতৃত্বদান করে। বর্তমানে সর্বহারা শ্রেণিটি আর আগের মতো 'ভূমিহীন বর্গ' আকারে উপস্থিত নেই। বিশেষত সাবেক ঔপনিবেশিক দেশসমূহে এমন অনেক শিল্প শ্রমিক রয়েছে, যারা গ্রাম থেকে ছিন্নমূল নয়; বরং গ্রামে কারও কারও নিজস্ব বাড়ি ও কমবেশি জোতজমিও রয়েছে।[৭]

সর্বহারার একনায়কত্ব

সমাজতন্ত্রী মতবাদ অনুযায়ী সর্বহারা শ্রেণির আন্দোলনের লক্ষ্য হলো বুর্জোয়া কুসংস্কার, বুর্জোয়া আইন, বুর্জোয়া স্বত্বকে নির্মূল করা। শোষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত আধুনিক বুর্জেয়া ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ করা। বুর্জোয়া রাষ্ট্রশক্তিকে হটিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে সর্বহারা শ্রেণির রাষ্ট্রশক্তি। একনায়কত্ব কথাটির দ্বারা একের ওপর অন্য শ্রেণির আধিপত্য বোঝায়। যেহেতু সর্বহারা শ্রেণি রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পরপরই প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া চক্রের অবসান ঘটে না, সুতরাং শ্রেণি অবসান না হওয়া পর্যন্ত সর্বহারা শ্রেণির একনায়কত্ব অনিবার্য হয়ে পড়ে। সর্বহারা শ্রেণি তার একনায়কত্ব ব্যবহার করে শোষকগোষ্ঠীর বাধাকে প্রতিহত করার জন্য, বিপ্লবের বিজয়কে সুসংহত করার জন্য,

---

[৬] হারুনুর রশীদ : *রাজনীতিকোষ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা; জুলাই, ২০১৩।

[৭] ড. সুলতান মাহমুদ ও বিবি মরিয়ম, *রাজনীতি ও কূটনীতিকোষ*, আলেয়া বুক ডিপো, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৫।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বুর্জোয়াদের পুনরুত্থানের যাবতীয় প্রয়াসকে ব্যাহত করার জন্য এবং আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার চক্রান্তকে বানচাল করার জন্য।[৮]

বুর্জোয়া

শব্দটি ফরাসি। এর শাব্দিক অর্থ মধ্যবিত্ত। সামন্তযুগের শেষ দিকে যখন শিল্পকারখানা ও ব্যাবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটছিল, সমাজে তখন শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের এক নতুন গোষ্ঠী গড়ে উঠতে থাকে। এরা ভূমিদাসদের মতো নিঃস্ব ছিল না; বরং সকলেই ছিল কমবেশি বিত্তশালী। কিন্তু সামন্ত প্রভুদের বিশাল বিত্তের তুনায় এদের সম্পদ ছিল অনেক কম। তাই এদেরকে বলা হতো মধ্যবিত্ত বা বুর্জোয়া। শিল্পবিপ্লব তথা শিল্পে যন্ত্রায়নের ফলে অসংখ্য বৃহদাকার কারখানা গড়ে উঠতে থাকে। ফলে একপর্যায়ে শিল্পপতি, ব্যবসায়ীদের সম্পদ সামন্ত প্রভুদের বিত্তকে ছাড়িয়ে যায়। এমনকি একপর্যায়ে সামন্তবাদী ব্যবস্থাও উচ্ছেদ হয়ে যায়। কিন্তু শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা যত অগাধ সম্পত্তিরই মালিক হোক না কেন, তাদের বুর্জোয়া নামকরণই বহাল থাকে। বর্তমানে বুর্জোয়া বলতে সমগ্র শিল্পপতি-ব্যবসায়ীর গোষ্ঠীকেই বোঝানো হয়।[৯]

বুর্জোয়া একনায়কত্ব

এটা বুর্জোয়া গণতন্ত্রেরই অপর নাম। কেননা, বুর্জোয়া গণতন্ত্র যদিও কাগজে-কলমে বলে যে, এই ব্যবস্থায় যে কেউ পার্লামেন্টে নির্বাচিত হয়ে সদস্য, মন্ত্রী, এমনকি সরকারপ্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত হতে পারে; কিন্তু কার্যত সমস্ত ব্যবস্থা এমনভাবে বিন্যাস করা থাকে যে, তাতে পুঁজিপতি শ্রেণি বা তাদের প্রতিভূ ছাড়া অপর কেউ কখনোই নির্বাচিত হতে পারে না। জনগণের নামে, জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে পুঁজিপতি ও তাদের প্রতিভূরা স্বীয় শ্রেণিস্বার্থেই কাজ করে এবং একচ্ছত্র শোষণ অব্যাহত রাখে।[১০]

বুর্জোয়া দালাল

যে সমস্ত বুর্জোয়া বা পুঁজিপতি বিদেশি উৎপাদক ও স্বার্থের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে এবং কমিশন বা প্রিমিয়ামপ্রাপ্তির মাধ্যমে সম্পদশালী হয়, তাদের বলে দালাল বুর্জোয়া। দালাল বুর্জোয়ারা তাদের নিজ দেশের শিল্পকারখানার

---

[৮] প্রাগুক্ত।

[৯] হারুনুর রশীদ : *রাজনীতিকোষ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা: জুলাই, ২০১৩।

[১০] প্রাগুক্ত।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিকাশ হোক এবং বিদেশি পণ্যের আমদানি খর্ব হোক, তা কখনোই চায় না। কারণ, যে সকল পণ্যের তারা দালাল, সেসব দেশেই উৎপাদিত হতে শুরু করলে তাদের দালালি বা কমিশনের সুযোগ বন্ধ হয়ে যাবে। তাই দালাল বুর্জোয়ারা সব সময় জাতীয় শিল্পায়ন তথা জাতীয় অর্থনৈতিক বিকাশের অন্তরায় হিসেবে হাজির থাকে।[১১]

শ্রেণিশত্রু

কোনো সমাজবিপ্লবের পটভূমিতে যারা চূড়ান্ত শোষক ও তাদের দোসর, তাদেরই বলা হয় শ্রেণিশত্রু। শ্রেণিশত্রুকে উৎখাত ও নির্মূল করা ছাড়া সমাজবিপ্লব সম্পাদন করা যায় না। তাই সমাজবিপ্লবের প্রধান কাজ হলো—শ্রেণিশত্রুকে চিহ্নিত করা এবং তাদের নির্মূল করা। এই নির্মূলীকরণ শারীরিক ও সামাজিক দুটোই হতে পারে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে বুর্জোয়ারাই হলো শ্রেণিশত্রু। আবার জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী-উপনিবেশবাদী গোষ্ঠী, তাদের দেশীয় অনুচর এবং সামন্তবাদী গোষ্ঠীকেই শ্রেণিশত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সমাজের বাদবাকি অংশগুলোকে পক্ষে আনা অথবা নিরপেক্ষ রাখাকে বিপ্লবীরা কৌশল হিসেবে গ্রহণ করে।[১২]

শ্রেণিসংগ্রাম

বিরোধী স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণিসমূহের পারস্পরিক সংগ্রামই হলো শ্রেণিসংগ্রাম। অন্য কথায় শোষক ও শোষিতের লড়াইয়ের নাম শ্রেণিসংগ্রাম। দাসসমাজ থেকে পুঁজিবাদী সমাজ পর্যন্ত প্রতিটি শোষণমূলক সমাজের ইতিহাসই মূলত শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস। বস্তুত শোষণমূলক সমাজ পরিবর্তনের মূলেই রয়েছে শ্রেণিসংগ্রাম। পুঁজিবাদী সমাজে সংগ্রাম মূলত বুর্জোয়া শ্রেণির সঙ্গে সর্বহারা শ্রেণির। রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে বুর্জোয়া শ্রেণিকে উৎখাত করে সর্বহারা শ্রেণি কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের মাধ্যমেই পুঁজিবাদী সমাজ তথা শ্রেণিবিভক্ত সমাজব্যবস্থার অবসান ঘটতে পারে। সর্বহারা শ্রেণির পার্টি কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর শ্রেণি-অস্তিত্ব লোপ পাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেলেও, বেশ কিছুদিন পর্যন্ত শ্রেণির অস্তিত্ব টিকে থাকে বিধায় শ্রেণিসংগ্রামও বলবৎ থাকে। তবে শোষকশ্রেণি ক্ষমতায় না থাকায় এ পর্যায়ে শ্রেণিসংগ্রামের রূপও পালটায়।

---

[১১] প্রাগুক্ত।

[১২] প্রাগুক্ত।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

স্ট্যালিনের মতে, সর্বহারা শ্রেণি কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর শ্রেণিসংগ্রামকে বরং তীব্রতর করতে হয়। কিন্তু সংশোধনবাদীদের মতে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর আর শ্রেণিসংগ্রামের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে শ্রেণিসংগ্রামের ক্ষেত্রেও নবতর বৈশিষ্ট্য সংযোজিত হয়েছে। কারণ, উন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহ শ্রেণিসংগ্রামকে ঠেকানোর অন্যতম পন্থা হিসেবে তাদের স্ব-স্ব দেশের শ্রমিকশ্রেণিকে ন্যূনতম জীবনমানের নিশ্চয়তা তো দিচ্ছেই, অনেক ক্ষেত্রে দিচ্ছে বিলাসের সুযোগও। ফলে এই শ্রমিকদের আচরণের ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে ভিন্নতা।[১৩]

@PDF বইয়ের সমাহার

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সন্ত্রাসবাদ ও চরমপন্থা সম্পর্কে

'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব' সাধনের জন্য সন্ত্রাসের ওপর নির্ভরতা যেন পরস্পরের পরিপূরক হয়ে দাঁড়ায়। এই সন্ত্রাসের স্বরূপ কী? সন্ত্রাস বলতে বোঝায় অতিশয় ত্রাস বা ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিপীড়ন, হত্যা প্রভৃতি হিংসাত্মক ও ত্রাসজনক কর্ম অবলম্বন করা উচিত—এই মতবাদে বিশ্বাসীদের সন্ত্রাসবাদী বলা হয়। যে সকল ব্যক্তি সন্ত্রাসবাদে আস্থাশীল এবং তদনুযায়ী কাজ করে, তাদের বলা হয়ে থাকে সন্ত্রাসবাদী।[১৪] অতএব, সন্ত্রাসের অর্থ দাঁড়ায় কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে মানুষের মনে ভীতি সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা। সন্ত্রাসবাদ হলো রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য হত্যা, অত্যাচার ইত্যাদি কার্যনীতি অবলম্বন। আর সন্ত্রাসবাদী হলো তারা, যারা রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের জন্য এই হত্যাকাণ্ড সংঘটনের পক্ষপাতী।

সন্ত্রাসবাদ

সন্ত্রাস শব্দটি বাংলা 'ত্রাস' শব্দ উদ্ভূত; যার অর্থ ভয়, ভীতি, শঙ্কা। আর সন্ত্রাস অর্থ হলো—মহাশঙ্কা, কোনো উদ্দেশ্যে মানুষের মনে ভীতি সৃষ্টির প্রচেষ্টা। সন্ত্রাসের সমার্থক শব্দ হিসেবে সন্ত্রাসবাদ, আতঙ্কবাদ, বিভীষিকাপন্থা, সহিংস আন্দোলন, উগ্রপন্থা, উগ্রবাদ, চরমপন্থা ইত্যাদি শব্দবন্ধগুলোও ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে সন্ত্রাস কোনো বিচ্ছিন্ন কর্মকাণ্ড নয়। এটি এখন একটি মতবাদে পরিণত হয়েছে। তাই সন্ত্রাসভিত্তিক মতবাদ ও কর্মকাণ্ডকে বোঝাতে 'সন্ত্রাসবাদ' শব্দটি বহুল প্রচলিত।

---

[১৪] https://educalingo.com/bn/dic-bn/santrasa.

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অভিধানে 'সন্ত্রাসবাদ'-এর অর্থ লেখা হয়েছে—'রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের জন্য হত্যা-অত্যাচার ইত্যাদি কার্য অনুষ্ঠান-নীতি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পীড়ন, হত্যা প্রভৃতি হিংসাত্মক ও ত্রাসজনক কর্ম অবলম্বন করা।'[১৫]

উগ্রবাদ

সাধারণত 'উগ্রবাদ' মানে জোর করে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মতবাদ অপরের ওপর চাপিয়ে দেওয়াকে বোঝায়। বিশেষজ্ঞদের মতে—সামাজিক, রাজনৈতিক কিংবা ধর্মীয় চরম বিশ্বাস ধারণ করা, অন্যের মতামত ও বিশ্বাসের স্বাধীনতাকে গুরুত্ব না দেওয়া এবং যেকোনো উপায়ে নিজের মতামত ও বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়ার নামই উগ্রবাদ। উগ্রবাদের সাথে সহিংসতার রয়েছে অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র। বর্তমান সময়ের সকল সহিংসতার সাথে উগ্রবাদের সম্পৃক্ততা সন্দেহাতীত।[১৬]

চরমপন্থা

চরমপন্থা (Extremism) বিভিন্ন অর্থে প্রকাশিত হতে পারে। কোনো রাজনৈতিক চিন্তার ফলাফল, সম্ভাব্যতা, যৌক্তিকতা, প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি নির্বিচারে শেষ সীমায় নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা। এ ছাড়াও মুখোমুখি সংঘর্ষে আসা, বিরোধী পক্ষকে খতম করার প্রত্যয়ও চরমপন্থা প্রত্যয়ভুক্ত হতে পারে। অপরের চিন্তার প্রতি অসহিষ্ণুতা এবং অহিংস অনীহা প্রকাশও চরমপন্থার অন্তর্গত। বিক্ষোভ, বিদ্রোহ, ক্ষমতা দখল ও সন্ত্রাসবাদী কৌশল প্রয়োগের চেষ্টাও চরমপন্থা হতে পারে।[১৭]

---

[১৫] মুহাম্মদ মনজুর হোসেন খান : *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ২৫ সেপ্টেম্বও, ২০২১।

[১৬] মনিরুল হক রনি : *আজকালের খবর*; ২৩ নভেম্বর, ২০২১।

[১৭] ড. সুলতান মাহমুদ ও বিবি মরিয়ম, *রাজনীতি ও কূটনীতিকোষ*, আলেয়া বুক ডিপো, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৫।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উপমহাদেশে 'লাল রাজনীতি'র উত্থান

ভারতে বামপন্থার আগমন প্রসঙ্গে জানা যায়, সোভিয়েত রাশিয়ার তাসখন্দে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এর বিভিন্ন সদস্য গোপনে ভারতে আসেন। তারপর তারা কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, লাহোর প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন কমিউনিস্ট গোষ্ঠী গড়ে তোলেন। এই গোষ্ঠীগুলো কানপুরে এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করে ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে। এই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন সিঙ্গারাভেলু চেটিয়ার, অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন হসরৎ মোহানী এবং সাধারণ সম্পাদক হন সচ্চিদানন্দ বিষ্ণুঘাটে। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে রাশিয়ায় মার্কসবাদী বলশেভিক বিপ্লব সম্পন্ন হলে ভারতেও এর প্রভাব পড়ে। বিশ শতকে ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসের প্রাধান্য সত্ত্বেও বামপন্থি ভাবধারা, রাজনীতি ও আন্দোলনের যথেষ্ট প্রসার ঘটে। এ দেশে বামপন্থি রাজনীতি ও আন্দোলনের চরিত্র কংগ্রেসি রাজনীতি ও আন্দোলন থেকে অনেক ক্ষেত্রেই পৃথক ছিল।[১৮]

এই উপমহাদেশে বাম রাজনীতির ইতিহাসের শুরু বিশ শতকের বিশের দশকে। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের (এম.এন. রায়) উদ্যোগে কিছু নির্বাসিত ভারতীয় ১৯২০ খ্রিষ্টব্দের ১৭ অক্টোবর সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের তাসখন্দ শহরে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (সি.পি.আই) গঠন করেন। চল্লিশের দশকের শেষ পর্যন্ত বর্তমান বাংলাদেশ এলাকায় এ পার্টির তেমন তৎপরতা ছিল না। বিশ ও ত্রিশের দশকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির, বিশেষত তরুণদের বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে প্রধানত সন্ত্রাসবাদী রূপ পরিগ্রহ করে এবং ব্রিটিশ নাগরিক, পুলিশ ও কর্মকর্তা হত্যাই তাদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে।

---

[১৮] https://history4u3.blogspot.com/2019/07/nature-and-characteristics-of-communist.html.

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বৃহত্তর ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও বরিশাল জেলা ছিল এ ধরনের তৎপরতার মূলকেন্দ্র। অনেক সন্ত্রাসবাদী তখন পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হন, একাংশকে জেলখানায় ফাঁসি দেওয়া হয়। এ ছাড়াও শত শত কর্মী বছরের পর বছর জেলখানায় আটক থাকেন এবং অনেককে দ্বীপান্তর দণ্ড দিয়ে আন্দামানে পাঠানো হয়। জেলখানায় আটক এই সন্ত্রাসবাদীরা কমিউনিস্ট পত্রপত্রিকা পাঠের সুযোগ পান এবং অনেকে কমিউনিস্ট দলে যোগ দেন। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারত বিভাগের পর পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির অধিকাংশ হিন্দু সদস্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও সরকারের দমনমূলকব্যবস্থার কারণে ভারতে চলে যান।[১৯]

বাংলায় বাম আন্দোলন

যেকোনো আন্দোলন সূচনাকালে একটি মহৎ ও জনমুখী কার্যক্রম নিয়ে হাজির হয়। প্রাথমিক অবস্থায় সেটি কোনো শক্তি প্রয়োগ বা বিতর্কের সৃষ্টি করে না বললেই চলে। কিন্তু বাম আন্দোলন সেই ধারা ধরে রাখতে পারেনি। শীঘ্রই এটি এক ভীতিকর ও আতঙ্কজনক পরিস্থিতির গহ্বরে প্রবেশ করে। সশস্ত্র লড়াইয়ের লাইন গ্রহণ তার নিয়তি হয়ে দাঁড়ায়। মহিউদ্দিন আহমদ উল্লেখ করেন, বাংলায় বাম আন্দোলনের শুরুতে ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে পূর্ব বাংলা থেকে ১২৫ জন এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পাঁচজন প্রতিনিধি যোগ দেন। ভারত বিভাগের পটভূমিতে তারা পাকিস্তানে পার্টির একটি স্বতন্ত্র কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তদনুসারে পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির ৯ সদস্যের একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ৬ মার্চ। পশ্চিম পাকিস্তানে পার্টির তেমন কোনো প্রভাব বা সংগঠন না থাকলেও পূর্ব বাংলায় এর দ্রুত বিকাশ ঘটে। এ দলের কর্মকৌশল ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কিত নীতি ও কার্যক্রম ছিল ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির অনুরূপ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। পার্টি একপর্যায়ে 'সশস্ত্র' অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ডাক দিলে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি তা অনুমোদন করে।[২০]

---

[১৯] মহিউদ্দিন আহমদ, *বাংলাপিডিয়া* (খণ্ড-৭), (প্রধান সম্পাদক-সিরাজুল ইসলাম), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ২৯।

[২০] প্রাগুক্ত।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মহিউদ্দিন আহমদ উল্লেখ করেন, ১৯৪৮-৫০ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠকদের নেতৃত্বে বহু বিক্ষিপ্ত কৃষক অভ্যুত্থান এবং লাগাতার কৃষক আন্দোলন পরিচালিত হয়। এসব অভ্যুত্থান ও আন্দোলনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল নেত্রকোনা জেলার সুসং দুর্গাপুরের হাজং উপজাতীয়দের বিদ্রোহ। এ আন্দোলন বেশ কয়েক বছর ধরে চলে। ১৯৪৬-৪৭ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় বর্গাচাষিরা 'তেভাগা'[২১] আন্দোলন চালায়। এ সময় পুলিশের গুলিতে অনেক কৃষক নিহত হয়। তেভাগার দাবি মেনে নেওয়া হবে—এ নিশ্চয়তা দেওয়া হলে আন্দোলন কর্মসূচি প্রত্যাহার করা হয়। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে নাচোলে বর্গাচাষি ও পুলিশের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়। এ ছাড়া খুলনার ধানিমুনিয়া ও ডুমুরিয়া, যশোরের বরেন্দ্র দুর্গাপুর, চাঁদপুর ও এগারোখানে এবং সিলেটের বিয়ানীবাজারে কৃষক বিদ্রোহ ও পুলিশের সঙ্গে তাদের সশস্ত্র সংঘাতের ঘটনা ঘটে। পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির অনেক সংগঠক এসব ঘটনায় নিহত হন, এতে জড়িত থাকার কারণে অনেকে কারারুদ্ধও হন। ১৯৪৮-৫১ খ্রিষ্টাব্দে তিন হাজারেরও বেশি কমিউনিস্টকে গ্রেফতার করা হয় এবং শত শত নেতা-কর্মী বিনা বিচারে বছরের পর বছর কারারুদ্ধ থাকেন। পার্টির সদস্যরা আত্মগোপন করেন এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।

১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে অনুষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে একটি নতুন অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি নির্বাচিত হয়। ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত পার্টির একটি খসড়া কর্মসূচিতে জাতীয় বুর্জোয়া, সামন্ত ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তি হিসেবে ব্যাপকভিত্তিক ফ্রন্ট গঠনের আহ্বান জানানো হয়। পার্টি সশস্ত্র সংগ্রাম পরিত্যাগ করে নেহরু সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে শুরু করে এবং সংসদীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। পূর্ব বাংলায়ও পরবর্তীকালে এ ধরনের পরিবর্তন ঘটে। ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে বিভিন্ন জেলা থেকে আগত কমিউনিস্ট প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তে পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি পেটিবুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অনুপ্রবেশ করে নিজেদের সংগঠিত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে।

---

[২১] নাচোলের সাঁওতাল কৃষকদের দাবি ছিল জমিতে উৎপাদিত ফসলের দুই-তৃতীয়াংশের ভাগ। এটিই 'তেভাগা' নামে পরিচিতি পায়। রাজশাহীর নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল ১৯৪৯ সালের শস্য কাটার মৌসুম অর্থাৎ ১৯৪৯ সালের শেষ ও ১৯৫০ সালের প্রথম দিকের সময়ে। নাচোল আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল সমকালীন কমিউনিস্ট পার্টির দিকনির্দেশনায় এবং এ বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিলেন কমিউনিস্ট নেতা রমেন্দ্রনাথ মিত্র ও তার স্ত্রী ইলা মিত্র। নাচোল বৃহত্তর রাজশাহী জেলার একটি থানা ছিল। দ্র. ডক্টর মর্তুজা খালেদ, *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট ও বাম আন্দোলন এবং রাজশাহী জেলা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ৫৫।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২০তম কংগ্রেসের পর আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিভক্তির কারণে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিও বিভক্ত হয়ে পড়ে। ভারতীয় কমিউনিস্টদের একাংশ একটি নতুন দল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) গঠন করে এবং চীনের নীতিকে সমর্থন জানায়। এরপর পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টিতেও বিভক্তি দেখা দেয়। পার্টির চীনপন্থি নেতা-কর্মীরা পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি নামে একটি পৃথক দল গঠন করেন। ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে সিলেটে অনুষ্ঠিত এ দলের প্রথম কংগ্রেসে 'স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা' অর্জনের এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। অবশ্য মোহাম্মদ তোয়াহা ও আবদুল হকের নেতৃত্বে দলের একটি বড়ো অংশ পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যেই জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটানোর ধারণায় অটল থাকে। শেষ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টিতেও বিভক্তি ঘটে এবং দেবেন শিকদার, আবুল বাশার, আবদুল মতিন, আলাউদ্দীন প্রমুখের নেতৃত্বে স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার প্রস্তাবক অংশটি ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি' নামে একটি আলাদা দল গঠন করে।[২২]

গবেষক আব্দুল কুদ্দুস সিকদার উল্লেখ করেন—

> 'বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবের রাজনীতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারত বিভাগোত্তর উপমহাদেশের বাম রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি উপমহাদেশে বি.টি রণদীভের[২৩] অতি বিপ্লবী নীতি অনুসরণ করে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে।'[২৪]

---

২২ মহিউদ্দিন আহমদ, *বাংলাপিডিয়া* (খণ্ড-৭), (প্রধান সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ২৯।

২৩ বালচন্দ্র ত্রিম্বক রণদীভ (১৯ ডিসেম্বর, ১৯০৪-৬; এপ্রিল, ১৯৯০), যিনি ইঞ্জ নামে পরিচিত। বালচন্দ্র ট্রিম্বক রণদীভ ছিলেন একজন ভারতীয় কমিউনিস্ট রাজনীতিবিদ এবং ট্রেড ইউনিয়ন নেতা। তিনি ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে এমএ ডিগ্রি অর্জন করে তার পড়াশোনা শেষ করেন। ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি গোপনীয় কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়াতে (সিপিআই) যোগ দেন। একই বছর তিনি মুম্বাইতে সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রধান নেতা হন। তিনি মুম্বাই টেক্সটাইল শ্রমিকদের গিরিনি কামগার ইউনিয়ন এবং জিআইপি রেলওয়েম্যানস ইউনিয়নের সাথে সক্রিয় ছিলেন। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি নৌ রেটিং বিদ্রোহের সমর্থনে একটি সাধারণ ধর্মঘট সংঘটিত করতে প্রধান ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সিপিআই-এর কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচিত হন এবং ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে কলকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে পার্টি তাকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে। তিনি ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পদে দায়িত্ব পালন করেন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক খোকা রায় বলেন–

> 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্তাবলির প্রভাবে পরিচালিত হয়ে আমরা শ্রমজীবী কৃষক, রেল শ্রমিক ও ছাত্রদের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল শাসক ও শোষকদের বিরুদ্ধে জঙ্গি সংগ্রাম গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছিলাম।'[২৫]

নকশালবাড়ি আন্দোলন

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে সশস্ত্র লড়াইয়ের লাইন অনুসরণ করা হয়, তার অন্যতম বৃহৎ পটভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে বহুল আলোচিত 'নকশাল আন্দোলন'-এর মধ্যে। ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দের মে-জুন মাসে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে, নকশালবাড়ির কয়েকটি গ্রামে এক কৃষক অভ্যুত্থান ঘটে। মার্কসবাদী ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কিছু ভিন্ন মতাবলম্বী নেতার নেতৃত্বে এই সশস্ত্র কৃষকেরা 'সমান্তরাল প্রশাসন' কায়েম করে এবং কয়েকজন জোতদারের জমি বলপূর্বক দখল করে নেয়। নকশালবাড়ির কৃষক অভ্যুত্থানের উদ্যোক্তারা শ্রেণিশত্রু খতমের রাজনৈতিক কৌশলের ওপর গুরুত্ব দেন এবং সিপিআই (এম) নেতৃত্বকে 'নয়া-শোধনবাদী' বলে অভিযুক্ত করেন। চীনপন্থি ভারতীয় কমিউনিস্টদের মধ্যে এ বিতর্ক প্রায় দুই বছর ধরে চলে এবং পরিশেষে ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ১ মে এক নতুন পার্টি গঠিত হয়। সিপিআই (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) নামে এ নতুন পার্টি অন্যত্র নকশালবাড়ি ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে শুরু করে।

সেই সময়কালে দলটি তেলঙ্গানা সশস্ত্র সংগ্রামের মতো বিপ্লবী বিদ্রোহের সাথে জড়িত ছিল। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে রণদীভের নেতৃত্ব সমালোচনার মুখে পড়ে। দলের মধ্যে তাকে 'বাম দুঃসাহসিক' হিসেবে নিন্দা করা হয় এবং নেতৃত্বের পদ থেকে পদচ্যুত করা হয়। ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে পালঘাটে চতুর্থ পার্টি কংগ্রেসে তিনি কেন্দ্রীয় কমিটিতে নিজের পদ পুনরুদ্ধার করেন। রণদীভ সিপিআই বামপন্থার একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন এবং ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দের বিভক্তিতে তিনি সিপিআই ত্যাগ করেন এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী) প্রধান নেতাদের একজন হয়ে ওঠেন। ২৮-৩১ মে ১৯৭০ সালে কলকাতায় সেন্টার অব ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা সম্মেলনে রণদীভ এর সভাপতি নির্বাচিত হন। নয়াদিল্লিতে সিটুর কেন্দ্রীয় ভবনটি পরে তার নামে নামকরণ করা হয়। দ্র. www.marxists.org/archive/ranadive.

[২৪] আব্দুল কুদ্দুস সিকদার : *বাংলাদেশের বাম রাজনীতি* : ১৯৪৭-১৯৭১, পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, ২০১২-২০১৩, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

[২৫] প্রাগুক্ত।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সিপিআই(এম) বিভক্তির পর অচিরেই পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির কর্মকৌশলে পরিবর্তন দেখা দেয়।[২৬]

গবেষক মুর্শিদা বিনতে রহমান উল্লেখ করেন, ১৯৬৭ সালের মে মাসে ভারতের দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়িতে চীনপন্থি চারু মজুমদারের নেতৃত্বের যে কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, তাই নকশালবাড়ি আন্দোলন নামে খ্যাতি লাভ করে। আর ১৯৬৭ সালে পূর্ব বাংলার বাম রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয় নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রভাবে। এটি ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে উপমহাদেশের প্রতিটি চীনপন্থি কমিউনিস্ট আন্দোলনের চিত্র পালটে দেয়। বিপ্লব সম্পর্কে চারু মজুমদারের বক্তব্য চীনপন্থি কমিউনিস্টগণ অন্ধভাবে অনুসরণ করেন। চারু মজুমদারের তত্ত্বের অন্যতম দিকগুলো ছিল নিম্নরূপ :

গণসংগঠন বর্জন : নকশালবাড়ি তত্ত্বে গণসংগঠনসমূহের মাধ্যমে গণসংযোগের প্রচেষ্টা না করে সরাসরি পার্টির মাধ্যমেই গণসংযোগ স্থাপন ও শক্তিশালী করার কথা বলা হয়। চারু মজুমদার স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন—'ট্রেড ইউনিয়ন গড়া আমাদের কাজ নয়, ট্রেড ইউনিয়ন দখল করাও আমাদের কাজ নয়। ট্রেড ইউনিয়ন নির্বাচন নিয়ে মাথা ঘামানোও আমাদের কাজ নয়। আমাদের কাজ শ্রমিকদের মধ্যে গোপন পার্টি সংগঠন গড়া। ....ট্রেড ইউনিয়নগত লড়াই সাধারণ শ্রমিকরাই করবেন। আমাদের ক্যাডাররা করবেন রাজনীতি নিয়ে গোপন পার্টি গড়ার কাজ।' তাঁর মতে, গণ আন্দোলন প্রকাশ্য ও অর্থনীতিবাদী আন্দোলনের ঝোঁক বাড়ায়। বিপ্লবী কর্মীদের শত্রুর সামনে খুলে ধরে। ফলে শত্রুর আক্রমণ করা সহজ হয়ে ওঠে। তাই প্রকাশ্য গণ আন্দোলন ও গণসংগঠন গেরিলা যুদ্ধের বিকাশ ও বিস্তৃতির পক্ষে বাধাস্বরূপ।

গেরিলা দল গঠন : সশস্ত্র বিপ্লব সংগঠনের জন্য চারু মজুমদার গেরিলা দল গঠনের সুনির্দিষ্ট রূপরেখা প্রদান করেন। তার মতে, গেরিলা দল গঠন করার পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে চক্রান্তমূলক। রাজনৈতিক পার্টি ইউনিয়নগুলোর মিটিংয়েও এ চক্রান্তের কোনোরূপ দেওয়া যাবে না। এটা হবে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ও জনে জনে চক্রান্ত। বুদ্ধিজীবী কমরেডকেই এ ব্যাপারে যথাসম্ভব উদ্যোগ নিতে হবে। সেই কমরেড তার ধারণায় সবচেয়ে সম্ভাবনা আছে, এমন একটি গরিব কৃষকের কাছে যাবে ও কানে কানে বলবে—'এ রকম এ রকম জোতদারকে

---

[২৬] মহিউদ্দিন আহমদ, *বাংলাপিডিয়া* (খণ্ড-৭), (প্রধান সম্পাদক-সিরাজুল ইসলাম), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ২৯।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

খতম করলে কি ভালো হয় না? এভাবে গেরিলাদের একজন একজন করে গোপনে বেছে একটি দলে সংগঠিত করতে হবে।'

সশস্ত্র সংগ্রাম : বিপ্লব সংগঠনের ক্ষেত্রে চারু মজুমদার অনিবার্যভাবেই সশস্ত্র সংগ্রামের দিককে উল্লেখ করেছেন। তিনি ঘোষণা করেন—'এ যুগে একটি পার্টি বিপ্লবী কি না, তার একমাত্র মানদণ্ড হলো পার্টি সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করছে কি না।' আর একজন কমিউনিস্টের মানদণ্ড সম্পর্কে বলা হয়—'যে শ্রেণিশত্রুর রক্তে নিজের হাত রাঙায়নি, সে কমিউনিস্ট নামের উপযুক্ত নয়।' অর্থাৎ, সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে শ্রেণিশত্রু খতমই হলো চারু মজুমদারের বিপ্লবের মূল তত্ত্ব।[২৭]

১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে উত্তরবঙ্গে নকশালবাড়িতে পুলিশের হত্যার পরে কৃষকদের সংগঠিত করে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলনের ডাক দেন চেয়ারম্যান চারু মজুমদার। হত্যা চিহ্নিত করে ব্যক্তি হত্যার নীতিও তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, চারুবাবু পুরোটাই চিনা কমিউনিস্ট পার্টির মডেল অনুসরণ করেন। প্রসঙ্গত মাও'এর আগে চেয়ারম্যান শব্দটি ব্যবহৃত হতো। মাও এর রেড বুক অবলম্বনে বেশ কিছু স্লোগানও চারুবাবু বাংলায় জনপ্রিয় করেন। যেমন : 'চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান', 'বন্দুকের নলই শক্তির উৎস', 'শ্রেণিশত্রুকে হত্যাই একমাত্র সশস্ত্র বিপ্লবের পথ' ইত্যাদি।[২৮]

ওপরের বিবরণে দেখা যায়, বামপন্থার কর্মকাণ্ড প্রধানত অস্ত্রের জোরে প্রতিষ্ঠার ওপর নির্ভর করেছে। এক্ষেত্রে 'শ্রেণিশত্রু' নিধন করা এবং অন্যের সম্পদ জোরপূর্বক হস্তগত করার নীতি প্রাধান্য পেয়েছে। বিশেষত ভারতের পশ্চিমবঙ্গে এই ধারার সূচনা হয় এবং পরবর্তীকালে তা বাংলাদেশেও প্রভাব বিস্তার করে। এটি প্রায় চার দশকজুড়ে কোনো না কোনো প্রকারের রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির উপসর্গ হয়ে আছে।

---

[২৭] মুর্শিদা বিনতে রহমান : *বাংলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ধারা* (১৯৬৬-১৯৯১), পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, ২০১৫-১৬, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

[২৮] www.khabar365din.in/editorial-editorial-news/death-anniversary-of-chairman-charu-mazumder/

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

@PDF বইয়ের সমাহার

দ্বিতীয় অধ্যায়

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

স্বরাজ এবং লাল সন্ত্রাস

বাংলা-ভারতে বামপন্থি সন্ত্রাসমূলক ধারা হঠাৎ করেই সৃষ্টি হয়নি। নানান তত্ত্বগত আলাপ-আলোচনার ধারাবাহিকতায় এর শুরু। তবে স্বদেশি-স্বরাজ আন্দোলন যে এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও অনুশীলনের একটি প্রেক্ষাপট তৈরি করে রেখেছিল—এটি বাস্তব সত্য। ইতঃপূর্বে বামপন্থিদের আদর্শিক ও রাজনৈতিক পরিচয় প্রদানের পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদ, উগ্রবাদ, লাল সন্ত্রাস, বাম জঙ্গিবাদের উত্থান সম্পর্কে সংক্ষেপে ধারণা প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া ভারতে বামপন্থার আগমন সম্পর্কেও কিছু বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যায়ে আমরা ইংরেজ আমলে বাংলায় সন্ত্রাসের উদ্ভব, স্বদেশি সন্ত্রাসবাদ কবে থেকে বামে মোড় নিল, সেসব বিষয়ে আলোচনার প্রয়াস পাব।

ইংরেজ আমল

ব্রিটিশ শাসনকালের শেষ অধ্যায়ে অনুশীলন সমিতি ছিল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনুশীলন তত্ত্বের আদর্শে গঠিত বাংলার একটি সশস্ত্র ব্রিটিশবিরোধী সংগঠন। মূলত ঢাকা ও কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে এই দলটি বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সংগঠিত হয়। ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ মার্চ এই সমিতি তৈরি হয়েছিল সতীশচন্দ্র বসু ও প্রমথনাথ মিত্রের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়, কলকাতার হেদুয়া অঞ্চলে। গোড়ার দিকে অনুশীলন সমিতির আখড়াগুলো কলকাতায় গড়ে উঠলেও পরবর্তীকালে ঢাকায় তা আরও বিস্তৃত হয়।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'অনুশীলন'[২৯] ও তার সহযোগী 'যুগান্তর' দল[৩০] ঢাকা শহরের প্রান্তভাগে ব্যায়ামাগারের আড়ালে নিজেদের কাজকর্ম চালাত। অনুশীলন দলের উদ্দেশ্য

---

[২৯] অনুশীলন সমিতি বিশ শতকের প্রথম ভাগে বাংলায় গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনগুলোর মধ্যে একটি। এই সমিতি ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন উচ্ছেদ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। বিশ শতকের প্রথম দশকে বাংলার যুবকদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নয়ন—এ তিন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিবেদিত অসন্ত্রাসী ক্ষুদ্র যুবসংগঠনসমূহের মধ্য থেকে বিপ্লবী দলগুলোর জন্ম হয়েছে বলে ধরা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ ও অরবিন্দ ঘোষ কর্তৃক বিকশিত এ ধারণা হিন্দু ধর্মের শাক্ত মতবাদের দ্বারা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তারা হিন্দুদেরকে আত্মিক, শারীরিক ও বুদ্ধিতে বলিষ্ঠ হওয়ার পরামর্শ দেন। তাদের চিন্তাচেতনাকে কার্যকর করার জন্য প্রকৃত বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ শুরু হওয়ার বহু পূর্ব হতেই মানসিক যোগাভ্যাস ও শারীরিক ব্যায়ামের জন্য গ্রাম ও শহর এলাকায় অনুশীলন সমিতি নামে অসংখ্য যুবসংগঠন গঠিত হয়।

অনুশীলন সমিতি কোনো সময় হতে বিপ্লবী কার্যকলাপ শুরু করেছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে এখন স্বীকৃত যে, ১৯০৫ সাল থেকে অনুশীলন সমিতি বিপ্লবী কার্যকলাপ শুরু করে। যেসব আশু ঘটনাবলির কারণে সন্ত্রাসবাদ হঠাৎ করে শুরু হয়েছিল, সেগুলো হলো লর্ড কার্জনের অপ্রিয় শিক্ষা সংস্কার ও বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫)। ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে সমিতির সদস্যবৃন্দ *যুগান্তর* নামে একটি সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা প্রকাশনার কাজ শুরু করে। এতে বিদ্রোহের কথা খোলাখুলিভাবে প্রচার করা হয়। সারা বাংলায় সমিতির শাখা স্থাপিত হয়।

১৯০৫ সালে ঢাকায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বিপিনচন্দ্র পালের জ্বালাময়ী বক্তৃতা শ্রোতাদের ভীষণভাবে আলোড়িত করে এবং এতে পূর্ববঙ্গের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। বিপিনচন্দ্র পালের বক্তৃতার পর ঢাকা সরকারি কলেজের এককালের শিক্ষক ও পরবর্তী সময়ে ঢাকায় 'ন্যাশনাল স্কুলে'-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক পুলিনবিহারী দাসের নেতৃত্বে ৮০ জন হিন্দু যুবক ১৯০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকায় 'ঢাকা অনুশীলন সমিতি' গঠন করে। এর প্রধান কার্যালয় ছিল ঢাকাতে। পুলিনবিহারী দাস কর্তৃক ঢাকা অনুশীলন সমিতি পরিচালিত হয়।

সমিতি ও স্বদেশি আন্দোলনের লক্ষ্য ও কার্যপদ্ধতি প্রায় একই রকম ছিল। কলকাতা অনুশীলন সমিতি ও ঢাকা অনুশীলন সমিতি অনেকটা রাশিয়া ও ইতালির গুপ্ত সংগঠনগুলোর আদলেই গড়ে উঠেছিল। উনিশ শতকে শেষে ও বিশ শতকে প্রথমদিকে সন্ত্রাসী আন্দোলনের পথিকৃৎ ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র ১৯০২ সালে কলকাতা অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। বরোদার মহারাজার আর্মি বাহিনী থেকে সামরিক ট্রেনিংপ্রাপ্ত তরুণ বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও অরবিন্দ ঘোষের ছোটো ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষ তাকে এটি প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করেন। দ্র. চিত্তরঞ্জন মিশ্র ও শাহ মোহাম্মদ, *বাংলাপিডিয়া* (খণ্ড-১), সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৪, পৃ. ১৮।

[৩০] যুগান্তর পার্টি বা দল ঔপনিবেশিক আমলে বাংলার ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবী দলগুলোর পুরোধা। কলকাতা অনুশীলন সমিতির ভেতরেই একটি আন্তব্যূহ হিসেবে বারীন্দ্রকুমার

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঘোষ ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (নেপথ্যে পরামর্শদাতা ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ) ১৯০৬ সালের এপ্রিলে সাপ্তাহিক যুগান্তর প্রকাশ করেন। সশস্ত্র জাতীয়তাবাদীদের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত যুগান্তর-এর নামানুসারে দলটির নামকরণ হয়। বারীন্দ্রকুমার ব্রিটিশ উপনিবেশিক অধীনতাপাশ থেকে ভারতকে মুক্ত করার জন্য ছিলেন বদ্ধপরিকর। ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত বারীন্দ্রকুমার বিশ্বাস করতেন, মানুষের বৃহত্তর কল্যাণে প্রয়োজন হলে সন্ত্রাস ও হত্যা বিধেয়। তিনি বিপ্লবের ঢঙে ব্যাপক আকারে বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) বিরোধী আন্দোলন শুরু করেন। তিনি এবং তার একুশজন অনুসারী অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক সংগ্রহ এবং বোমা তৈরির মাধ্যমে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে উপনিবেশিক শাসনের অবসানের লক্ষ্যে বিপ্লবী দল যুগান্তরের জন্ম দেন। ৯৩/এ বাবুবাজার স্ট্রিটে ছিল দলের প্রধান কার্যালয়।

প্রথমদিকের বিপ্লবী প্রজন্মের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন হেমচন্দ্র কানুনগো। তিনি রাজনৈতিক ও সামরিক প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য বিদেশেও গমন করেন। হেমচন্দ্র প্যারিসে আশ্রয়গ্রহণকারী জনৈক রুশ নাগরিকের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ লাভ করেন। ১৯০৮ সালের জানুয়ারি মাসে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি কলকাতার উপকণ্ঠে মানিকতলার একটি বাগান বাড়িতে ধর্মীয় স্কুলের পাশাপাশি বোমা প্রস্তুতকারী একটি কারখানাও গড়ে তোলেন। কিন্তু ১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিল ক্ষুদিরাম বসু কর্তৃক মিস ও মিসেস কেনেডী হত্যার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সমগ্র দলটি গ্রেফতার হয়। বার্লিনে অবস্থানকারী বলশেভিক বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায় ওরফে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সাথে যুগান্তর পার্টির যোগাযোগ ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যুগান্তর পার্টি কর্তৃক সংঘটিত 'জার্মান প্লট' হিসেবে খ্যাত ঘটনায় তিনি প্রধান ভূমিকা রেখেছিলেন। সোয়ের এবং সুল কর্তৃক নির্মিত থার্টি টু বোর-এর জার্মান অটোমেটিক পিস্তল সর্বপ্রথম ভারতে আসে তার শিষ্য যুগান্তর দলের সদস্য অবনী মুখার্জীর ভারত সফরের সময়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতে বিপ্লব সংঘটনের জন্য সোভিয়েত সরকার তাকে অর্থ সাহায্য করেছিল। বিশ শতকের বিশের দশকের শেষ দিকে যুগান্তর দল কলকাতা এবং এর আশেপাশের ডাকঘরসমূহ, ডাকগাড়ি, রেলস্টেশনের টিকেট কাউন্টারে নতুন উদ্যমে ত্রাসের সৃষ্টি করে। ১৯২৩ সালে 'রেড বেঙ্গল' লিফলেটের মাধ্যমে তাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ধনীদের হত্যা ও লুণ্ঠনের মাধ্যমেও তারা অর্থ সংগ্রহ করতে থাকেন।

১৯২৩ সালের শেষের দিকে যুগান্তর দলের অনেক নেতা বাংলার জেলা ও প্রাদেশিক কংগ্রেসের, এমনকি জাতীয় কংগ্রেসের উঁচু পর্যায়ে পৌছতে সক্ষম হয়। যুগান্তর দলের ভূপতি মজুমদার ও মনোরঞ্জন গুপ্ত যথাক্রমে ছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ও যুগ্ম সম্পাদক। অন্যান্য আরও অনেক নেতা যেমন : অমরেন্দ্র চ্যাটার্জী, উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ও সতেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বাংলা থেকে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় কংগ্রেস কর্তৃক গঠিত জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী কোর নিয়ন্ত্রিত হতো বিপ্লবী দলগুলোর মাধ্যমেই। এর মধ্যে যুগান্তরও অন্তর্ভুক্ত ছিল। মূল যুগান্তর দলের জ্যোতিষ ঘোষ, বিপিন গাঙ্গুলী ও অমরেন্দ্র চ্যাটার্জী কয়েকজন পুলিশ অফিসারকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। তাদের মধ্যে কলকাতার পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ছিল সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ। অনুশীলন দল রাজনৈতিক ডাকাতি, বোমা তৈরি, অস্ত্র প্রশিক্ষণ, ব্রিটিশ রাজকর্মচারী এবং তাদের বিচারে বিশ্বাসঘাতক তকমা পাওয়া ভারতীয়দের হত্যার কাজে নিযুক্ত ছিল। বাংলার গ্রামাঞ্চলেও অনুশীলন দলের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। সারা বাংলা ও ভারতের অন্যান্য স্থানেও এর শাখা প্রসারিত হয়েছিল। যুগান্তর দল ছিল গুপ্ত বিপ্লববাদী সংস্থা। চরমপন্থার মাধ্যমে ইংরেজদের থেকে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করাই ছিল এই সংগঠনের প্রধান লক্ষ্য। অনুশীলন সমিতির সাথে মতভেদের কারণে ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে 'যুগান্তর'-এর জন্ম। এর নেতৃত্বে ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত প্রমুখ। ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী প্রমুখ এই দলের সদস্য ছিলেন।[৩১]

চন্দরনগর ঘাঁটি

পশ্চিমবঙ্গের হুগলির চন্দরনগর বা চন্দননগর[৩২] ছিল মূলত ফরাসিদের উপনিবেশ। যদিও বিভিন্ন সময় এর হাতবদল ঘটে, তবে ইংরেজদের সরাসরি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তাদের সংগঠনটিকে ধ্বংস করার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা ছিল। ১৯৩০ সালের মে মাসে কলকাতা যুগান্তর দলের নেতৃবৃন্দ ত্রাস সৃষ্টির এক ব্যাপক পরিকল্পনা করে এবং বোমা তৈরির যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য ছিল : (ক) হোটেল, ক্লাব ও সিনেমা হলগুলোতে ইউরোপীয়দের হত্যা, (খ) দমদমের (কলকাতা) বিমানঘাঁটিতে অগ্নিসংযোগ, (গ) গ্যাস ও বিদ্যুৎকেন্দ্র ধ্বংস করে কলকাতায় গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করা, (ঘ) বজবজ-এর পেট্রোল ডিপোগুলো ধ্বংস করে কলকাতায় পেট্রোল সরবরাহ বন্ধ করা, (ঙ) ট্রাম সার্ভিসের যোগাযোগ রক্ষাকারী তারগুলো বিচ্ছিন্ন করে কলকাতায় ট্রাম ব্যবস্থা বিঘ্নিত করা, (চ) কলকাতার সাথে বাংলার অন্যান্য জেলার টেলিযোগাযোগ বিচ্ছিন্নকরণ এবং (ছ) ডিনামাইট ও হ্যান্ড গ্রেনেড দিয়ে সেতু ও রেলপথ উড়িয়ে দেওয়া। এর ফলে বাংলায় পুনরায় বিপ্লবী আন্দোলন শুরু হয়, বিশেষ করে চট্টগ্রামে।

সমগ্র বাংলার বিপ্লববাদী সন্ত্রাসীদের ওপর চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের (১৯৩০) ঘটনার ব্যাপক প্রভাব পড়ে। ১৯৩৩ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি যুগান্তর দলের নেতা ও চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র লুটে নেওয়ার পরিকল্পনার মূল সংগঠক মাস্টারদা সূর্যসেন পুলিশের হাতে ধরা পড়েন এবং বিচারে তাঁর ফাঁসির রায় হয়।' দ্র. মোহাম্মদ শাহ, সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.) *বাংলাপিডিয়া* (খণ্ড-৮), (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৪). পৃ. ৪৪৮।

৩১ *Chopra, Pran Nath (2003) : A comprehensive history of modern India*- গ্রন্থ অবলম্বনে bn.wikipedia.org/wiki/ অনুশীলন সমিতি

৩২ চন্দননগর ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বর্ধমান বিভাগের হুগলি জেলার হুগলি মহকুমার চন্দননগর পৌরসংস্থার অন্তর্গত একটি শহর। এটি ফরাসডাঙা নামেও পরিচিত।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নিয়ন্ত্রণ না থাকায় দীর্ঘদিন ধরেই এটি ছিল স্বদেশী সন্ত্রাসবাদীদের অভয়ারণ্য। চন্দননগরের সেই সশস্ত্র রাজনীতির বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন শৈলেন্দ্রনাথ সেন। তিনি তাঁর বিবরণীতে উল্লেখ করেন—

'যখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নরমপন্থিরা সরকারের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন আরম্ভ করে, সে সময় চরমপন্থিরা হিংসার পথ অবলম্বন করে। সন্ত্রাসবাদের জাল বিস্তার করে বাংলা, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব এবং অন্যান্য স্থানে। বিনায়ক দামোদর সাভারকার[৩৩] ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে "মিত্র মেলা" নামে এক সংগঠন প্রবর্তন করেন। ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে

একসময় চন্দননগর ছিল ফরাসি উপনিবেশ। ইংরেজশাসিত কলকাতার সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে ফরাসিশাসিত চন্দননগর। কলকাতা থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে খলিসানি, বোরো ও গোন্দলপাড়া নামক তিনটি প্রাচীন মৌজা এবং গৌরহাটির ছিটমহলসমেত নয় বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে শহরটি গঠিত। গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড শহরের মধ্য দিয়েই গেছে। দ্র. প্রীতিমাধব রায়, সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.) *বাংলাপিডিয়া* (খণ্ড-৩), ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৪, পৃ. ২৯৪।

আধুনিক চন্দরনগর ছিল বিপ্লবীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থান। ৫ জুলাই, ১৯০৭ সালের গোয়েন্দা দপ্তরের রিপোর্টে প্রকাশ পায় যে, চন্দরনগর আগ্নেয়াস্ত্র আমদানি করার নিরাপদ স্থান। 'যেকোনো নাগরিক অধিক সংখ্যায় এবং নানা রকমের বন্দুক আমদানি করতে পারে।' এই রিপোর্টে আরও প্রকাশ পায় যে, চন্দরনগরের প্রত্যেক মধ্যবিত্ত শ্রেণিদের হাতে অন্তত একটি বন্দুক ও রিভলভার আছে। দ্র. শৈলেন্দ্রনাথ রায়, চন্দরনগর (*ফরাসি শাসন ও তার অবসান*), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০২০, পৃ. ১২।

[৩৩] বিনায়ক দামোদর সাভারকর (২৮ মে ১৮৮৩-২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬) হিন্দু ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদী সংগঠন এবং রাজনৈতিক দল হিন্দু মহাসভার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। লন্ডনে আইনের ছাত্র থাকাকালীন (১৯০৬-১০) সাভারকর ভারতীয় বিপ্লবীদের একটি দলকে নাশকতা ও হত্যার পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দেশ দিতে সাহায্য করেছিলেন। এটি তার সহযোগীরা প্যারিসে প্রবাসী রাশিয়ান বিপ্লবীদের কাছ থেকে শিখেছিল। এই সময়কালে তিনি *দ্যা ইন্ডিয়ান ওয়ার অব ইনডিপেনডেন্স*, ১৮৫৭ (১৯০৯) লিখেছিলেন, যেখানে তিনি এই মতটি গ্রহণ করেছিলেন যে, ১৮৫৭ সালের ভারতীয় বিদ্রোহ ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় গণবিদ্রোহের প্রথম অভিব্যক্তি।

১৯১০ সালের মার্চ মাসে সাভারকরকে বিদ্রোহ ও যুদ্ধে উসকানি দেওয়াসহ বিভিন্ন অভিযোগে গ্রেফতার করে বিচারের জন্য ভারতে পাঠানো হয় এবং দোষী সাব্যস্ত করা হয়। দ্বিতীয় বিচারে তিনি ভারতে একজন ব্রিটিশ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হন এবং শাস্তির পর তাকে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে 'আজীবন আটক' রাখার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। তাকে ১৯২১ সালে ভারতে ফিরিয়ে আনা হয় এবং ১৯২৪ সালে আটক থেকে মুক্তি দেওয়া হয়'।

দ্র. www.britannica.com/biography/Vinayak-Damodar-Savarkar.

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ব্যারিস্টার প্রমথ মিত্রের নেতৃত্বে "অনুশীলন সমিতি" গঠিত হয়, যার শাখা বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯০৭-০৮ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বরাজ বা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন-এর মন্ত্র বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। বাঙালি অধিকৃত সংবাদপত্র গণবিক্ষোভমূলক হয়। সন্ধ্যা এবং যুগান্তর অগ্রণী ভূমিকা নেয়, উন্মুক্তভাবে হত্যার রাজনীতি ও ডাকাতির সাহায্যে অর্থসংগ্রহের কথা বলতে থাকে। সে সময় চন্দরনগরে (পশ্চিমবঙ্গ) একটি সক্রিয় গোপন সংস্থা ছিল। সংস্থার সভ্যদের মধ্যমণি ছিলেন চারুচন্দ্র রায়। সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন শ্রীশ ঘোষ, বসন্ত ব্যানার্জী, মতিলাল রায়, মণীন্দ্রনাথ নায়ক, সত্যচরণ বাবু, ননীলাল দে, পূর্ণ দে প্রমুখ।'[৩৪]

শৈলেন্দ্রনাথ সেনের বরাতে অনুশীলনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের কয়েকটি বিবরণ এখানে প্রদান করা হলো :

- ১৯০৭-০৮ খ্রিষ্টাব্দে যখন বাংলায় বৈপ্লবিক সন্ত্রাসের ঢেউ প্রবাহিত হচ্ছে, তখন ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের গোড়ায় বারীন্দ্রকুমার ঘোষ 'মানিকতলা গার্ডেন সোসাইটি' গঠন করেন। তিনি ১৪ বা ১৫ জন যুবককে সংগ্রহ করে তাঁদের রাজনৈতিক ধর্মে দীক্ষিত করেন। এদের মধ্যে একজন ছিলেন উল্লাসকর দত্ত। পেশাগতভাবে তিনি ছিলেন একজন কেমিস্ট এবং তার বাড়িতে একটি ক্ষুদ্র রসায়নাগারও ছিল। তাঁর সাহায্যে এই সব যুবকেরা মানিকতলার বাড়িতে বোমা তৈরি করতে আরম্ভ করে।

- ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের শেষে এই দলে হেমচন্দ্র দাস যোগদান করেন। তিনি ফ্রান্স থেকে বোমা তৈরির প্রণালি শিখে এসে এখানে সেটা প্রয়োগ করেন।

- তাদের প্রথম প্রচেষ্টা সংঘটিত হয় হুগলি জেলার মানকুণ্ডুতে, ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের এক কালীপূজায়। এই চেষ্টা সফল হয়নি। দ্বিতীয় চেষ্টা ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর, মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড়ে। এ যাত্রায় তাদের লক্ষ্য ছিল বাংলার ছোটো লাট-এর বিশেষ ট্রেনটি ধ্বংস করা।[৩৫]

- ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর স্যার অ্যান্ড্রু ফ্রেজার-এর প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়। ঢাকার মহকুমা শাসক বি. সি. অ্যালেন ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরে

---

[৩৪] শৈলেন্দ্রনাথ সেন : *চন্দরনগর (ফরাসি শাসন ও তার অবসান)*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০২০, পৃ. ১১।

[৩৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নিহত হন।[৩৬] ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ এপ্রিল প্রফুল্ল চাকী[৩৭] আর ক্ষুদিরাম বসু[৩৮] বিচারপতি কিংসফোর্ডকে মুজফ্ফরনগরে হত্যার চেষ্টা করে। সেই

---

[৩৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

[৩৭] প্রফুল্ল চাকীর (১৮৮৮-১৯০৮) জন্ম বাংলাদেশের বগুড়া জেলার বিহার গ্রামে। পিতা রাজনারায়ণ। রংপুরে অধ্যয়নকালে বাড়িতে কুস্তির আখড়া স্থাপন করেন। ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে 'বান্ধব সমিতি'-তে যোগদান করে ক্রমে বিপ্লবী দলের কর্মী হন। স্বদেশি আন্দোলনের সময় রংপুরে প্রথম জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি ছাত্রদের লাঠিখেলা ও মুষ্টিযুদ্ধ শিখিয়ে সৈন্যদের মতো সংগঠিত করেন। ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে বারীন ঘোষ তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যান ও পূর্ববঙ্গের ছোটলাট ব্যফিল্ড ফুলারের হত্যার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত করেন। এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে তিনি মানিকতলার বোমার আড্ডায় এসে বাস করতে থাকেন। ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিংসফোর্ড জজরূপে মজঃফরপুরে বদলি হন। তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম বসু মজঃফরপুরে যান এবং ৩০ এপ্রিল, ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের এক সন্ধ্যায় একটি ফিটন গাড়িকে কিংসফোর্ডের গাড়ি মনে করে তার ওপর বোমা ছোড়েন। ওই গাড়িতে মিসেস ও মিস কেনেডি ছিলেন, তাঁরা নিহত হন। এই ঘটনার পর তিনি সারা রাত হেঁটে সমস্তিপুর পৌছে ট্রেনে মোকামা ঘাট রওনা হন। সেই গাড়িতেই দারোগা নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন। ভোরবেলা নন্দলাল সন্দেহক্রমে কয়েকজন কনস্টেবলের সাহায্যে তাঁকে গ্রেফতার করতে গেলে নিজ রিভলবারের সাহায্যে আত্মহত্যা করেন। তাঁর ছদ্মনাম ছিল দীনেশ রায়। কিছুদিন পর বিপ্লবী সহকর্মীরা দারোগা নন্দলালকে হত্যা করে প্রফুল্ল চাকীর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়। দ্র. সুবোধ সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি বসু (সম্পা.) সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ; ডিসেম্বও, ১৯৮৮), পৃ. ৩০০।

[৩৮] ক্ষুদিরাম বসু মেদিনীপুর জেলার হাবিবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছয় বছর বয়সে মা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর মৃত্যু এবং একই বছরে পিতা ত্রৈলোক্যনাথ বসু মারা গেলে জ্যেষ্ঠ বোন তাঁকে লালন-পালন করেন। গ্রামের বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষার পর তমলুকের 'হ্যামিল্টন' স্কুল ও তারপর ১৯০৩ সালে মেদিনীপুরের 'কলেজিয়েট' স্কুলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত তিনি শিক্ষা লাভ করেন। পড়াশোনায় মেধাবী হলেও কিশোরোচিত দুরন্তপনা ও দুঃসাহসিক কার্যকলাপের প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশি আন্দোলন ক্ষুদিরামের মতো স্কুলের ছাত্রদেরও প্রভাবিত করে এবং পরিণামে তিনি পড়াশোনা ছেড়ে সত্যেন বসুর নেতৃত্বে এক গুপ্ত সমিতিতে যোগ দেন। আরও কয়েকজনের সঙ্গে সেখানে তিনি শরীরচর্চার সাথে সাথে নৈতিক ও রাজনৈতিক শিক্ষা পেতে শুরু করেন। এ সময়ে পিস্তল চালনাতেও তাঁর হাতেখড়ি হয়। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে ইংল্যান্ডে উৎপাদিত কাপড় পোড়ানো ও ইংল্যান্ড থেকে আমদানিকৃত লবণে বোঝাই নৌকা ডোবানোর কাজে ক্ষুদিরাম অংশগ্রহণ করেন। ১৯০৬ সালের মার্চে মেদিনীপুরের এক কৃষি ও শিল্পমেলায় রাজদ্রোহমূলক ইস্তেহার বণ্টনকালে ক্ষুদিরাম প্রথম পুলিশের হাতে ধরা পড়লেও পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চেষ্টা ব্যর্থ হলেও এই ঘটনায় মিসেস কেনেডি ও তার মেয়ে নিহত হন। এর বিচারে স্বদেশি ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয় ও প্রফুল্ল চাকী ধরা পড়ার পর আত্মহত্যা করেন। এই কেনেডি হত্যাকাণ্ডই হলো বাংলার প্রথম স্বদেশি সশস্ত্র তৎপরতার ফসল।[৩৯]

ঢাকা অনুশীলন সমিতি বাংলায় অন্যান্য বৈপ্লবিক সংঘ অপেক্ষা বেশি অপরাধমূলক কাজ করে। ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে তারা ৫১টি ডাকাতি ও ২১টি খুন করে, যার মধ্যে ছিল বসন্ত চ্যাটার্জী হত্যাকাণ্ড ও অন্যান্য রাহাজানি। এই সমিতির সভ্যরা চন্দননগরকে আশ্রয়স্থল ও যোগাযোগ স্থাপনের প্রধান কেন্দ্র করে তুলেছিলেন। চন্দননগরের বিপ্লবীরা ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট অব পুলিশ বসন্ত চ্যাটার্জীর আসন্ন মৃত্যু সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিল। অন্যান্য সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে জানা যায়, অনুশীলন সমিতির পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ শাখার মধ্যে যোগাযোগ চন্দননগরের মাধ্যমেই হতো এবং তাদের সদস্যরা এই হত্যার সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

- ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর লর্ড হার্ডিঞ্জ যখন দিল্লির চাঁদনি চকে মহাসমারোহে প্রবেশ করছিলেন, সেই সময় রাসবিহারীর নির্দেশে বসন্ত বিশ্বাস মহিলার ছদ্মবেশে তাঁর ওপর বোমা নিক্ষেপ করেন। বোমা বিস্ফোরণের ফলে বড়োলাট আহত হন এবং মাহুত নিহত হয়। এই বোমাটি তৈরি করেন মণীন্দ্রনাথ নায়ক।

পরবর্তী মাসে অনুরূপ এক দুঃসাহসী কর্মের জন্য তিনি পুলিশের হাতে ধরা পড়েন এবং আদালতে বিচারের সম্মুখীন হন। কিন্তু অল্প বয়সের বিবেচনায় তিনি মুক্তি পান। ১৯০৭ সালে হাটগাছায় ডাকের থলি লুট করা এবং ১৯০৭ সালের ৬ ডিসেম্বর নারায়ণগড় রেল স্টেশনের কাছে বঙ্গের ছোটোলাটের বিশেষ রেলগাড়িতে বোমা আক্রমণের ঘটনার সাথে তিনি জড়িত ছিলেন। ইউরোপীয় ক্লাবের গেটের কাছে কিংসফোর্ডের গাড়ির মতো অন্য একটি গাড়িতে ভুলবশত বোমা মারলে গাড়ির ভেতরে একজন ইংরেজ মহিলা ও তাঁর মেয়ে মারা যান। এ ঘটনার পর ক্ষুদিরাম ওয়ানি রেলস্টেশনে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। তিনি বোমা নিক্ষেপের সমস্ত দায়িত্ব নিজের ওপর নিয়ে নেন। কিন্তু অপর কোনো সহযোগীর পরিচয় দিতে বা কোনো গোপন তথ্য প্রকাশ করতে রাজি হননি। ফলে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য অনুসারে মুজফ্ফরপুর কারাগারে ১৯০৮ সালের ১১ আগস্ট ফাঁসিতে তাঁর মৃত্যু হয়। দ্র. শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : *বাংলাপিডিয়া* (খণ্ড-৩), (সিরাজুল ইসলাম সম্পা.) বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ১৩।

[৩৯] আশরাফ কায়সার, *বাংলাদেশে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা; ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫, পৃ. ১৯।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

- কলকাতার মানিকতলা বাগানবাড়ির বিপ্লবীদের যে বিচার হয়, তা ইতিহাসে 'আলিপুর বোমার মামলা' নামে পরিচিত। এই মামলায় ৪৬ জন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারের জন্য কাঠগড়ায় তোলা হয়। ২৩ নভেম্বর ১৯০৯ হাইকোর্টে পুনর্বিচারের আবেদন করলে ১৯ জনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। বিচার চলাকালীন পাবলিক প্রসিকিউটর আশুতোষ বিশ্বাসকে আলিপুর কোর্টের চত্বরে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করে হত্যা করেন চারু বিশ্বাস।
- এর কিছুদিন পর, পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট খাঁ বাহাদুর শামসুল আলম কলকাতা হাইকোর্ট চত্বরে বীরেন্দ্রনাথ দত্ত গুপ্তের হাতে নিহত হন।
- ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের ১০ এপ্রিল চন্দননগরের মেয়র যখন নৈশভোজে ব্যস্ত ছিলেন, তখন তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়।
- ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ আগস্ট সকালে রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে হত্যা সন্ত্রাসবাদের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা।[৪০] নরেন্দ্র গোঁসাইকে হত্যার জন্য কানাইলাল দত্ত ও সতেন্দ্র বোসকে বিচারের জন্য পাঠানো হয়। বিচারে দুজনকেই ফাঁসি দেওয়া হয়।[৪১]

আশরাফ কায়সার উল্লেখ করেন :

- বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবী কাজের সূচনা ঘটে ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে।
- ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে মোদিনীপুরে স্বদেশি তৎপরতা শুরু হয়। একই বছর গৌহাটিতে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে বিপ্লবীদের।
- ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে কয়েকজন পুলিশ অফিসারের জীবননাশের চেষ্টা করা হয়।

---

৪০ কানাইলাল দত্ত রাজসাক্ষী নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ওরফে নরেন গোঁসাইকে হত্যা করতে মনস্থির করেন। এ সময় নরেন গোঁসাইকে পুলিশ কড়া নিরাপত্তায় জেলের ভেতরে রেখেছিল। ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের ২ মে মানিকতলা বোমা মামলায় অস্ত্র আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে গ্রেফতার হন কানাইলাল। শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও দলপতির নির্দেশে এই মামলার আসামি রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে অপর বিপ্লবী বন্দি সত্যেন বসুর সহযোগিতায় জেলের ভেতরেই অস্ত্র সংগ্রহ করে হত্যা করেন (৩১ আগস্ট, ১৯০৮)। এই সময় বি.এ. পরীক্ষা পাশ করেও বিপ্লবপন্থি বলে সরকারের আদেশে ডিগ্রি থেকে বঞ্চিত হন। বিচারে তাঁর ফাঁসির আদেশ হয়। আপিল না করে ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করেন। দ্র. সুবোধ সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি বসু (সম্পা.), *সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান*, (কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ডিসেম্বর ১৯৮৮), পৃ. ৮০।

৪১ শৈলেন্দ্রনাথ সেন, *চন্দরনগর* (ফরাসি শাসন ও তার অবসান), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০২০, পৃ. ১৮।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

- ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ দখল করতে গিয়ে নিহত হন বাঘা যতিন ও চিত্তপ্রিয়।
- একই বছর স্বদেশি দলের পাঞ্জাবি ও মারাঠি বিপ্লবীরা সিপাহি বিদ্রোহ সংগঠিত করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। বিদ্রোহে জড়িত সৈন্যদের মিরাটে গুলি করে হত্যা করে ব্রিটিশ সরকার। একই অভিযোগে দিল্লিতে ফাঁসি দেওয়া হয় কয়েকজনকে।
- ১৯২৩-২৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে পোস্ট অফিস ও স্টেশন পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটায় স্বদেশিরা।[৪২]

@PDF বইয়ের সমাহার

---

৪২ আশরাফ কায়সার : *বাংলাদেশে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা; ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫, পৃ. ১৯।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পূর্ববঙ্গে সন্ত্রাসের বিস্তার

'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর'-এর আদলে বিশ শতকের প্রথম তিন দশকে পূর্ববঙ্গজুড়ে চরমপন্থি দলগুলোর বিস্তার ঘটে। আশরাফ কায়সার বর্ণনা করেন, ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের পুলিশ রিপোর্ট অনুযায়ী পূর্ববঙ্গে এ ধরনের সমিতির প্রকাশ্য সদস্য সংখ্যা ছিল ৮,৪৮৫ জন। গুপ্ত সংগঠনের সঙ্গে জড়িত সদস্যের সংখ্যা নিশ্চয়ই আরও কম ছিল। ১৯০৮-৯ খ্রিষ্টাব্দে সরকার এসব সমিতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করলে প্রকাশ্য সমিতিগুলো পরিণত হয় গুপ্ত সংগঠনে। ঘটনাসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ—

- ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনায় আলোড়ন সৃষ্টি করেন মাস্টার দা সূর্যসেন। এই অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য ছিল চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার দুটি দখল করে চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করা ও স্বাধীনতা যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া।

- ১৮ এপ্রিলের অপারেশন প্রাথমিকভাবে সফল হলেও উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিপ্লবীরা আত্মগোপন করেন। ২২ এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ে সরকারি বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ হয় বিপ্লবীদের। ওই যুদ্ধে ১২ জন বিপ্লবী নিহত হয়।

একই বছর প্রকাশ্য দিবালোকে কলকাতার ডালহৌসি স্কোয়ারে পুলিশ কমিশনার টেগার্টের ওপর আক্রমণ, ইডেন গার্ডেনে পুলিশফাঁড়িতে বোমা নিক্ষেপ, ঢাকায় পুলিশ ইন্সপেক্টর জেনারেল লোম্যানকে হত্যা, ঢাকায় পুলিশপ্রধান হাডসনকে আহত করা ছিল বিপ্লবীদের অন্যতম সফল তৎপরতা। এসব কর্মকাণ্ডে অনেক মহিলাও সরাসরি অংশ নেন এবং বিভিন্ন সময়ে সশস্ত্র যুদ্ধে নিহত হন।[৪৩]

---

[৪৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

- ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ আগস্ট কলকাতার রডা কোম্পানির একটি প্রেরিত মালের মধ্যে পঞ্চাশটি মাউজার (Mauser) পিস্তল ও ৪৬,০০০ রাউন্ড কার্তুজ চুরি যায়। এর বেশির ভাগ চন্দননগরের মতিলাল রায়ের নিকট হস্তান্তর করা হয়।[৪৪]

সুপা সাদিয়া উল্লেখ করেন—১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের শুরুতেই পূর্ব কলকাতার মুরারিপুকুরে বোমা তৈরির কারখানা গড়েছিল বারীন্দ্রগোষ্ঠী। জায়গাটি ছিল অরবিন্দ ঘোষ আর বারীন্দ্র ঘোষ পরিবারের সম্পত্তির একটি বাগানবাড়ি। ঠিকানা : ৩২ মুরারিপুকুর রোড। তবে বারীন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে গোপন একটি গোষ্ঠী আগেই গড়ে উঠেছিল, ফুলার হত্যার চেষ্টা তাদেরই পরিকল্পনা। জেলায় জেলায় বিভিন্ন সমিতির সঙ্গে ওই গোষ্ঠীর যোগাযোগও গড়ে ওঠে। ফুলার হত্যা চেষ্টার সাথে যুক্ত ছিলেন রংপুর থেকে আসা প্রফুল্ল চাকী। মেদিনীপুর সমিতি থেকে আসেন হেমচন্দ্র কানুনগো, ক্ষুদিরাম বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু। চন্দননগর থেকে উপেন্দ্রনাথ, শ্রীরামপুর থেকে নরেন গোসাই। বোমা তৈরির পদ্ধতি তাদের প্রথমে জানা ছিল না। ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দের যে বোমা নিয়ে ফুলারের পেছনে ধাওয়া করা হয়, তা টিনের খোলের মধ্যে বারুদ পুরে বানানো একটি বস্তু। ভবানীপুরের জনৈক যোগেশচন্দ্র ঘোষের অর্থ সাহায্য নিয়ে সেটা তৈরি করেন কলকাতার রিপন কলেজের ছাত্র বিভূতি চক্রবর্তী।[৪৫] ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের ৭ নভেম্বর ওভারটুন হলে গভর্নর ফ্রেজারকে হত্যার চেষ্টা করেন জীতেন রায় চৌধুরী। ৯ নভেম্বর কলকাতায় রণেন গাঙ্গুলি হত্যা করেন পুলিশ ইন্সপেক্টর নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রফুল্ল চাকীকে ধরিয়ে দিয়েছিল।[৪৬]

সুপা সাদিয়া আরও উল্লেখ করেন—কলকাতার অনুশীলনের একাংশ, আত্মোন্নতি সমিতি আর চাংড়িপোতা দলের সাথে উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দলের বিপ্লবীদের নিয়ে যতীন্দ্রনাথ একটি সংগঠন তৈরি করেন। ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে হাওড়া-শিবপুর ডাকাতির সময় থেকেই এই সংগঠনটি সক্রিয় হয়ে ওঠে। মাদারীপুরের পূর্ণ দাস গোষ্ঠী এবং বরিশালের সতীশ মুখোপাধ্যায় গোষ্ঠীও ওই সংগঠনের সঙ্গে যোগ দেয়। ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ আগস্ট আত্মোন্নতি সমিতির সদস্যরা কলকাতায় এক রোমাঞ্চকর অভিযানের ভেতর দিয়ে লুট করে আনেন রডা কোম্পানির মাইজার পিস্তল। এই সময় যতীন্দ্রনাথের

---

৪৪ শৈলেন্দ্রনাথ সেন : *চন্দরনগর* (ফরাসি শাসন ও তার অবসান), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০২০, পৃ. ৩২।

৪৫ সুপা সাদিয়া : *অগ্নিযুগ*, দ্যু প্রকাশন, ঢাকা; ২০১৭, পৃ. ১৯।

৪৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পরিকল্পনাকে সফল করার জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বেলেঘাটা ও গার্ডেনরিচে দুটি ডাকাতির ঘটনাও ঘটে। ঢাকা অনুশীলন ছাড়া অন্যান্য প্রায় সব দলই এ সময় যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে এক হন। দলটি তাদেরকে 'যুগান্তর' দল নামে পরিচিতি দেয়।[৪৭]

ঢাকা অনুশীলন দল এরপরও বিচ্ছিন্ন কিছু গুপ্তহত্যা চালায়। 'স্বাধীন ভারত' ও 'লিবার্টি' নামে দুটি প্রচারপত্র প্রকাশ করে। ১৯১২ থেকে ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে কলকাতার বেশ কয়েকজন পুলিশকে হত্যা করা হয়। ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ জুন গৌহাটি কলকাতা বাজারে এক দুঃসাহসিক অভিযানের পর নিহত হন নলিনী বাগচী।[৪৮]

সুপা সাদিয়ার বিবরণ :

- প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী 'অনন্তহরি মিত্র' ছদ্মনামে আরেক বন্দি যুবকের সাথে মিলে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ভুপেন চট্টোপাধ্যায় নামে এক পুলিশ অফিসারকে হত্যা করে। ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯২৬ সেই মামলায় তাদের দুজনের ফাঁসি হয়।
- ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ এপ্রিল বিপ্লবীরা বিদেশের অস্ত্রের ওপর নির্ভর না করে নিজেরাই অস্ত্র সংগ্রহের কথা ভাবেন। তারা চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেন। ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির পক্ষ থেকে চট্টগ্রামে স্বাধীন প্রাদেশিক সরকার ঘোষণা করা হয়। সর্বাধিনায়ক সূর্য সেনকে সামরিক অভিবাদন জ্ঞাপন করা হয়। টেলিফোন ভবন, পুলিশ অস্ত্রাগার, অক্সিলারি ফোর্স এবং ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করা হয়।
- রসিকলাল দাসের নেতৃত্বে কলকাতার যুগান্তর দলের বিপ্লবীরা পুলিশ কমিশনার টেগার্টকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ আগস্ট কলকাতায় ডালহৌসি স্কয়ারে পুলিশ কমিশনার টেগার্টকে হত্যার প্রয়াস ব্যর্থ হয়। সকাল ১১টা ১৫ মিনিটে টেগার্টের গাড়ি লক্ষ্য করে পরপর দুটি বোমা ছোড়া হয়। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ দুটি বোমা ও একটি রিভলবার উদ্ধার করে। দীনেশ মজুমদার গ্রেফতার হন। বোমা ফেটে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহত হন অনুজা সেন। এরপর পুলিশ বাড়ি বাড়ি তল্লাশি শুরু করে। ডা ইরায়ন রায়, রসিকলাল দাস, বেরতি বর্মন প্রমুখ গ্রেফতার হন। হোস্টেলে বোমা রাখায় গ্রেফতার হন কমলা দাশগুপ্ত।

---

[৪৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

[৪৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

- ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ আগস্ট বিনয়কৃষ্ণ বসু ঢাকায় পুলিশ অফিসার লোম্যকে গুলি করে হত্যা করেন এবং আত্মগোপন করেন।

- ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের ৮ ডিসেম্বর বিনয়-বাদল দীনেশ কলকাতা রাইটার্স বিল্ডিংয়ে হামলা চালায়। আক্রমণের জন্য প্রস্তুত বিনয় বসু, দীনেশ গুপ্ত আর বাদল গুপ্ত। তারা তাদের নেতৃবৃন্দের সাথে সকল পরিকল্পনা করে নিলেন। এখন কেবলই সময়ের অপেক্ষা। তারা সামরিক পোশাক পরে পৌঁছলেন রাইটার্স বিল্ডিংয়ে। রাইটার্স বিল্ডিংয়ের নির্দিষ্ট কক্ষে কারা বিভাগের সর্বময় কর্তা ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্নেল এনএস সিম্পসন তার কাজে ব্যতিব্যস্ত। তার সাথে আলোচনারত তার ব্যক্তিগত সহকারী জ্ঞান গুহ। বেলা ঠিক বারোটায় বিনয় বসু, দীনেশ গুপ্ত আর বাদল গুপ্ত দেখা করার কথা ব্যক্ত করলেন ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্নেল এনএস সিম্পসনের সাথে। তারা সিম্পসনের সহকারীকে সরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেন। হঠাৎ পায়ের আওয়াজ শুনে কর্নেল ফিরে তাকান। বিস্মিত হন কর্নেল। তিনি দেখেন, তার সামনে মিলিটারি পোশাক পরে তিনজন বাঙালি যুবক রিভলবার হাতে। তিনটি রিভলবার থেকে ছয়টি গুলি সিম্পসনের দেহ ভেদ করে। সিম্পসন লুটিয়ে পড়ে মেঝের ওপর। এরপরই গুলির আঘাতে আহত হন জুডিসিয়াল সেক্রেটারি মি. নেলসন।[৪৯]

- ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ এপ্রিল মেদিনীপুরে ম্যাজিস্ট্রেট জেমস পেডিকে হত্যা করা হয়। ৭ জুলাই দীনেশ গুপ্তের ফাঁসির হুকুম দেওয়ার অপরাধে বিচারক গার্লিককে হত্যা করে অজ্ঞাত পরিচয়ের এক যুবক। বিচারকের দেহরক্ষীর গুলিতে ওই যুবক নিহত হয়। পরে অবশ্য জানা যায় এই যুবক কানাই ভট্টাচার্য। বাড়ি মজিলপুরে। তিনি কলকাতার আত্মোন্নতি সমিতির বিপ্লবী। হরিপদ ভট্টাচার্য ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ আগস্ট চট্টগ্রামে পুলিশের ডেপুটি সুপার আসানউল্লাহকে হত্যা করে। এতে হরিপদের দ্বীপান্তর হয়।

- ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর কুমিল্লায় ম্যাজিস্ট্রেট সি জি বি স্টিভেন্সকে হত্যা করেন যুগান্তর দলের দুই কিশোরি শান্তিসুধা ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী।

- ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে গভর্নর জ্যাকসনকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন কলকাতার যুগান্তর কর্মী বীনা দাস। তবে প্রয়াসটি ব্যর্থ হয়, ধরা পড়েন বীনা দাস। একই বছর ৩০ এপ্রিল মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট রবার্ট ডগলাসকে হত্যা করেন বিভি দলের

---

[৪৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬-২৮।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দুই বিপ্লবী প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য এবং প্রভাংশু পাল। প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের বন্দুক কাজ করেনি। তবে প্রভাংশু পালের প্রতিটি বুলেট ভেতরে ঢুকে যায়। প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য ধরা পড়েন। ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দের ১২ জানুয়ারি তার ফাঁসি হয়।[৫০]

- ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ জুন চট্টগ্রামের ধলঘাট গ্রামে গ্রাম্যবধূ সাবিত্রী চক্রবর্তীর আশ্রয়ে থাকাবস্থায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হলে নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন নিহত হন। সূর্য সেন[৫১] ও প্রীতিলতা পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

---

[৫০] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯-৩০।

[৫১] সূর্য সেন ১৮৯৪ সালের ২২ মার্চ চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার নোয়াপাড়ায় এক বৈদ্যব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রাজমনি সেন ও মাতার নাম শশী বালা দেবী। পিতা রাজমনি সেন পেশায় ছিলেন একজন শিক্ষক। দুই ছেলে ও চার মেয়ের মধ্যে সূর্য্য সেন ছিলেন তাদের চতুর্থ সন্তান। শৈশবেই পিতা-মাতাকে হারানোর পর সূর্য সেন কাকা গৌরমনি সেনের কাছেই লালিত-পালিত হন। তা ছাড়াও তাঁর জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের গভীর প্রভাব রয়েছে। দয়াময়ী উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে সূর্য সেন নোয়াপাড়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সেখানেই পড়াশোনা করেন। এরপর তিনি ভর্তি হন ন্যাশনাল হাইস্কুলে। সেখানে শিক্ষা সম্পন্ন করার পর ১৯১৬ সালে মুর্শিদাবাদের বহরমপুর (বর্তমানে কৃষ্ণনাথ কলেজ) কলেজে কলা বিভাগে ভর্তি হন এবং স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।
সূর্য সেন ১৮ এপ্রিল, ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার থেকে পুলিশ ও সহায়ক বাহিনীর অস্ত্রাগারে অভিযান চালানোর জন্য বিপ্লবীদের একটি দলের নেতৃত্ব দেন। পরিকল্পনাটি ছিল বিস্তৃত এবং এতে অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা এবং শহরের যোগাযোগব্যবস্থা (টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও রেলপথসহ) ধ্বংস করা হয়েছিল, যার ফলে ব্রিটিশ শাসিত বাকি স্থান থেকে চট্টগ্রাম বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তবে দলটি অস্ত্র অর্জন করলেও তারা গোলাবারুদ দখল করতে ব্যর্থ হয়। তারা অস্ত্রাগারের চত্বরে ভারতীয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে এবং সেখান থেকে পালিয়ে যায়। কিছুদিন পর, বিপ্লবী দলের একটি বড়ো অংশ নিকটবর্তী জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি দল দ্বারা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। সূর্য সেন লুকিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে থাকলেন। কখনো তিনি একজন কৃষক, কখনো পুরোহিত, আবার কখনো গৃহকর্মী, এমনকি একজন ধার্মিক মুসলিম হিসেবে লুকিয়ে থাকতেন। এভাবেই তিনি ব্রিটিশদের হাতে বন্দি হওয়া এড়িয়ে যান। একসময় তিনি এক বন্ধুর বাড়িতে লুকিয়ে ছিলেন। ১৯৩৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি আত্মগোপন করে থাকা সূর্য সেনকে ব্রিটিশ শাসকরা গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। বিচারে সূর্য সেনের ফাঁসির আদেশ দেয়া হয়। তাঁর অনেক সহকর্মীও তার সাথে ধরা পড়েন এবং দীর্ঘ মেয়াদে কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১২ জানুয়ারি, ১৯৩৪ সালে তারকেশ্বর দস্তিদার নামে আরেক বিপ্লবীর সাথে সূর্য সেনের ফাঁসি হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৯ বছর।
দ্র. https://bengalbyte.in/byte/masterda-surya-sen-biography-in-bengali-মাহমিসা.

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

- ২৩ সেপ্টেম্বর প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের[৫২] নেতৃত্বে পাহাড়তলীর ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করা হয়। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার হুইসেল বাজিয়ে আক্রমণ শুরুর নির্দেশ দিতেই ঘনঘন গুলি আর বোমার আঘাতে পুরো ক্লাব কেঁপে ওঠে। ক্লাবঘরের সব বাতি নিভে যাওয়ার কারণে সবাই অন্ধকারে ছোটাছুটি করতে থাকে। ক্লাবে কয়েকজন ইংরেজ অফিসারের কাছে রিভলবার ছিল।

---

[৫২] প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ১৯১১ সালে চট্টগ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জগবন্ধু ছিলেন চট্টগ্রাম পৌরসভার হেড ক্লার্ক। প্রীতিলতা মাস্টারদা সূর্যসেন-এর ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা ছিলেন। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত সশস্ত্র সংগ্রামে প্রীতিলতাকে প্রথম আত্মোৎসর্গকারী নারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। প্রীতিলতা চট্টগ্রামের খাস্তগীর বালিকা বিদ্যালয় থেকে ১৯২৭ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। এরপর তিনি ১৯২৯ সালে ঢাকা ইডেন মহিলা কলেজে ভর্তি হন এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এর দুই বছর পর প্রীতিলতা কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে দর্শনশাস্ত্রে ডিস্টিংশনসহ গ্রাজুয়েশন করেন। ইডেন কলেজের ছাত্রী থাকাকালে প্রীতিলতা লীলা নাগের নেতৃত্বাধীন দীপালি সংঘের অন্তর্ভুক্ত শ্রীসংঘের সদস্য এবং কলকাতার বেথুন কলেজের ছাত্রী থাকাকালে কল্যাণী দাসের নেতৃত্বাধীন ছাত্রীসংঘের সদস্য হন। গ্রাজুয়েশন করার পর তিনি চট্টগ্রামের নন্দনকানন অপর্ণাচরণ নামক একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে যোগদান করেন।

১৯৩০ সালে সমগ্র বাংলাজুড়ে অনেক বিপ্লবী দল সংগ্রামরত ছিল। ওইসব দলের সদস্যরা বিশ্বাস করত যে, কেবল সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হতে পারে। এক্ষেত্রে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের গোপন দলিলপত্র পাঠ থেকে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার বিপ্লবে উদ্‌বুদ্ধ হন। প্রীতিলতার এক ভাই মাস্টারদাকে তাঁর বিপ্লবী চেতনা সম্পর্কে অবহিত করেন। প্রীতিলতা সূর্যসেনের নেতৃত্বাধীন বিপ্লবী দলের প্রথম মহিলা সদস্য হন। তিনি টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ অফিস ধ্বংস এবং রিজার্ভ পুলিশ লাইন দখল অভিযানে যুক্ত ছিলেন। তিনি জালালাবাদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সালে প্রীতিলতা কলকাতাস্থ আলীপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত রাজবন্দি রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে যথাসময়ে তা পালন করেন। ১৯৩২ সালের ১৩ জুন ধলঘাট সংঘর্ষে কয়েকজন বিপ্লবী প্রাণ হারান। মাস্টারদা ও প্রীতিলতা পালাতে সক্ষম হন। শিগ্‌গির পুলিশের জরুরি গ্রেফতারি তালিকায় প্রীতিলতার নাম অন্তর্ভুক্ত হয়। মাস্টারদা তাঁকে স্কুল ছেড়ে দিয়ে পুরুষ বিপ্লবীদের মতো আত্মগোপন করার নির্দেশ দেন। প্রীতিলতা অপর একজন বিপ্লবী নারী কল্পনা দত্তসহ গোপন আস্তানায় চলে যান। ১৯৩২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর প্রীতিলতা পাহাড়তলীতে ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই সময়ে তিনি গুলিবিদ্ধ হলে তাৎক্ষণিকভাবে পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে মৃত্যুবরণ করেন। দ্র. আবু সাঈদ খান, *বাংলাপিডিয়া* (খণ্ড-৬), (সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা; ২০০৪, পৃ. ৮০।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাঁরা পালটা আক্রমণ করে। একজন মিলিটারি অফিসারের রিভলবারের গুলিতে প্রীতিলতার বাম পায়ে আঘাত লাগে। আক্রমণ শেষ হলে বিপ্লবী দলটার সাথে তিনি কিছুদূর এগিয়ে আসেন। পুলিশের রিপোর্ট অনুযায়ী সেদিনের এই আক্রমণে মিসেস সুলিভান নামে একজন নিহত হন এবং চারজন পুরুষ এবং সাতজন মহিলা আহত হন। ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণে অংশ নেওয়া অন্য বিপ্লবীদের দ্রুত স্থান ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়ে প্রীতিলতা পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পরদিন পুলিশ ক্লাব থেকে ১০০ গজ দূরে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের মৃতদেহ শনাক্ত করে। তাঁর মৃতদেহ তল্লাশির পর বিপ্লবী লিফলেট, অপারেশনের পরিকল্পনা, রিভলবারের গুলি, রামকৃষ্ণের ছবি এবং একটা হুইসেল পাওয়া যায়।

- ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ ফেব্রুয়ারি গৈরলা গ্রাম থেকে মাস্টারদা সূর্য সেন গ্রেফতার হন। ২২ মে কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে চিত্রা সিনেমা হলের উলটো দিকে একটি বাড়ি থেকে গ্রেফতার হন দীনেশ মজুমদার ও নলিনী দাস। টেগার্ট হত্যা প্রচেষ্টার সূত্রে ধৃত দীনেশ আগেরবার জেল ভেঙে পালিয়েছিলেন। তিনি আর নলিনী দাস ওই বাসায় আত্মগোপন করে ছিলেন। নলিনী দাস গুলি করতে করতেই এক ছাদ থেকে আরেক ছাদে লাফ দিয়ে পালানোর চেষ্টা করে; কিন্তু তার গুলি ফুরিয়ে গেলে সেটি আর সম্ভব হয়নি।

- ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দের ২ সেপ্টেম্বর মেদিনীপুরে ম্যাজিস্ট্রেট বিইজি বার্জ টাউন ক্লাবের হয়ে ফুটবল খেলতে আসেন। গাড়ি থেকে নামামাত্রই অনাথবন্ধু পাঁজা ও মৃগাঙ্ক দত্ত তাকে গুলি করে হত্যা করেন। তবে তারা দুজন পুলিশের আক্রমণে সেখানেই মারা যান। পরে ওই ঘটনার সাথে যুক্ততার বিবেচনায় ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৫-২৬ অক্টোবর নির্মল জীবন ঘোষ, রামকৃষ্ণ রায় এবং ব্রজকিশোর চক্রবর্তীর মৃত্যুদণ্ড হয়। ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দের ১২ জানুয়ারি ফাঁসি হয় মাস্টার দা সূর্য সেন এবং তারকেশ্বর দস্তিদারের।[৫৩]

- ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দের ৮ মে দার্জিলিঙের রেসের মাঠে বিভি দলের বিপ্লবী ভবানী ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উজ্জ্বলা মজুমদার গভর্নর অ্যান্ডারসনকে হত্যার চেষ্টা করেন। প্রথম গুলি করেন ভবানী ভট্টাচার্য, তারপর রবীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। দুজনের গুলির লক্ষ্যই ব্যর্থ হলে দুজনই ধরা পড়েন। ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৫ ভবানী ভট্টাচার্যের ফাঁসি হয়। ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ৯ জুন ফাঁসি হয় দীনেশ মজুমদারের।

---

[৫৩] সুপা সাদিয়া : *অগ্নিযুগ*, দ্যু প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৩২।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

- ১৫ জুন গোয়ালন্দে দারোগা এরশাদ আলীকে হত্যা করেন রোহিনী বড়ুয়া। ১৮ ডিসেম্বর এই অপরাধে তার ফাঁসি হয়। এ বছরই বিপ্লবীদের উন্মত্ততার শেষ বছর হিসেবে ধরা হয়। এরপরও চলে বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা।[৫৪]

সূর্য সেন-প্রীতিলতা পর্ব

সূর্য সেন প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী দল ও তাদের পর্বে যে সকল সন্ত্রাসী ঘটনা সংঘটিত হয়, তার একটি চিত্র পাওয়া যায় পঙ্কজ চক্রবর্তীর দেওয়া বিবরণে :

- ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর বাটালি পাহাড়, চট্টগ্রাম শহরে অনন্ত সিংহের নেতৃত্বে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের সতের হাজার টাকা বহনকারি ঘোড়ার গাড়ি লুট করা হয়। এই টাকা দিয়ে বিপ্লবী দলের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। অম্বিকা চক্রবর্তী ও দলিলুর রহমান এই টাকা নিয়ে অস্ত্র ক্রয় করতে কলকাতা যান।

- ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম শহরে 'শুলকবাহার' নামক একটি বাড়িতে অবস্থিত বিপ্লবীদের সদর দপ্তর পুলিশ অতর্কিতে ঘিরে ফেলে, কঠোর বেষ্টনী দিয়ে পুলিশ পাহাড়ের ওপরে উঠে আক্রমণ শুরু করে। এই দৃঢ় বেষ্টনী ভেদ করে বিপ্লবীরা বোমা ও গুলি ছুড়তে ছুড়তে বেরিয়ে আসেন, তাতে পাঁচজন গ্রামবাসী আহত হন। সূর্য সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তী পুলিশের হাতে ধরা পড়েন, কিন্তু সঙ্গে রাখা সায়ানাইড ক্যাপসুল গিলে অজ্ঞান হয়ে যান। পরে হাসপাতালে চিকিৎসার পর সুস্থ হন। জানা যায়, ক্যাপসুল ভেজাল ছিল।

- ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ মে অনন্ত সিংহকে কলকাতার রাস্তায় অনুসরণ করে গ্রেফতার করার প্রতিফল হিসেবে চট্টগ্রাম শহরে পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর প্রফুল্ল কুমার রায়কে গুলি করে হত্যা করেন প্রেমানন্দ দত্ত।

- ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের ৫ সেপ্টেম্বর, নোয়াপাড়া চট্টগ্রামে অস্ত্র লুট করা হয়। সূর্য সেন এই কাজ করেন। তার সাথের অন্যদের নাম জানা যায়নি।

- ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দের ১০ নভেম্বর চব্বিশ পরগনার দক্ষিণেশ্বরে বোমা, রিভলভার, পিস্তল, কার্তুজ এবং অন্যান্য রাসায়নিক সরঞ্জামসহ খানাতল্লাসীর সময় বিপ্লবীরা ধরা পড়েন। এরা হলেন রাজেন্দ্র লাহিড়ী, অনন্ত হরি মিত্র এবং অন্যরা। একে 'দক্ষিণেশ্বর ষড়যন্ত্র মামলা' আখ্যা দেওয়া হয়। একই দিন

---

[৫৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কলকাতার শোভা বাজারে রিভলভার, কার্তুজ, গোপনীয় দলিল ও কাগজপত্রসহ আটককৃতরা হলেন প্রমোদ চৌধুরী ও অন্যরা। কিন্তু পুলিশের কর্ডন ভেঙে তাদের ভেতর থেকে সূর্য সেন পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

- ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ মে কলকাতার আলিপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে স্পেশাল পুলিশ সুপার রায় বাহাদুর ভুপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে হত্যা করা হয়। এ হত্যায় যারা অংশ নিয়েছিলেন, তাঁরা হলেন দক্ষিণেশ্বর ও শোভাবাজারে ধৃত প্রমোদ চৌধুরী, অনন্ত হরি মিত্র, ধীরেন্দ্র এবং অন্যরা।

- ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ সেপ্টেম্বর, কলকাতার আলীপুর কেন্দ্রিয় কারাগারে ভুপেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে হত্যা করার অপরাধে বিপ্লবীদের ফাঁসি হয়। আসামিরা হলেন প্রমোদ রঞ্জন চৌধুরী, অনন্ত হরি মিত্র ও বীরেন্দ্র।

- ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ এপ্রিল রাত ৯.৫৫ মি. চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল ও জালালাবাদ যুদ্ধ শুরু। চট্টগ্রামের টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ ভবন আক্রমণ, এতে নেতৃত্ব দেন অম্বিকা চক্রবর্তী, তাঁর সহযোগীরা হলেন কালিপদ চক্রবর্তী, আনন্দ গুপ্ত, নিরঞ্জন রায়, দ্বিজেন্দ্র লাল দস্তিদার, বীরেন্দ্র দে ও মহেন্দ্র গুহ। একই দিনের রাত দশটায় অনন্ত সিংহ এবং গণেশ ঘোষের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম পুলিশ লাইনের অস্ত্রাগার দখল করা হয়।

একই সময় অন্য আর যেসব ঘটনা ঘটে, তার মধ্যে ছিল :

- রাত দশটায় পাহাড়তলীর অতিরিক্ত অস্ত্রাগার দখলের জন্য আক্রমণ, চট্টগ্রাম ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ, চট্টগ্রাম শহর থেকে দূরে ধূম রেলস্টেশনের অদূরে রেলওয়ে লাইন উপড়ানো এবং টেলিফোন টেলিগ্রাফের তার কেটে দেওয়া, ফেনীর অদূরে নাঙ্গলকোটে রেলওয়ে লাইন উপড়ানো ও টেলিগ্রাফ টেলিফোন তার কেটে দেওয়া।

- ২২ এপ্রিল চট্টগ্রাম সেনানিবাসের জালালাবাদ পাহাড়ে সূর্য সেনের নেতৃত্বে যুদ্ধ হয়। বিকেল চারটা থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ও বিপ্লবী দলের ভেতর এক ভয়াবহ সংঘর্ষ হয়। তাতে শতাধিক ব্রিটিশ সৈন্য নিহত হয় (রমেশ মজুমদারের মতে ৬৪ জন) কিন্তু বিপ্লবী দলের ১২ জন নিহতকে শনাক্ত করা হয়।

- ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের ২২ এপ্রিল অনন্ত সিংহ তিনজন সঙ্গীসহ ফেনী রেলস্টেশনে পুলিশের সাথে সংঘর্ষ হয়ে ধরা পড়লেও কয়েক মিনিটের মধ্যে বোমাবাজি ও রিভলভারের গুলি ছুড়তে ছুড়তে বন্দিদশা থেকে মুক্ত হন, তিনজন পুলিশকে জখম করে নিজেরাও পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

- ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ আগস্ট চট্টগ্রাম পল্টন মাঠের ফুটবল খেলা শেষে পুলিশের ডিএসপি খান বাহাদুর আহসান উল্লাহকে প্রকাশ্য দিবালোকে হরিপদ ভট্টাচার্য নামক এক কিশোর সকলের সাক্ষাতে হত্যা করে।

- ১ ডিসেম্বর চাঁদপুর রেল স্টেশনে তারিনী মুখোপাধ্যায় নামক রেলওয়ে পুলিশ বিপ্লবীদের হাতে নিহত হন। বিপ্লবীদের লক্ষ্য ছিল আইজিপি মি. এস ক্রেগ। এই ঘটনায় রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালীপদ চক্রবর্তী হাতেনাতে ধরা পড়ে যান এবং পরে বিচারে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসি হয়।

- ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দের ৩ জুন চট্টগ্রাম জেল থেকে বিপ্লবীদের মুক্ত করার জন্য জেল প্রাচীর ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য মাস্টারদা ও নির্মল সেন বাইরের থেকে গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ ভেতর থেকে যোগাযোগ করেন, তাকে স্থলমাইন ষড়যন্ত্র বলা হয়।

- ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ জুন পটিয়া ধলঘাটে ক্যাপ্টেন ক্যামারুন তার সামরিক বাহিনী নিয়ে সাবিত্রী দেবীর বাড়িতে আশ্রিত মাস্টারদা, প্রীতিলতা, নির্মল সেনকে ঘেরাও করলে বিপ্লবীদের গুলিতে ক্যামারুন নিহত হন। সূর্য সেন ও প্রীতিলতা পালিয়ে যেতে সমর্থ হলেও নির্মল ও অপূর্ব সেন নিহত হন।

- ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ সেপ্টেম্বর পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ হলো বিপ্লবীদের অন্যতম বিখ্যাত ঘটনা, এ আক্রমণে প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার নেতৃত্ব দেন, অনেক ইংরেজকে হতাহত করার পর প্রীতিলতা সায়ানাইড গিলে আত্মাহুতি দেন। তাঁর সাথে সেদিন ছিলেন শান্তি চক্রবর্তী, কালী কিঙ্কর দে, সুশীল দে, মহেন্দ্র চৌধুরী, পান্না সেন, বীরেশ্বর রায় এবং প্রফুল্ল দাস।

- ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে ২ ফেব্রুয়ারি গৈড়লা গ্রামের কথিত বিশ্বাসঘাতকের (নেত্র সেন) সহায়তায় মহিমচন্দ্র বিশ্বাস ও ক্ষীরোদ প্রভা বিশ্বাসের বাড়িতে পুলিশের অভিযান চলে। এ সময় ধরা পড়েন সূর্য সেন। অন্যরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দের ১১ জানুয়ারি সূর্য সেনকে ধরিয়ে দেওয়ার দায়ে নেত্র সেনকে হত্যা করেন কিরণ সেন।

- ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দের মে চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানার গহিরা গ্রামের পূর্ণ তালুকদারের বাড়িতে মিলিটারি বাহিনী তারকেশ্বর দস্তিদার, কল্পনা দত্ত ও অন্যান্য বিপ্লবীদের ঘিরে ফেললে উভয় পক্ষে সংঘর্ষ হয়, গৃহ স্বামী পূর্ণ তালুকদার ও বিপ্লবী মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত নিহত হন। তারকেশ্বর দস্তিদার, কল্পনা দত্ত এবং শচীন্দ্র দাস গ্রেফতার হন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

- ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দের ৭ জানুয়ারি ইউরোপিয়ান ক্লাবের ক্রিকেট খেলায় বিপ্লবীদের আক্রমণ, তাতে কৃষ্ণ চৌধুরী, নিত্য নারায়ণ সেন, হরেন্দ্র চক্রবর্তী ধৃত হন, দুজন গুলিবিদ্ধ অবস্থায় কিছুক্ষণ পর মারা যান, অন্য দুজনের ফাঁসি হয়।
- ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দের ১২ জানুয়ারি চট্টগ্রাম জেলে মাস্টারদা সূর্যসেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারকে ফাঁসি দেওয়া হয়।
- ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দের ৫ জুন মেদিনীপুর জেলে কৃষ্ণ চৌধুরী ও হরেন্দ্র চক্রবর্তীর ফাঁসি হয়।[৫৫]

@PDF বইয়ের সমাহার

[৫৫] পংকজ চক্রবর্তী : বীরকন্যা প্রীতিলতা, শব্দাঙ্গন, ঢাকা, পৃ. ১১৪-১২০।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

স্বদেশি থেকে বামে মোড়

একপর্যায়ে এই স্বদেশি ও স্বরাজ আন্দোলন 'বামে মোড়' নেয়। প্রশ্ন উঠতে পারে, স্বরাজ আর স্বদেশিদের সাথে বামপন্থি আন্দোলনের কী সম্পর্ক? অনেকেই মনে করেন, স্বরাজ-স্বদেশির উৎপাতের কালে কমিউনিজম বা বামপন্থারও সূচনা ঘটে। ফলে চরমপন্থার উর্বর জমিনে এই বামপন্থার আবাদ গড়ে উঠতে থাকে। আর সেটি ঘটে ১৯২০-এর দশকে। পরবর্তীকালেও দেখা যায় স্বদেশির মহানায়করা সমাজতন্ত্রীদের আরাধ্য হয়ে উঠতে। ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন, প্রীতিলতা প্রমুখ বিপ্লবীরা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বামপন্থি লেখকদের কলমে এদের জাতীয় হিরো হয়ে উঠতে দেখা যায়; যদিও এসব বিপ্লবীদের উত্থান 'হিন্দুজাগরণবাদের' নায়ক হিসেবেই ঘটেছিল বলে জানা যায়।

কল্যাণ চক্রবর্তী লিখেছেন, স্বদেশি আন্দোলন থেকে বাংলায় গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি ও বোমার আবির্ভাব হয়েছিল বলে চালু ধারণাটিকে ঘোর ভ্রান্ত। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, বাঙালির মনস্তত্ত্বের গতিপ্রকৃতি রামমোহন রায় থেকে ক্রমাগত চরমপন্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। উচ্চশিক্ষা ও রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া থেকেই বিপ্লববাদ ও বোমার আবির্ভাব ঘটে, এমনকি কিছু বাঙালি বিপ্লববাদীর মধ্যে ১৯২০-র দশকে 'কমিউনিজমের প্রতিও টান' তৈরি হয়েছিল। চরমপন্থি জাতীয়তাবাদের ভারতব্যাপী তিন কেন্দ্র বাংলা, পঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রের মধ্যে বাংলাই সাংগঠনিক সশস্ত্র বিপ্লববাদের নেতৃত্ব দিয়েছিল বলা যায়। চরমপন্থা অবলম্বন থেকে কেন্দ্রীভূত বিপ্লবী সমিতি গঠনের কাজে বাংলাই সবচেয়ে আগে এগিয়ে এসেছিল।[৫৬]

---

[৫৬] কল্যাণ চক্রবর্তী : অগ্নিযুগের অস্ত্রগুরু, দেশ; ২ আগস্ট, ২০২২, কলকাতা, ভারত।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

স্বদেশি আন্দোলনের নেপথ্যের মহানায়ক বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগো বাংলার প্রথম বোমার কারিগর। তার তৈরি বোমা ব্যবহার করেছেন ক্ষুদিরাম-প্রফুল্লচাকীসহ অনেক বিপ্লবী। হেমচন্দ্র ছিলেন বিপ্লবী রাজনৈতিক সংগঠনের একজন অগ্রগণ্য নেতা।[৫৭] হেমচন্দ্র কানুনগো (১৮৭১-১৯৫১) ছিলেন একজন গোপন রাজনৈতিক সংগঠনের অগ্রদূত নেতা ও আলিপুর বোমা মামলায় (১৯০৮-৯) অরবিন্দ ঘোষের সহ-অভিযোগী। তাকে আন্দামানে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দেওয়া হয়, কিন্তু ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে মুক্তি পান। সম্ভবত তিনিই প্রথম বিপ্লবী ছিলেন, যিনি ভারত থেকে সামরিক এবং রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে গিয়েছিলেন। তিনি প্যারিস থেকে প্রশিক্ষণ নেন। তিনি ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারিতে দেশে ফিরে আসেন। তিনি কলকাতার নিকটে মুরারিপুকুরে অনুশীলন সমিতির এক বোমা বানানোর কারখানা তৈরি করেন। সেই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন হেমচন্দ্র কানুনগো, অরবিন্দ ঘোষ এবং তার ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। মুরারিপুকুরে তার তৈরি তিনটি বোমার প্রথমটি ফরাসি চন্দননগরের মেয়রকে হত্যার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু মেয়র অল্পের জন্য বেঁচে যান। দ্বিতীয়টি বইয়ের আকারের এবং তাতে স্প্রিং লাগানো ছিল। যথাসময়ে বই না খোলাতে কিংসফোর্ড বেঁচে যান। তৃতীয় বোমাটি ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকী মুজফ্ফরপুরে ব্যবহার করেছিলেন।[৫৮]

কল্যাণ চক্রবর্তী জানান, নাড়াজোল রাজবাড়ির অন্দরমহলে বিপ্লবীদের গুপ্ত আস্তানা ছিল। সেখানে অস্ত্রের প্রশিক্ষণ ও বোমা তৈরি চলত, যার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন হেমচন্দ্র। অরবিন্দ, বারীন্দ্র, উল্লাসকর প্রমুখ মাঝেমধ্যেই গোপন সভায় আসতেন। মেদিনীপুর ও নাড়াজোলের দুই প্রাসাদেই এসব ক্রিয়াকলাপ চলত। সম্প্রতি রাজপরিবারের সন্দীপ খান ও অরিজিৎ খানের তথ্যসূত্র থেকে নাড়াজোলের প্রাসাদে জানালাহীন, ছোটো খুপরিযুক্ত এক গুপ্ত কক্ষের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই ধরনের ঘরেই বিপ্লবীদের গুপ্ত মন্ত্রণাসভা বসত। মেদিনীপুরের প্রাসাদের চারপাশে তখন ঘন জঙ্গল ছিল। বিপ্লবীরা সেখানেও সমবেত হতেন। হেমচন্দ্র এই প্রাসাদে অনেক দিন লুকিয়ে ছিলেন।[৫৯]

কল্যাণ চক্রবর্তী জানান, মজফ্ফরপুরে বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছিল ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ এপ্রিল। একদিন পরেই ২ মে ভোরবেলা কলকাতার বেশ কয়েকটি

---

[৫৭] http://www.kholakagojbd.com/prints/25906.

[৫৮] সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং অঞ্জলি বসু সম্পা. *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান* (১ম খণ্ড), সংশোধিত পঞ্চম সংস্করণ, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৬০৪।

[৫৯] কল্যাণ চক্রবর্তী : প্রবন্ধ-অগ্নিযুগের অস্ত্রগুরু, দেশ (পাক্ষিক পত্রিকা); ২ আগস্ট, ২০২২, কলকাতা, ভারত।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জায়গায় ব্যাপক খানাতল্লাশি ও ধরপাকড় চলে। আটটি ডেরায় হানা দিয়ে পুলিশ। অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, কানাইলাল দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হেমচন্দ্র দাসসহ ছত্রিশজনকে গ্রেফতার করে। পরে প্রায় ১০০ জন বিভিন্ন সময়ে ধরা পড়েন। শুরু হয় আলিপুর বোমার মামলা। মানিকতলার মুরারিপুকুরের বাগানবাড়িটি পৈতৃক সূত্রে অরবিন্দ ঘোষ ও তার ভাইদের পারিবারিক সম্পত্তি ছিল। খানাতল্লাশিতে এখানে পাওয়া গিয়েছিল বোমার খোল ঢালাই করার যন্ত্রপাতি, পিউরিক অ্যাসিড, পটাশিয়াম ক্লোরাইড, টিন, তামা, পিতল প্রভৃতি ধাতুর বোমার খোল, নানা আকারের ছাঁচ, রিভলভার, বন্দুক, রাইফেল মিলিয়ে ছয়-সাতটি আগ্নেয়াস্ত্র, ডিনামাইট, ইলেকট্রিক ব্যাটারি, ফিউজ, প্যারিস থেকে আনা খনির ইঞ্জিনিয়ারদের পাঠ্য বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালি শেখানোর ইংরেজি দুইখানা বই। এ ছাড়াও লিথোগ্রাফে ছাপা বিপ্লবীদের বোমা তৈরি ও ব্যবহার প্রণালি শেখার বড়ো পাণ্ডুলিপি একটি, বৈপ্লবিক গুপ্তসমিতি গঠনপ্রণালির নিয়মাবলি, অন্যান্য বই, নোট বই, কাগজপত্র ইত্যাদি। ১৩৪ নম্বর হ্যারিসন রোড থেকে অন্তত সাতটি বোমা পাওয়া গিয়েছিল।[৬০]

কল্যাণ চক্রবর্তীর মতে, আলিপুর জেলে (রাজসাক্ষী) নরেন গোঁসাইকে হত্যার পর কারাগারের মধ্যেই ট্রাইবুনাল বসিয়ে অরবিন্দের উপস্থিতিতে তাঁরা বারীন্দ্রের নেতৃত্বে হেমচন্দ্রকেও শেষ করে ফেলতে চেয়েছিলেন। চতুর হেমচন্দ্র দ্রুত তাঁদের কাছে মার্জনা চেয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলেন। তিনি সংগঠন তৈরি, বোমা তৈরি এবং 'সমাজতান্ত্রিক' আদর্শের যে রূপরেখা দিয়ে সশস্ত্র বিপ্লববাদকে পথ দেখাতে চেয়েছিলেন, তার মধ্যে একমাত্র বোমা তৈরি ছাড়া আর কোনো কিছুই সমকালীন বিপ্লবী নেতৃত্ব গ্রহণ করতে চায়নি। অথচ সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন ও নেতা সম্পর্কে হেমচন্দ্রের প্রায় সব উপলব্ধিই সত্য প্রমাণিত হয়েছিল।[৬১] হেমচন্দ্র স্বদেশিদের জন্য বোমা বানানোর প্রশিক্ষণ নিতে বিদেশ গমন করলেও সেখানে তিনি কমিউনিজমের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন কি না, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। তবে দেশ পত্রিকার নিবন্ধের সূত্রে এমন আভাস উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

রাজসাক্ষী ও পরে দলীয় লোকদের হাতে নিহত নরেন গোঁসাইয়ের স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায়, ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ হেমচন্দ্র, বারীন্দ্র ও অন্যরা বোমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে রংপুরে গিয়েছিলেন। সেখানেই বিদ্যুৎশক্তি প্রয়োগে বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো যায় কি না, সেই ব্যাপারে হেমচন্দ্র চেষ্টা করেছিলেন,

---

[৬০] প্রাগুক্ত।

[৬১] প্রাগুক্ত।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিন্তু তিনি সফল হননি। পুলিশের হাতে ধরা পড়া বরিশালের রাজস্ব দপ্তরের জনৈক বরখাস্ত হওয়া করণিক, হেমচন্দ্রের বন্ধু চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তীর বাজেয়াপ্ত নোটবই থেকে পুলিশ একটি বোমা তৈরির সঙ্কেতসূত্র (Formula) আবিষ্কার করে, যে বোমা তড়িৎশক্তি প্রয়োগে ফাটানো যেত। সামসময়িক বা পরবর্তীকালেও বিপ্লবীদের বোমা তৈরির যে অসংখ্য ফর্মুলা পাওয়া গেছে, তার মধ্যে এই তড়িৎ প্রয়োগে বিস্ফোরণশীল বোমার ফর্মুলা একেবারেই অনন্য। ডা. হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর বইতে উল্লেখ করেছেন, হেমচন্দ্র ইলেকট্রিক ড্রাই সেল সহযোগে বিস্ফোরণে ট্রেন উড়িয়ে দেওয়ার কায়দা বিদেশে বোমা তৈরির সঙ্গে শিখে এসেছিলেন।[৬২]

এ প্রসঙ্গে জগলুল আলমের ভাষ্য উল্লেখ করার মতো। তাঁর মতে, অনুশীলন সমিতির শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে প্রগতিশীল চিন্তাশ্রয়ীদের দলে টেনে তাদের মাধ্যমে সাধারণ লোকের মধ্যে বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রচার এবং বিদ্যমান অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক সংকটের প্রেক্ষাপটে জনগণের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করে পরিস্থিতিকে ক্রমশ সশস্ত্র আন্দোলনে রূপান্তর করাকে পার্টি তার কর্মকৌশল হিসেবে স্থির করে নেয়। এই দল অচিরেই একটি শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয় এবং বৃহত্তর বাংলাদেশের সর্বত্র এর শাখা-প্রশাখা গড়ে ওঠে। এ সমস্ত শাখা সংগঠনের কর্মীরা প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে সন্ত্রাসমূলক তৎপরতা শুরু করেন। পরবর্তীকালে এই অনুশীলন সমিতির সদস্যদের মধ্য থেকেই প্রাতিষ্ঠানিক কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব সৃষ্টি হয়েছে।

সন্ত্রাসবাদী অনুশীলন সমিতির সদস্যদের মধ্যে প্রেরণা ও উদ্দীপনা ছিল, কিন্তু অভাব ছিল অস্ত্র ও অর্থের। অন্যদিকে উৎপত্তি লাভের প্রথম থেকেই ব্রিটিশ রাজসরকার ছিলেন এই বিপ্লবী সংগঠনের ওপর খড়্গহস্ত। ব্রিটিশ পুলিশ এবং তাদের এ দেশীয় সহযোগীরা অনুশীলন সমিতির অসংখ্য বিপ্লবীকে অন্তরিন করেন এবং তাদের বিরুদ্ধে নানা রকম নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অবশ্য এর পরেও সংগঠন ছিল সক্রিয়। বরং জেলখানায় অন্তরিন অবস্থায় বিপ্লবীরা একে অপরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন এবং মার্কসবাদের ওপর বিতর্ক চালানোর সময় ও সুযোগ পেয়ে যান। এ কারণে এদের মধ্যে অনেক বিপ্লবীই পরবর্তীকালে প্রকাশ্য বামপন্থি সংগঠনের গোড়াপত্তন ঘটিয়ে উপমহাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক বামপন্থি আন্দোলনের সূচনা ঘটানোর পথ প্রশস্ত করতে পেরেছিলেন।[৬৩]

---

[৬২] প্রাগুক্ত।

[৬৩] জগলুল আলম : বাংলাদেশে বামপন্থি রাজনীতির গতিধারা (১৯৪৮-৮৯), প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা: ১৯৯০, পৃ. ২।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জগলুল আলমের মতে, রনদীভের থিসিসকে অবলম্বন করে পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব পাকিস্তানের কোনো কোনো স্থানে প্রাথমিকভাবে যেসব কৃষক বিদ্রোহের সূচনা ঘটানো হয়, তাতে করে কমিউনিস্ট পার্টির উপরিউক্ত লাইন গ্রহণের পরিণতি সহজেই স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। এ সমস্ত বিদ্রোহে কোনো সার্বিক সফলতা তো আসেইনি; বরং অপরিকল্পিত বিপ্লবী কর্মসূচি বিভিন্ন অঞ্চলে ত্রাসের সৃষ্টি করে। বিশেষ করে ময়মনসিংহ জেলায় টংক আন্দোলনের নামে হাজং কৃষকদের সশস্ত্র আন্দোলন সারা জেলায় এক অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে।[৬৪]

দুটি প্রশ্ন

উপরিউক্ত বিবরণ পাঠের পর এখানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে আসছে—

এক. স্বদেশি-স্বরাজপন্থিদের কার্যকলাপ কি 'সন্ত্রাসমূলক' দৃষ্টিতে বিচার করা হবে?

দুই. স্বদেশি-স্বরাজপন্থিদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে বামপন্থিদের কর্মকাণ্ডের কী সম্পর্ক?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর পেতে গিয়ে দেখা যায়, ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার অন্যতম ব্যক্তিত্ব কমরেড মুজফফর আহমদ[৬৫] *আমার জীবন* ও *ভারতের*

---

[৬৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

[৬৫] কমরেড মুজফফর আহমদ ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের পথিকৃৎ। মুজাফ্ফর আহমেদ ১৮৮৯ সালের ৫ আগস্ট (তৎকালীন) নোয়াখালী জেলার সন্দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা মনসুর আলী ছিলেন একজন আইনজীবী। সন্দ্বীপে কারগিল হাইস্কুলে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি মাদরাসায় এবং আরও পরে নোয়াখালী জেলা স্কুলে পড়াশোনা করেন। প্রথমে হুগলি কলেজ এবং পরে বঙ্গবাসী কলেজে কলা শাখায় ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্র থাকাকালীন সময়ে মুজাফ্ফর আহমেদ রাইটার্স বিল্ডিং-এর ছাপাখানার চাকরিতে যোগ দেন। এরপর তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদক হিসেবে কাজ করেন। একই সময়ে তিনি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সহ-সম্পাদক ছিলেন। ১৯১৬ সাল থেকে তিনি রাজনৈতিক মিটিং-মিছিলে যোগ দিতে শুরু করেন এবং ১৯২০ সালের শুরুতে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। ১৯২০ সালে মুজাফ্ফর আহমেদ বঙ্গীয় প্রাদেশিক খিলাফত কমিটির সদস্য মনোনীত হন। ১৯২০ সালের ১২ জুলাই মুজাফ্ফর আহমেদ নবযুগের যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। অপর সম্পাদক ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। মুজাফ্ফর আহমেদ এই পত্রিকায় কর্মজীবী মানুষের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ফিচার লেখেন। ১৯২১ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি নবযুগ থেকে পদত্যাগ করেন।
১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর তাসখন্দে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি প্রথমবারের মতো আত্মপ্রকাশ করে। কমরেড মুজাফ্ফর আহমেদ আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিদেশ থেকে এ সংক্রান্ত কাগজপত্র ও জার্নাল সংগ্রহ করতে শুরু করেন। ১৯২২ সালের শেষের দিকে মুজফ্ফর আহমেদ কমরেড

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কমিউনিস্ট পার্টি গ্রন্থে এই বিপ্লবীদের 'সন্ত্রাসবাদী' অভিধায় উল্লেখ করেছেন। 'সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের অভ্যুদয়' শিরোনামে কমরেড মুজফফর প্রদত্ত বিবরণ—

> 'বাঙলায় সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের অভ্যুদয় একটি স্মরণীয় ঘটনা। এটা ছিল একটি গোপন আন্দোলন। বঙ্গভঙ্গের আগেই তাঁদের দল গড়ে উঠেছিল। অবশ্য, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তাঁদের বিশেষ প্রেরণা জুগিয়েছিল। এটা বিশেষ লক্ষণীয় যে, বাঙলা দেশেই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বিশেষ দানা বেধে উঠেছিল। বাঙলার শিক্ষিত 'ভদ্রলোক' সম্প্রদায়ের ভেতরই ছিল তার উর্বর ক্ষেত্র। বাঙলার বাইরেও সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের কর্মপ্রচেষ্টা চলেছে। কিন্তু বাঙলার মতো দীর্ঘস্থায়ী তা কোথাও হয়নি। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে আমার মনের যে অবস্থা ছিল, আর যে রোমাঞ্চ সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে ছিল, তাতে আমার পক্ষে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দলে যোগ দেওয়া অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তার পথে দুস্তর বাধা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দ মঠ' হতে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা প্রেরণা লাভ করতেন।'[৬৬]

কমরেড মুজফফর আহমদ আরও উল্লেখ করেন—

> "হতাশা হতেই সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টি হয়। শিক্ষিত বাঙালী 'ভদ্র' যুবকদের মন বিদ্রোহ ঘোষণা করল এবং তাঁরা পথ বেছে নিলেন সন্ত্রাসের। শুরু করলেন বোমা বানানো, জোগাড় করতে লাগলেন আগ্নেয়াস্ত্র (পিস্তল ও রিভলবার), তাঁদের উদ্দেশ্য সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ইংরেজ শাসকদের দেশ হতে তাড়াবেন। ইংরেজের ভারতীয় অনুচরদেরও উচিত শিক্ষা দেবেন। এইভাবে আরম্ভ হলো 'ভদ্র' যুবকদের বিপ্লবান্দোলন। এই আন্দোলনের ফিলসফি হলো বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ' এবং অন্যান্য লেখা। তাই এই বিপ্লব আন্দোলন হলো হিন্দু পুনরুত্থানের আন্দোলন।"[৬৭]

আব্দুল হালিমের সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁরা যৌথভাবে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর কমরেড মুজাফ্ফর আহমেদের মৃত্যু হয়। তাঁর ৬০ বছরের রাজনৈতিক কর্মজীবনে ৫২ বছরই তিনি পার্টির একজন একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে কাজ করে গেছেন। দ্র. রঞ্জিৎ রায়, *বাংলাপিডিয়া* (খণ্ড-৮), সিরাজুল ইসলাম সম্পা. বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ২১৬।

[৬৬] কমরেড মুজফফর আহমদ : *আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি* (প্রথম খণ্ড), চারদিক প্রকাশনী, ঢাকা; ফেব্রুয়ারি, ২০১৩, পৃ. ২৮।

[৬৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৭।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কমরেডের আক্ষেপ—

'কিন্তু একটা বড়ো মুশকিল হয়েছে এই যে 'সন্ত্রাসবাদী' বিপ্লবীরা আজও মনে করেন তাঁরাই "একমাত্র বিপ্লবী", তাঁরা ছাড়া আর কেউ বিপ্লবী নন। তাঁরা যে পন্থা গ্রহণ করেছিলেন, তাতে তাঁদের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী নামই দেওয়া যায়। আমার লেখায় আমি এই কথা ব্যবহার করি। অন্য শত শত লোক তা-ই লেখেন।'[৬৮]

গোপাল হালদার রচিত *রূপনারায়ণের কূলে* গ্রন্থের বরাতে ড. মাকসুদুর রহমান উল্লেখ করেন, 'স্বদেশি আন্দোলন রাজনৈতিক ভাষ্যকারদের মতে ছিল সন্ত্রাসী কাজ এবং ইংরেজরা একে দেখতেন অরাজকতা হিসেবে।'[৬৯]

ড. এবনে গোলাম সামাদ বলেন, সন্ত্রাসবাদীরা মনে করতেন, ব্রিটিশ রাজের উচ্চ সরকারি কর্মচারীদের হত্যা করলে ব্রিটিশ প্রশাসন ভেঙে পড়বে; ঘটবে ব্রিটিশ রাজের পতন। এই জন্য তাদের নাম হয়েছিল 'সন্ত্রাসবাদী'। কারণ, এরা চেয়েছিলেন, ব্রিটিশ উচ্চ রাজ কর্মচারীদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে তাদের ওপর নির্ভরশীল ব্রিটিশরাজকে দুর্বল করে দিতে। এ ছাড়া সন্ত্রাসবাদীরা ইউরোপীয় অ্যানার্কিস্টদের মতো মনে করতেন, অরাজকতা বহন করে আনবে সমাজবিপ্লব। ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল রাত ৯টা ৪৫ মিনিটে চট্টগ্রামের সন্ত্রাসীরা সেখানকার সরকারি অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে এবং চট্টগ্রাম শহরকে ১০ দিন দখলে রাখে। সে সময় এটা ছিল একটা খুবই চাঞ্চল্যকর ঘটনা। কিন্তু এই সন্ত্রাসবাদী দলে কোনো মুসলমান ছিল না। এটা ছিল কেবলই একটা হিন্দুত্ববাদী দল। বঙ্কিমচন্দ্রের *আনন্দমঠ* (১৮৮২) ছিল এর রাজনৈতিক চেতনার উৎস। এরপর ১৯৩২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার-এর নেতৃত্বে চট্টগ্রামের শহরতলীতে অবস্থিত ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রান্ত হয়। তিনি এখানে আহত অবস্থায় সায়ানাইড ক্যাপসুল খেয়ে মারা যান। মৃত্যুর পর তার দেহ তল্লাশি করে বুকে ব্লাউজের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের একটি ছবি পাওয়া যায়।

সন্ত্রাসবাদী দলে কেবল যে মুসলমানদেরই নেওয়া হতো না তা নয়, নিম্নবর্ণের হিন্দুদেরও নেওয়া হতো না। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্য থেকে বাছাই করা হতো তরুণদের। এ সময়ের সরকারি নথিপত্র থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

---

[৬৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৯।

[৬৯] ড. মো : মাকসুদুর রহমান, *বঙ্গভঙ্গ ও বাঙালি ঐক্য?*, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা; ২০১৪, পৃ. ৪৮।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৭০এবনে গোলাম সামাদ আরও উল্লেখ করেন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন এ দেশে সবার কাছে আদৃত হতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ যতগুলো উপন্যাস লিখেছেন, তার মধ্যে *চার অধ্যায়* একটি। রবীন্দ্রনাথের এই উপন্যাসটি তাঁর লেখা অন্য আর সব উপন্যাসের চাইতে অধিক দ্রুত ও অধিক সংখ্যায় বিক্রি হতে পেরেছিল। এর একটি কারণ হলো, রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই উপন্যাসে বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে করেছেন কঠোর সমালোচনা। সে সময়ের ব্রিটিশ প্রশাসন রবীন্দ্রনাথের এই উপন্যাসটি ক্রয় করে বিভিন্ন জেলে সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে বিলি করেছিল।[৭১]

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরও পাওয়া যায় কমরেড মুজফফর আহমদের গ্রন্থে। তিনি উল্লেখ করেন, সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা জেলখানায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদ পড়েছিলেন এবং তাঁদের ভেতর হতে বহুসংখ্যক লোক ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। মুজফফর এই বিপ্লবীদের 'সন্ত্রাসবাদী' অভিধায় উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, *আনন্দ মঠ* পুস্তকখানি শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। এর মূলমন্ত্র ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' গান। তাতে আছে—

'বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বংহি দুর্গা দশ-প্রহরণ ধারিণী।'

কমরেড মুজফফরের প্রশ্ন—

'একেশ্বরবাদী কোনো মুসলিম ছেলে কী করে এই মন্ত্রোচ্চারণ করতে পারত? ওই কথাটা কোনো হিন্দু কংগ্রেস নেতাও কোনোদিন বুঝতে পারেননি। বাঙলা দেশের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন নিঃসন্দেহে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ছিল। কিন্তু তা হিন্দু উত্থানের আন্দোলনও ছিল। উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। বারীন্দ্রকুমার ঘোষও আন্দামান হতে ফেরার পরে এই কথাই লিখেছিলেন। তাঁর সেই পুস্তকখানি এখন দুষ্প্রাপ্য। উনিশশ' বিশের দশকে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের মধ্যে ধারণার পরিবর্তন শুরু হয়েছিল। তবুও আমি ১৯২৩-২৪ সালে তাঁদের একজন বড়ো নেতাকে দেখেছি, যে বিকালে তিনি জেলে এলেন, তার পরের সকালেই জেল অফিসে একটি সম্ভ্রমাকর্ষক কালীর ছবির জন্য (An Imposing Picture of Goddess Kali) অর্ডার পাঠালেন।

---

৭০ এবনে গোলাম সামাদ, *রচনা সংগ্রহ-২*, পরিলেখ প্রকাশনী, রাজশাহী; ২০২২, পৃ. ৮৪।

৭১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬০।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উনিশশ' ত্রিশের দশকে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা জেলখানায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদ পড়েছিলেন এবং তাঁদের ভেতর হতে বহুসংখ্যক লোক ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন।'[৭২]

মুজফফর আহমদ কমিউনিস্ট তাত্ত্বিক মানবেন্দ্রনাথ রায় (এম.এন রায়) প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন, বাংলা দেশের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদেও ভেতরে তিনি অজ্ঞাত অখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন না, সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী সংগঠনগুলোর কথা তিনি জানতেন, এসব সংগঠনের নেতাদেরও তিনি চিনতেন। কমরেড মুজফফর আরও বলেন, নলিনী গুপ্ত যখন ভারতে আসছিলেন, তখন এম. এন রায় দরকার হলে তাঁকে ন্যাশনালিস্ট ও খিলাফত আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন। তাঁর আসল কাজ অবশ্য ছিল সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সঙ্গে এম. এন. রায়ের সংযোগ স্থাপন করা। কারণ, নলিনী গুপ্ত তাঁকে বলেছিলেন যে, তিনি সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী নেতাদের তরফ থেকে মস্কো গিয়েছিলেন।

কমরেড মুজফফর বলেন—

'আমাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পরেও নলিনী গুপ্ত সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। এটা তাঁর পক্ষে একটা প্রেস্টিজের ব্যাপার হয়ে পড়েছিল। বিখ্যাত আমেরিকান ডেন্টাল সার্জন ডক্টর সুবোধ সেনগুপ্তের এক খুড়তুতো ভাই কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনে চাকরি করতেন। তাঁর নাম ছিল অজয় সেনগুপ্ত। অবশেষে তিনি (অজয় সেনগুপ্ত) একদিন সত্য সত্যই নলিনী গুপ্তের সঙ্গে একজন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী নেতার সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দিলেন। তাঁর নাম ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত। তাঁকে কেউ যেন ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে ভুল করে বসবেন না। এটা ১৯২২ সালের মার্চ মাসের কথা। ডক্টর দত্ত দেশে ফিরেছিলেন ১৯২৫ সালে। ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী মহলে সুখ্যাত ও সম্মানিত ব্যক্তি, আজও (১৯৬৭) বেঁচে আছেন। নলিনীর সঙ্গে ভূপেন্দ্রকুমারের প্রথম সাক্ষাৎ হয় ওয়েলিংটন স্ট্রীটে ডাক্তার টি. এন. রায়ের চেম্বারে। কিছুক্ষণ কথা হওয়ার পরে নলিনী তাঁকে সঙ্গে করে আমাদের তালতলা লেনের বাসায় নিয়ে আসেন। সেখানে আমার সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ও কথাবার্তা হয়। যতটা মনে পড়ে, সময়টা ১৯২২ সালের মার্চ মাসের শুরু ছিল। তার একদিন কিংবা দুদিন পরে নলিনী দেশ ছেড়ে চলে যায়।'[৭৩]

---

[৭২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

[৭৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪-৯৬।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুজফফর আহমদের স্মৃতিচারণ—

'দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন সৃষ্টি করব ও কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলব— এই অসাধ্য সাধনের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমি সবে পথে বা'র হয়েছি। নিজের অযোগ্যতার কথা প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ মর্মে মর্মে অনুভব করছি। তবুও ভাবছি পথে যখন বার হয়ে পড়েছি, তখন ফেরার পথ আর নেই। নলিনী গুপ্ত চলে যাওয়ার পূর্বক্ষণে ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের সঙ্গে যে তাঁর দেখা হয়েছিল সে কথা পূর্বে বলেছি। তিনি সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী পার্টির লোক। অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম বন্ধ থাকলেও ভূপেন্দ্রকুমারের পেছনে তখনও যুবকেরা রয়েছেন। তিনি যখন আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন এবং আমাদের সঙ্গে সংযোগ রেখে চলবেন, এমনকি কাজও করবেন বলে ওয়াদা করলেন, তখন আমি সত্যিই বড়ো খুশি হয়েছিলেম। নিজের মনে অনেকটা বলও পেয়েছিলাম। এখানে আমি বলে রাখতে চাই যে, কমিউনিস্ট আন্দোলনে নেমে আমার প্রথম সংযোগ হয়েছিল ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের সঙ্গে।'[৭৪]

উপরিউক্ত তথ্যই বলে দেয়, স্বদেশি-স্বরাজপন্থিদের কার্যকলাপ 'সন্ত্রাসমূলক' ছিল কি না এবং স্বদেশি-স্বরাজপন্থিদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে বামপন্থিদের কর্মকাণ্ডের সম্পর্কের সূত্র কী ছিল।

@PDF বইয়ের সমাহার

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তৃতীয় অধ্যায়

@PDF বইয়ের সমাহার

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বাংলায় সেভিয়েতপন্থি কমিউনিস্টদের সন্ত্রাস

ব্রিটিশ পর্বে স্বরাজের দাবিতে স্বদেশিদের আন্দোলনকালে কীভাবে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হয়েছে এবং সেসবের কী প্রতিক্রিয়া হয়েছে, তার কিছু ধারণা ইতোমধ্যেই পাওয়া গেছে। এও জানা গেছে যে, সেইসব কর্মকাণ্ডের উত্তরাধিকারী হিসেবে পরবর্তী সময়ে কমিউনিস্ট তথা সমাজতন্ত্রীরাই ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। সে সময় পর্যন্ত সমাজতন্ত্র কিংবা কমিউনিজমের প্রধান কেবলা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। পৃথিবীর যে স্থান থেকেই সমাজতন্ত্রের আওয়াজ উঠুক না কেন, তা ছিল মস্কো থেকে উত্থিত আওয়াজেরই প্রতিধ্বনি। যাবতীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক সমর্থন মিলত সেখান থেকেই। অতঃপর বাংলায় সেভিয়েতপন্থি সমাজতন্ত্র ও কমিউনিস্টদের সন্ত্রাসী কর্মতৎপরতার বিষয় আলোচিত হবে।

ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হয়ে জন্মলাভ করে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক দেশ। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের এই দেশ ভাগের পর উপমহাদেশের সশস্ত্র আন্দোলনে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। পূর্ববর্তী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনগুলোর লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ ও অধিকার প্রতিষ্ঠা। ভারত বিভক্তির পর আন্দোলনের চরিত্রও বদলে যায়। আশরাফ কায়সার উল্লেখ করেন, ত্রিশের দশকে প্রতিষ্ঠিত হয় অবিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে পরবর্তী সময়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে সৃষ্টি হয় রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত কৃষকদের সশস্ত্র সংগ্রাম। এ সময়ে কৃষকদের সংগঠিত সশস্ত্র সংগ্রামগুলোর মধ্যে অন্যতম ১৯৪৮-৫০ খ্রিষ্টাব্দের সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম. নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ ও টংক আন্দোলন।

১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটিশ প্রদত্ত স্বাধীনতাকে 'সত্যিকারের স্বাধীনতা নয়' ঘোষণা করে সশস্ত্র বিদ্রোহের ডাক দেয়।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জঙ্গি সংগঠন গড়ে তুলে বুর্জোয়া উচ্ছেদের বিপ্লবী রণকৌশল প্রণয়ন করে পার্টি। দলের মতে, তখন 'জনগণের মধ্যে বিপ্লবী জোয়ার আছে'। এই কর্মসূচির আলোকেই ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানের কয়েক জায়গায় জঙ্গি কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে।[৭৫]

চার পুলিশ হত্যা

ব্রিটিশ থেকে স্বাধীনতা লাভের মাত্র তিন বছরের মাথায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পুলিশ হত্যার মতো ঘটনা সংঘটিত হয়। সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে এই আন্দোলন চালানো হয়। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে পূর্ব পাকিস্তানের বহুল আলোচিত নাচোল বিদ্রোহকালে চারজন পুলিশকে পিটিয়ে হত্যার মধ্য দিয়ে এ দেশে পুলিশ হত্যার প্রচলন করে কমিউনিস্ট পার্টি। চাঁপাই নবাবগঞ্জের নাচোল থানায় সংঘটিত এই হত্যাকাণ্ডে নিহত হন দারোগা তফিজউদ্দীন এবং কনস্টেবল শাহাদত আলম, নওজেশ ও তাপস চন্দ্র আচার্য। এদের পিটিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে লাশ মাটিতে পটুতে ফেলা হয়। এই ঘটনায় নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগে কমিউনিস্ট নেত্রী ইলা মিত্রকে[৭৬]

---

৭৫ আশরাফ কায়সার : বাংলাদেশে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা; ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫, পৃ. ২১।

৭৬ রাজনীতিক কমিউনিস্ট নেত্রী ইলা মিত্র ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ অক্টোবর ভারতের কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নগেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, অবিভক্ত বাংলার ডেপুটি অ্যাকাউনটেন্ট জেনারেল। মা মনোরমা সেন। তিন বোন ও তিন ভাইয়ের মধ্যে ইলা ছিলেন জ্যেষ্ঠ। তিনি ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে বেথুন স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন, ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে বেথুন কলেজ থেকে আই.এ এবং ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে একই কলেজ থেকে অনার্সসহ বি.এ পাস করেন। ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে এম.এ পরীক্ষা পাশ করেন। ছাত্রাবস্থায় জড়িত হন রাজনীতির সঙ্গে। যুক্ত হন গার্লস স্টোরস কমিটি, ছাত্র ফেডারেশন, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে।
১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে ইলা মিত্র বিয়ে করেন রাজনীতিক কমরেড রমেন্দ্রনাথ মিত্র ওরফে রমেন মিত্রকে। ইলা মিত্রের শ্বশুরবাড়ি (বাংলাদেশের) চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার রামচন্দ্রপুরহাটে। ইলা মিত্রের শ্বশুর মহেন্দ্রনাথ মিত্র (দেওয়ান) ছিলেন তৎকালীন সময়ের স্বনামধন্য জোতদার। রাজনৈতিকভাবে রমেন মিত্র ও ইলা মিত্র দুজনেই ছিলেন তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য ও কমরেড। ইলা মিত্র বিয়ের পর চাঁপাইনবাবগঞ্জের কৃষ্ণগোবিন্দপুর স্কুলে বিনা বেতনে শিক্ষকতার কাজ করেন। ১৯৪৬-৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ফসলের দুই-তৃতীয়াংশের ওপর কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে বাংলায় গড়ে ওঠা তেভাগা আন্দোলনে বিশেষভাবে নাচোলের

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গ্রেফতার ও বিচার করা হয়। বিচারে মামলার তেইশ জন আসামিকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দেওয়া হয়। তবে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে ইলা মিত্র মুক্তি পেয়ে ভারতে চলে যান। সেই পঞ্চাশে ঘটা পুলিশ হত্যার ঘটনাকে 'গৌরবময় অধ্যায়' হিসেবে স্মরণ করে থাকেন বামপন্থিরা।

মামলার বিবরণ : নাচোল হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আইনজীবী অঙ্কুর সেন একটি বিবরণে উল্লেখ করেন—১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দের ১০ জানুয়ারি রাজশাহীর দায়রা জজ এস. আহম্মদ ইংরেজি ভাষায় টাইপ করা ১০০ পাতায় সমস্ত ঘটনা এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ বিশ্লেষণ করেন। এরপর তিনি সম্মানিত নয়জন জুরিকে ১৪৮টি প্রশ্ন করেন। এ মামলায় শুধু একজন খালাসের পক্ষে মত দেন, বাকি আটজন দোষী সাব্যস্ত করেন আসামি ২৩ জনকেই। বিজ্ঞ বিচারক মামলার বিষয়বস্তুর শুরুতে জুরিদের উদ্দেশ্যে বলেন—'ভদ্র মহোদয় ও জুরিগণ, আপনারা সব শুনেছেন। আমি এখন প্রয়োজনীয় আইন এবং সাক্ষ্য পর্যালোচনা করব আপনাদের কাছে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য। আপনারা সঠিক সিদ্ধান্ত দেবেন আসামিরা দোষী না নির্দোষ। আপনারা প্রত্যেকে এককভাবে পৃথক পৃথক সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। আপনারা যদি এই মামলা সম্পর্কে আদালতের বাইরে কিছু শুনেও থাকেন, তবে তা অনুগ্রহ করে ভুলে যাবেন। আপনারা অবশ্যই কারও দ্বারা প্রভাবিত হবেন না। আপনারা যদি দ্বিমত পোষণ করেন, তবে তা কোনো প্রকার সংকোচ না করে সরাসরি মতামত দেবেন। কিন্তু যদি আইনের কোনো প্রশ্ন থাকে, তবে তা আমি পর্যালোচনা করব।'

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—আসামিরা আদৌ দোষী কি না? আপনারা জানেন, আইনে কোনো বিশেষ ঘটনা প্রমাণ করতে একাধিক সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয় না। সাক্ষী হিসেবে একজনই যথেষ্ট, যদি সে বিশ্বাসযোগ্য হয়। যদি বিশ্বাসযোগ্য না হয়, তবে শত সাক্ষীরও কোনো মূল্য নেই। বাদী পক্ষের মামলা হলো—৫ জানুয়ারি,

---

কৃষকদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে ইলা মিত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই আন্দোলনকালে পুলিশের একজন দারোগাসহ চারজন পুলিশ নিহত হন। তাদের লাশ পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়। পরে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে। এর জের ধরে বিচারে ইলা মিত্রসহ ২৩ জন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তবে ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হলে চিকিৎসার প্রয়োজনে প্যারোলে মুক্তি পেয়ে কলকাতা যাওয়ার পর ইলা মিত্র আর পূর্ব বাংলায় ফিরে আসেননি। ১৯৬২-৭৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মানিকতলা নির্বাচনি এলাকা থেকে তিনি পরপর চারবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ২০০২ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ অক্টোবর কলকাতায় ইলা মিত্রের মৃত্যু হয়। দ্র. সরদার আবদুর রহমান : *বরেন্দ্র চরিতকোষ*, হেরিটেজ রাজশাহী, ডিসেম্বর ২০১৮, পৃ. ৭৫।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১৯৫০ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় নাচোল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মৌলভী তফিজ উদ্দিন মোল্লা সঙ্গে কনস্টেবল শাহাদত আলম, নওজেস আলী এবং তাপস চন্দ্র আচার্যদের নিয়ে একটা গরুর গাড়িতে করে ঘাসুরা গ্রামে সরকারি দায়িত্ব পালন করতে যান। তারা জনৈক অক্ষয় পণ্ডিতের খলিয়ানে গাড়ি থামায়। তাদের কাছে অভিযোগ আসে, এলাকার কমিউনিস্টরা জোর করে ধান নিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ এদের মধ্যে দুজনকে আটক করে ঘাসুরা প্রাইমারি স্কুলে নিয়ে যায়। এরপর সাঁওতাল নেতা ইলা মিত্র, মাতলা মাঝি, হাবু মিত্র, অনিমেষ লাহিড়ী, আজাহার শেখ এবং বিন্দাবন সাহাসহ ২৪০/৩০০ জন মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সেখানে যায়। তারা পুলিশের কাছ থেকে ২৫/৩০ হাত দূরে অবস্থান নেয়, কেউ কেউ আমগাছেও চড়ে থাকে।

একপর্যায়ে সেখানে গন্ডগোল শুরু করে। দারোগা তাদের বলে, 'তোমাদের অভিযোগ কী?' তখন সাঁওতাল নেতারা বলে, 'অস্ত্র না নামানো পর্যন্ত আমরা কোনো কথাই বলব না।' পুলিশ সাঁওতালদের কথা না শুনলে আসামি ইলা মিত্র, অনিমেষ লাহিড়ী, আজাহার শেখ এবং বিন্দাবন পুলিশদের আক্রমণ করতে হুকুম দেয়। আসামি আজাহার শেখ লাঠি দিয়ে দারোগা তফিজ উদ্দিনের মাথায় আঘাত করে। শুরু হয় যুদ্ধ। এ যুদ্ধে দারোগা তফিজ উদ্দিন মোল্লা, সিপাই শাহাদত আলম, নওজেশ আলী ও তাপস চন্দ্র আচার্য নিহত হয়। নিম্ন আদালতের একজন উর্ধ্বতন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মামলাটি প্রাথমিক তদন্ত শেষে ২৩ জন আসামিকে বিচারের জন্য সোপর্দ করেন। এ মামলায় আসামি পক্ষের বক্তব্য হলো—প্রকৃত অপরাধী পালিয়ে গেছে এবং তারা হিন্দুস্তানে আশ্রয় নিয়েছে।

ইলা মিত্র সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ডিফেন্স মামলা হচ্ছে ঘটনার সময় সে উপস্থিত ছিল না। রাজশাহীর তৎকালীন দায়রা জজ এস আহম্মদ জুরিদের উদ্দেশ্যে ১০০ পৃষ্ঠা ইংরেজি ভাষায় লেখা আইন এবং সাক্ষ্য পর্যালোচনা থেকে ৯ জন জুরির প্রত্যেককে ২৩ জন আসামি সম্পর্কে ১৩৮টি প্রশ্ন করেন এবং তা পৃথক কাগজে লিপিবদ্ধ করেন। জুরিগণ প্রত্যেক প্রশ্নে ৮-১-এ বিভক্ত হয়ে যান। অর্থাৎ ৮ জন জুরি এ মামলায় ২৩ জনকেই দোষী সাব্যস্ত করেন এবং সাজা হওয়ার যোগ্য মামলা বলে অভিমত প্রকাশ করেন, মাত্র একজন জুরি প্রত্যেক প্রশ্নে ২৩ জনকেই নির্দোষ বিবেচনা করেন এবং তাদের খালাস দেওয়ার পক্ষে মতামত দেন। বিজ্ঞ বিচারক সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের ভিত্তিতে ১১ জানুয়ারি, ১৯৫১ তারিখে জুরিদের (৮-১) অভিমত অনুসারে ২৩ জন আসামি সকলকেই দণ্ডবিধি আইনের ৩০২/১৪৯ ধারায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করেন।[৭৭]

---

[৭৭] অঙ্কুর সেন, এডভোকেট : প্রবন্ধ : সেই ইলা মিত্রের ঐতিহাসিক মামলা, *অনন্যা ম্যাগাজিন*, সম্পাদক হাসনা *হেনা ঝরা*, রাজশাহী এডভোকেট বার এসোসিয়েশন; ফেব্রুয়ারি, ২০০৭।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আশরাফ কায়সারের মতে, নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয় ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের শেষ ভাগ এবং ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের গোড়ার সময়কালটা জুড়ে। এই বিদ্রোহ ছিল তেভাগা আন্দোলনের[৭৮] পরিবর্তিত অংশ। বিদ্রোহের মূল শক্তি ছিল সাঁওতাল কৃষকরা। ফসলের এক-তৃতীয়াংশের বদলে দুই-তৃতীয়াংশের দাবিতে সংগঠিত এই কৃষক বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিল কমিউনিস্ট পার্টি। এই আন্দোলনে তফিজ উদ্দিন মোল্লা নামে পুলিশের একজন দারোগাসহ ৪ জন কনস্টেবলকে ঘেরাও করা হয় এবং গণপিটুনিতে তারা নিহত হন। এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় পরে পুলিশ ও আনসার বাহিনীর হাতে প্রচুরসংখ্যক সাঁওতাল নিহত হয়।[৭৯]

@PDF বইয়ের সমাহার

---

[৭৮] তেভাগা আন্দোলনের সূচনা ঘটে ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবরে। সে বছর খুলনা জেলার মৌভোগে কৃষক সভার যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে কৃষ্ণবিনোদ রায়ের সভাপতিত্বে যেসব প্রস্তাব নেওয়া হয়, তাতেই প্রথম তেভাগা আন্দোলনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। কাকদ্বীপের (২৪ পরগনা) বুধাখালি থেকে এই আন্দোলনের সূচনা করেন গঙ্গেন মালি নামক এক কৃষকনেতা। তেভাগার সংগ্রামের প্রধান দাবিগুলো ছিল :

১. উৎপন্ন ধানের তিন ভাগের দুই ভাগে নিজ অধিকার স্থাপন।

২. ধার করা ধানের ওপর সুদপ্রথার অবলুপ্তি।

৩. রশিদ ছাড়া কোনো ধান দেওয়া হবে না বলে স্থির করা।

৪. আবাদযোগ্য পতিত জমিতে আবাদের ব্যবস্থা করা।

(দ্র. https://digiexamguide.com/738-2/)

[৭৯] আশরাফ কায়সার : *বাংলাদেশে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা; ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫, পৃ. ২২।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রণদীভ লাইনের সম্প্রসারণ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম নীতিনির্ধারক রণদীভের লাইন ছিল সশস্ত্র লড়াইয়ের মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জন। এই লাইন গ্রহণ করে বাংলাদেশে তৎপর কমিউনিস্ট পার্টি। ড. মর্তুজা খালেদ উল্লেখ করেন, পরবর্তী সময়ে রণদীভের বিপ্লবী লাইনের আরও সম্প্রসারণ ঘটানো হয়। বলা হয়, ভারত বিভক্তি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও উভয় দেশের প্রতিক্রিয়াশীলদের ষড়যন্ত্রের ফল এবং উভয় দেশের জনগণ এর দুর্ভোগ ভোগ করছে। অথচ উভয় দেশে বিপ্লবী অবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। তাই এই দুরবস্থার সমাপ্তি ঘটাতে হলে উভয় দেশের কমিউনিস্টদের ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহতভাবে সমস্ত শক্তিকে পরিচালিত করতে হবে। ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি ভারত ও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় কমিটির যৌথ বৈঠকে পৃথক কেন্দ্রীয় কমিটি বাতিল করা হয়। একইভাবে পরবর্তী সময়ে উভয় বাংলার কেন্দ্রীয় কমিটি বাতিল করে গঠন করা হয় মিলিত প্রাদেশিক কমিটি। যৌথ কমিটি গঠন করায় পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকলাপের কোনো জবাবদিহিতা ছিল না। রণদীভের রাজনৈতিক লাইন অনুসরণের সময় পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন পশ্চিম বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পরামর্শে পরিচালিত হয়েছিল।[৮০]

আরও উল্লেখ করা হয়, কলকাতার কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস থেকে ফেরার পর ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে লালমণিরহাটে পূর্ব বাংলার সমস্ত জেলা কৃষক প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন বসে। মণি সিংহ, খোকা রায়, নগেন সরকার, প্রমথ গুপ্তসহ পূর্ব বাংলার সকল শীর্ষস্থানীয় কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ

---

[৮০] ড. মর্তুজা খালেদ : বাংলাদেশের কমিউনিস্ট ও বাম আন্দোলনের বিকাশধারা এবং রাজশাহী জেলা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা; জানুয়ারি, ২০২২, পৃ. ৫০।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। এখানে দলের সাংগঠনিক ক্ষমতাসহ নতুন রাজনৈতিক লাইন কার্যকর করার পন্থা নিয়ে আলোচনা হয়। এ সম্মেলনে রণদীভের রাজনৈতিক লাইন অনুযায়ী সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বিপ্লব সম্পন্ন করার কাজ শুরুর সিদ্ধান্ত হয়।[৮১]

কমিউনিস্ট পার্টির বিষয়ে তৎকালীন পূর্ব বাংলার পুলিশের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, 'কমিউনিস্ট পার্টি প্রকৃতিগতভাবে সাহসী উপজাতি ও নমশুদ্রদের গেরিলা যুদ্ধের কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় স্থানীয় ইস্যু নিয়ে লড়াই সংগ্রাম সংগঠিত করছে। অনেক জায়গাতেই এ জাতীয় লড়াইয়ে মানুষ আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে বেপরোয়া সব কর্মকাণ্ড চালিয়েছে।' পুলিশ প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয় যে, '...প্রায় ১০০ জন শীর্ষস্থানীয় কমিউনিস্ট এ বছর আন্ডারগ্রাউন্ডে গিয়ে বিশেষত সীমান্ত এলাকা, আংশিকভাবে বিচ্ছিন্ন এলাকা, আসাম সীমান্তে ময়মনসিংহ ও সিলেট এলাকা, চব্বিশ পরগণা সীমান্তের যশোর ও খুলনা এলাকা, বার্মা সীমান্তে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা এবং পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার সীমান্তে দিনাজপুর ও রংপুরে পার্টির ভিত্তি সংগঠিত করার কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। রণদীভের লাইন কার্যকর করতে গিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি এ সময় সরকার উচ্ছেদের আহ্বান জানিয়ে হাজার হাজার গোপন ইস্তেহার বিলি করে।'[৮২]

সশস্ত্র টংক আন্দোলন

টংক আন্দোলন প্রথম গড়ে উঠেছিল ব্রিটিশ ভারতে। এ সময় হতে পাকিস্তান আমল পর্যন্ত মোট তিন দফায় টংক আন্দোলন সংগঠিত হয়। ড. মর্তুজা খালেদ বলেন, রণদীভের নীতি কার্যকর করতে গিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ময়মনসিংহ জেলায় টংক আন্দোলন শুরু করে। এটি ছিল তৃতীয় পর্যায়ের টংক আন্দোলন। এর পূর্বে প্রথমবার ১৯৩৬-৩৭ সালে টংক আন্দোলন হয়, যা শেষ হয় ১৯৪০ সালে।[৮৩]

আব্দুল কুদ্দুস সিকদার উল্লেখ করেন, ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলায় কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠার কিছুদিন পরই সেখানে প্রথম দফায় গড়ে উঠেছিল

---

[৮১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।

[৮২] আব্দুল কুদ্দুস সিকদার : বাংলাদেশের বাম রাজনীতি : ১৯৪৭-১৯৭১, পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, ২০১২-২০১৩, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

[৮৩] ড. মর্তুজা খালেদ : বাংলাদেশের কমিউনিস্ট ও বাম আন্দোলনের বিকাশধারা এবং রাজশাহী জেলা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা; জানুয়ারি, ২০২২, পৃ. ৫৩।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

টংক আন্দোলন। এ সময় এ আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন মনি সিংহ। এ ছাড়াও প্রমথ গুপ্ত, ললিত সরকার, নগেন সরকার, রবি নিয়োগী টংক[৮৪] আন্দোলন গড়ে ওঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আব্দুল কুদ্দুস সিকদার[৮৫] আরও জানান, ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর সুসং-দুর্গাপুরের নিকটবর্তী হাজং-গারো অধ্যুষিত বহেরাতলী গ্রামে পাঁচজন পুলিশ তল্লাশি করতে গেলে হাজং মেয়েরা দা নিয়ে তাড়া করে। এতে ভয় পেয়ে পুলিশ পালিয়ে যায়। পরে ম্যাজিস্ট্রেটকে সাথে নিয়ে ২৫ জন পুলিশ ওই গ্রামের কুমুদিনী নামক এক মেয়েকে ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের গুলিতে রাশমনি নামক একজন বয়স্কা মহিলা ও সুরেন্দু নামক একজন পুরুষ নিহত হন। এ অবস্থায় আন্দোলনকারীদের বল্লমের আঘাতে ঘটনাস্থলেই দুজন পুলিশ নিহত হয়।[৮৬]

একই ঘটনার বিবরণে মাহফুজউল্লাহ'র লেখায় দেখা যায়, একটি গেরিলা গ্রুপ মেয়েদের সাহায্যার্থে গেরিলা কায়দায় বহুক্ষণ সৈন্যদের সাথে লড়াই চালিয়ে যায় এবং সৈন্যদের থেকে একটি রাইফেল ও একটি স্টেনগান দখল করে। কমরেড শচী রায় পাহাড় এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির কারখানাগুলো পরিচালনা করতেন। তিনি নিজেও দেশি বন্দুক ও বোমা তৈরি করতে পারতেন। বোমা তৈরির সময় এক বিস্ফোরণের ফলে তিনি মারা যান।[৮৭]

দালাল হালাল করো

কমিউনিস্ট পার্টি নিজেদের হাতে আইন তুলে নিয়ে মানুষ হত্যার লাইসেন্স লাভ করে রণদীভের লাইনের মাধ্যমে। ড. মর্তুজা খালেদ উল্লেখ করেন, রণদীভের লাইন কার্যকর করতে গিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি 'দালাল হালাল করো কার্যক্রম' শুরু করে। সশস্ত্র সংগ্রামের অংশ হিসেবে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি এ নীতি

---

[৮৪] টংক ছিল জমিদারের জমিতে চাষাবাদ করার জন্য কৃষক কর্তৃক ধানে পরিশোধযোগ্য পূর্বনির্ধারিত একপ্রকার খাজনা। এ প্রথায় জমিদারকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ধান খাজনা হিসেবে দেওয়ার শর্তে প্রতিবছর নিলাম ডাকের মাধ্যমে কৃষককে জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হতো। ফসল হোক বা না হোক, জমিদারকে টংক পরিশোধ করতে হতো। সুসং-দুর্গাপুর অঞ্চলে এ ব্যবস্থা 'টংক' নামে পরিচিত ছিল। টংক ছিল একটি স্থানীয় নাম। দ্র. আব্দুল কুদ্দুস সিকদার : বাংলাদেশের বাম রাজনীতি : ১৯৪৭-১৯৭১, পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, ২০১২-২০১৩, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

[৮৫] আব্দুল কুদ্দুস সিকদার : বাংলাদেশের বাম রাজনীতি : ১৯৪৭-১৯৭১, পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, ২০১২-২০১৩, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

[৮৬] প্রাগুক্ত।

[৮৭] মাহফুজউল্লাহ : বাংলাদেশে কৃষক আন্দোলন : কৃষক নেতাদের সাক্ষাৎকার ও পর্যালোচনা, *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ২১ ফেব্রুয়ারি সংখ্যা, ১৯৭৮।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গ্রহণ করে। কমিউনিস্ট পার্টির জেলা ও মহকুমা শাখাগুলো এ নীতি মেনে নিয়ে স্থানীয়ভাবে দালালদের তালিকা প্রস্তুত করে। যে সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি কমিউনিস্টদের কাজকর্ম সমর্থন না করে বরং বাধা দিতো কিংবা যারা সরকার সমর্থক ছিল এবং পুলিশের সাথে যোগাযোগ রাখত, তাদেরই 'দালাল' বলে মনে করা হতো। এ নীতি কার্যকর করতে গিয়ে বেশ কিছু দালালকেও হত্যা করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো নড়াইলের 'দালাল' নূরুল হুদা। সে-ই ছিল কমিউনিস্টদের হাতে নিহত প্রথম দালাল। নড়াইলের অন্যান্য স্থান ছাড়াও খুলনায় ও নাটোরে বেশ কিছু দালালকে হত্যা করা হয়।[৮৮]

কিশোরগঞ্জের হত্যা

কিশোরগঞ্জে সমাজতন্ত্রীদের কথিত কৃষক আন্দোলেনে হত্যালীলা চলার তথ্য পাওয়া যায়। মো. রফিকুল হক আজাদ উল্লেখ করেন, স্থানীয় জমিদার, তালুকদার, জোতদার, মহাজনদের বিরুদ্ধে ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের মে-জুন মাসে তীব্র কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে। কিশোরগঞ্জ থেকে ১০ মাইল দূরে জুলুমবাজ এক মুসলমান মহাজনের বাড়িতে কৃষক আন্দোলনকারীদের অভিযানের মাধ্যমে এ আন্দোলনের সফল সূত্রপাত হয়। বিক্ষুব্ধ কৃষকেরা তার কাচারিঘর তছনছ করে এবং সিন্ধুক ভেঙে তাতে রক্ষিত বন্ধকি দলিল বের করে তা ভস্মীভূত করে। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ওই আন্দোলন পাকুন্দিয়ার জাঙ্গালিয়া, হোসেনপুর, মঠখলা, গোবিন্দপুর প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। ওইসব স্থানেও কৃষকেরা মহাজনদের বাড়িতে-গদিতে অভিযান চালিয়ে বন্ধকি দলিল বের করে সেগুলোতে আগুন লাগিয়ে পোড়াতে শুরু করে।[৮৯]

জাঙ্গালিয়ার মহাজন কৃষ্ণরায়ের সাথে স্থানীয় কৃষকদের রক্তক্ষয়ী সংঘাতের সৃষ্টি হয়। বাড়ির আঙিনায় স্তূপীকৃত খড়ের গাদায় ঢেলে দিয়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে মহাজন কৃষ্ণরায়ের আশ্রয় নেওয়া দ্বিতল ঘরেও কৃষকেরা আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়তে থাকলে কৃষ্ণরায় ও তার পরিবারের অন্য সদস্যরা অনন্যোপায় হয়ে একে এক নিচের দিকে বেরিয়ে আসতে থাকে। প্রচণ্ড মারমুখী জনতা তাদের ওপর চড়াও হয়ে মহাজন কৃষ্ণরায়সহ কয়েকজনকে পিটিয়ে মেরে ফেলে। লাঠিপেটায় কৃষ্ণরায়ের পিতা হরিচরণ রায়ও নিহত হন।[৯০]

---

৮৮ ড. মর্তুজা খালেদ : বাংলাদেশের কমিউনিস্ট ও বাম আন্দোলনের বিকাশধারা এবং রাজশাহী জেলা, *জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ*, ঢাকা; জানুয়ারি, ২০২২, পৃ. ৫৩।

৮৯ মো: রফিকুল হক আজাদ : *বৃহত্তর ময়মনসিংহের ইতিহাস*, নবরাগ প্রকাশনী, ঢাকা; ফেব্রুয়ারি, ২০১৭, পৃ. ১৮৭।

৯০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আরেকটি ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায় মাহফুজউল্লাহ'র লেখায়। রাণীসংকৈল থানার পুলিশের হাত থেকে তিন তিনটা রাইফেল ছিনিয়ে নেওয়া ও দারোগাকে আটকানোর ব্যাপারে জয়মান কর্মনীর কৃতিত্ব ছিল বেশি। সে আটক দারোগাকে রাইফেল কাঁধে পাহারা দিত। ১৯৪৭ সালের ৪ জানুয়ারি দিনাজপুর জেলার চিরির বন্দর থানার এক গ্রামে কৃষক নেতাদের ধরতে গেলে কৃষকরা বাধা দেয় এবং পুলিশ গুলি চালায়। কৃষকরাও পালটা আক্রমণ চালায়। কৃষকদের তিরের আঘাতে একজন পুলিশ মারা যায়। পুলিশের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন সমিরউদ্দিন ও কমরেড শিবরাম মাঝি।[৯১]

জেল আন্দোলন

ড. মর্তুজা খালেদ উল্লেখ করেন, নাচোল বিদ্রোহের মতো আরও হটকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল কমিউনিস্ট পার্টি রণদীভের রাজনৈতিক লাইন কার্যকর করতে গিয়ে। এ জাতীয় অপর একটি পদক্ষেপ ছিল জেল আন্দোলন। ১৯৪০ সালে ব্রিটিশ সরকার Security Prisoners Rules নামে একটি আইন পাশ করে রাজবন্দিদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছিল। এ আইনের দ্বারা রাজবন্দিরা খাদ্য, পানীয়, পোশাক, পরিচিতদের সাথে সাক্ষাৎ, ভাতা, জেলের ভেতর পড়ালেখাসংক্রান্ত বিশেষ সুযোগ সুবিধা পেত। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লীগ সরকার সে আইন বাতিল করে রাজবন্দিদের সুযোগ-সুবিধাগুলো রহিত করে। সে সময়ের সকল রাজবন্দি ছিল মূলত কমিউনিস্ট। তারা এ আইনের জন্য ক্ষুব্ধ ছিল।

১৯৪৯ সালে জেলের ভেতরেও রণদীভের লাইনে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। বলা হয়, জেলের ভেতরেও অনশনসহ বিক্ষোভ আন্দোলন করে বন্দিদের বিপ্লবের দিকে চালনা করতে হবে। এ লাইন কার্যকর করা হয় প্রথমে ভারতের বিভিন্ন জেলে। পশ্চিম বাংলার কমিউনিস্টগণ দমদম, আলীপুর প্রভৃতি জেলেও এ নীতি কার্যকর করে কর্তৃপক্ষের সাথে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্টগণও এ নীতি কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সিদ্ধান্ত হয়—১১ মার্চ, ১৯৪৯ সাল থেকে ঢাকা ও রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারসহ পূর্ব বাংলার সমস্ত জেলে রাজবন্দিরা বিশেষ সুবিধার দাবিতে অনশন ধর্মঘট করবে।[৯২]

---

[৯১] মাহফুজউল্লাহ : বাংলাদেশে কৃষক আন্দোলন : কৃষক নেতাদের সাক্ষাৎকার ও পর্যালোচনা, *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ২১ ফেব্রুয়ারি সংখ্যা, ১৯৭৮।

[৯২] ড. মর্তুজা খালেদ : বাংলাদেশের কমিউনিস্ট ও বাম আন্দোলনের বিকাশধারা এবং রাজশাহী জেলা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা; জানুয়ারি, ২০২২, পৃ. ৫৩।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কমিউনিস্টদের সশস্ত্র বাহিনী

১৯৪৭ সালে সদ্য স্বাধীন ভারতে কংগ্রেস ও পাকিস্তান তথা পূর্ববঙ্গে মুসলিম লীগ সরকার আসীন হয়েছে। কিন্তু এই স্বাধীনতা লাভের মাত্র তিন বছরের মাথায় কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে শুরু হয় সশস্ত্র ও জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড। সে সময় (১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দ) পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন বিধান রায় এবং পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন নুরুল আমীন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত *বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান* গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়, এই রকম এক পটভূমিকায় ধনিক-জমিদার-জোতদারের আজ্ঞাবহ বিধান-নুরুল আমীন সরকারের শত শত পুলিশঘাঁটি, হাজার হাজার সেবাদল-আনসার গুন্ডা বাহিনীকে ভ্রুক্ষেপ না করেই পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার এক বিরাট অঞ্চলজুড়ে লক্ষ লক্ষ খেতমজুর-গরিব কৃষক ভাগচাষির ফসল, মজুরি ও জমি দখলের ঐতিহাসিক অভিযান চলেছিল। এই অভিযানকে আরও 'জঙ্গি' করে তোলার জন্য এইসব দাবি নিয়ে 'চীনের মতো ক্ষমতা দখলের পথে' বিপ্লবী কৌশল গ্রহণের কথা পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটির পক্ষ থেকে ২ জানুয়ারি প্রচারিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ময়মনসিংহের টংক এলাকার প্রায় ৪০০ গ্রামে শাসন অচল করে দেওয়া হয়েছিল। সারা বাংলাজুড়ে জমি, রুটি, শান্তি ও স্বাধীনতার লড়াইকে তীব্র করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি দুই লক্ষ টাকার সংগ্রামী তহবিল পূর্ণ করার আবেদন জানিয়েছিল।

এই গ্রন্থে আরও বর্ণনা করা হয়, সে সময় পার্টির মনোভাবের মধ্যে ছিল, 'দেশ গৃহযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছে এবং এগোবে। বিপ্লবের জয়যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবিপ্লব ঘোরতর হিংস্র হয়ে উঠছে এবং উঠবে।' তাই কমিউনিস্ট পার্টি এক চিঠিমারফত ২৪ পরগনা, কলকাতা, কাকদ্বীপ, মেদিনীপুর জেলার বহু অঞ্চল

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এবং হুগলি জেলার আরামবাগজুড়ে সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামের ডাক দিয়েছিল। এক বছরের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গকে এক দুর্জয় ফ্রন্টে পরিণত করতে হবে। গেরিলা কায়দায় সংগ্রাম চালাতে হবে, শত্রুর কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে সশস্ত্র মুক্তিফৌজ গড়তে হবে। পার্টির কাছে দক্ষিণবঙ্গ ছিল মুক্তি সংগ্রামের ফ্রন্ট লাইন আর কলকাতা ছিল মূল শিবির।[৯৩]

'রাজনৈতিক লাইন পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু' শিরোনামে বাংলার *কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান* গ্রন্থে আরও উল্লেখ করা হয়, (হুগলির) চন্দননগরে (গোন্দলপাড়া) বিপ্লবী শ্রমিকরা কংগ্রেসী শাসনতন্ত্রকে অভ্যর্থনা করেছেন ফরাসি সাম্রাজ্যবাদ আর কংগ্রেসী জুলুমের প্রতীক পুলিশ থানা আর ঘাঁটি জ্বালিয়ে দিয়ে। ঘটনাবলি নিম্নরূপ :

- ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি খুব ভোরে শ্রমিকদের জঙ্গিদলের আক্রমণে জ্বলে উঠল চন্দননগরের কাছে থানার একদিক, আহত হলো একাধিক পুলিশ। আতঙ্কিত পুলিশের দল থানা ছেড়ে পালাল। থানার ইনচার্জ এলে আত্মসমর্পণ করল, থানার যা কিছু জিনিস সব তুলে দিলো শ্রমিকদের হাতে। এর আগেই আক্রান্ত হয়েছে চন্দননগর রেলস্টেশনের পাহারাদারদের ঘাঁটি। জঙ্গি শ্রমিকদের আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালায় সিপাইদের দল।
- ২৪ তারিখ আক্রান্ত হয় চন্দননগরের প্রধান থানা, আহত হয় চারজন পুলিশ।
- এদিনই কোতরং থানা আক্রান্ত হয়, থানার একাংশ পুড়ে যায়। একের পর এক এই আক্রমণে সারা চন্দননগরে পুলিশের মধ্যে প্রচণ্ড আতঙ্ক। অনেক সেপাই কাজ ছেড়ে দেশে চলে যাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে।
- পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমার একটি গ্রামে এক হাজার খেতমজুর ও গরিব কৃষক তির-ধনুক, বোমা প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে গ্রামের পুলিশঘাঁটিটি আক্রমণ করেন। পুলিশ গুলি চালিয়েও তাদের অভিযানকে রুখতে পারেনি। শেষে পুলিশ কর্তারা হন্তদন্ত হয়ে চুঁচুড়া থেকে আরও বেশি পুলিশ এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করে।
- তমলুকের পুতপুতিয়া গ্রামের খেতমজুর ও কৃষকেরা মার্চ করে পুতপুতিয়া থানা আক্রমণ করে, বোমার আঘাতে তারা পুলিশদের আহত করে। পুলিশ ছয় রাউণ্ড গুলি চালিয়েও মজুর-কৃষকদের অভিযানকে হটাতে পারেনি।

---

[৯৩] মঞ্জু কুমার মজুমদার সম্পাদিত *বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান* ৬ষ্ঠ খণ্ড, মনীষা গ্রন্থালয় প্রা. লি. কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০০০, পৃ. ২৩।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

- ২৬ জানুয়ারি সশস্ত্র জনতা কাটোয়ার রেলওয়ে পুলিশঘাঁটিটি আক্রমণ করে। পুলিশ গুলি চালিয়েও তাদের অভিযানকে প্রতিহত করতে পারেনি; জনতার আক্রমণে একজন দারোগা ও একজন হেড কনস্টেবল গুরুতরভাবে আহত হয়।
- ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি মেদিনীপুর জেলার কয়েকটি থানায় কাকদ্বীপের মতো সশস্ত্র অভিযান সংগঠিত হয়, কাকদ্বীপ অবরোধের জবাবে মেদিনীপুর জেলার এক বিরাট অংশ শত্রুশিবিরকে পরাস্ত করে ফেলে।[৯৪]

কমিউনিস্ট পার্টির এক ইশতেহারে ডাক দেওয়া হয়—

'দক্ষিণবঙ্গের দিকে দিকে জঙ্গি বাহিনী তৈরি করুন আর গেরিলা কায়দায় সংগ্রাম চালিয়ে শত্রুর হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিন, শত্রুর হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে কেড়ে সশস্ত্র মুক্তিফৌজ তৈরি করুন। হাওড়ার কমরেডগণ পুলিশের হাত থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নিয়ে দেখিয়েছেন, কী করে মুক্তি সংগ্রামের জন্য হাতিয়ার সংগ্রহ করতে হয়। সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে এই পন্থা অনুসরণ করুন। দক্ষিণবঙ্গের জনশক্তি আজ প্রস্তুত। এখন অস্ত্র চাই আর চাই জঙ্গি বাহিনী। সশস্ত্র জঙ্গি বাহিনী এই অঞ্চলের অবস্থা ফিরিয়ে দেবে, বাংলাকে মালয় ও বর্মার সমপর্যায়ে ফেলবে। হাজং পল্লি এবং দক্ষিণবঙ্গ এখন সারা বাংলার মুক্তি সংগ্রামের দুটি যুদ্ধফ্রন্ট। সারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে বেছে বেছে পার্টির যোদ্ধাদের দক্ষিণবঙ্গে পাঠাতে হবে এই ফ্রন্টটিকে শক্তিশালী করার জন্য। সমগ্র দক্ষিণবঙ্গকে এখন একটি বিস্তীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রের মতো একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পরিচালনা করতে হবে। এই যুদ্ধেও ভেতর দিয়ে গড়ে তুলতে হবে মুক্তিফৌজ। এই মুক্তিফৌজ গ্রামের পর গ্রাম, থানার পর থানা মুক্ত করতে করতে অগ্রসর হবে। ২ নং পার্টি চিঠিতে এই কর্তব্যের কথা উল্লেখ করেছিলাম, তা আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। দক্ষিণবঙ্গ আমাদের মুক্তি সংগ্রামের ফ্রন্ট লাইন আর কলকাতার উপকণ্ঠস্থ শিল্প এলাকায় আমাদের মূল শিবির। ফ্রন্ট লাইনের সাফল্য নির্ভর করছে এই মূল শিবিরের জঙ্গি অভিযানের ওপর।'[৯৫]

নকশালযজ্ঞ

সমাজতন্ত্র তথা বাম আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলায় যে আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালিত হয়, তার অনেকটাই ছিল খুনাখুনিতে ভরা। এই খুনে রাজনীতির

---

[৯৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯-৫১।

[৯৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সঙ্গে জড়িত প্রধান অংশটি নকশাল ও সর্বহারা নামে পরিচিতি। বামপন্থিদের এই অংশটির সমর্থকরা এই হত্যাপর্বকে 'গৌরবের কাল' হিসেবে উল্লেখ করার প্রয়াস পেলেও এটি কখনোই শান্তিপূর্ণ কর্মকাণ্ডে বিশ্বাসী সাধারণ মানুষের সমর্থন পায়নি। নকশালবাড়ি[৯৬] নামক স্থান থেকে শুরু হওয়া এই আন্দোলন ছিল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এক ভয়ংকর যজ্ঞ। এই নকশাল নামধারীদের তৎপরতার কিছু বিবরণ এখানে উপস্থাপিত হলো।

এই প্রয়োগ ঘটে সরাসরি বিপ্লবের প্রধান গুরু চারু মজুমদারের দিকনির্দেশনায়। তার কিছু রচনায় এর নমুনা মেলে। চারু মজুমদার তার একটি লেখায় উল্লেখ করেন—

> '...শ্রমিকশ্রেণিকে আজ ডাক দিয়ে বলতে হবে যে ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক বিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে হবে শ্রমিকশ্রেণিকে এবং এ কাজ করতে হবে শ্রমিকশ্রেণিকে তার প্রধান মিত্র কৃষকশ্রেণির সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে। তাই কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করার দায়িত্ব এবং সেই সংগ্রাম সশস্ত্র সংগ্রামের স্তরে তোলার দায়িত্ব তার। শ্রমিকশ্রেণির অগ্রণী অংশকে যেতে হবে গ্রামাঞ্চলে সশস্ত্র সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে। এই কাজ শ্রমিকশ্রেণির প্রধান কাজ। "অস্ত্র সংগ্রহ করা এবং গ্রামাঞ্চলে সংগ্রামের ঘাঁটি তৈরি করা"—এরই নাম শ্রমিকশ্রেণির রাজনীতি, ক্ষমতা দখলের রাজনীতি। এই রাজনীতি দিয়ে আমাদের শ্রমিকশ্রেণিকে উদ্‌বুদ্ধ করতে হবে। ট্রেড ইউনিয়নে সমস্ত শ্রমিককে সংগঠিত করো—এ আওয়াজ শ্রমিকশ্রেণির রাজনৈতিক চেতনা বাড়ায় না। এর অর্থ অবশ্য এ রকম নয় যে, আমরা আর ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠিত করব না। এর অর্থ পার্টির বিপ্লবী কর্মীদের আমরা নিশ্চয়ই ট্রেড ইউনিয়নের কাজে আটকিয়ে রাখব না; তাদের কাজ হবে শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে রাজনৈতিক প্রচার আন্দোলন চালানো।

---

[৯৬] ভারতের পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে জঙ্গল ও পাহাড়ে ঘেরা ছোট্ট জনপদ নকশালবাড়ি। এখান থেকেই বাংলায় শুরু হয় মাওবাদী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র আন্দোলন। চীনের প্রেসিডেন্ট মাও-এর কাছ থেকে নির্দেশ আসে, ভারতে আন্দোলনের রূপরেখা হবে চীনের থেকে আলাদা। তবে করতে হবে সশস্ত্র বিপ্লবই। নির্দেশ মেনেই দেশে ফিরে শুরু হলো আন্দোলন। সরকারের পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় তাদের সেই আন্দোলনকে। আন্দোলনকারীদের দেখামাত্রই গ্রেফতার বা গুলি করার নির্দেশ দেওয়া হয় পুলিশকে। নতুন নীতিতে আন্দোলন শুরু হতেই ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন চারু মজুমদার। পরপর গ্রেফতার হন জঙ্গল সাঁওতাল, কানু স্যান্যালরা। জেলে বসেই প্রাণ হারান চারু মজুমদার। আন্দোলনের আগুন কিছুটা ঠান্ডা হতে শুরু করে। দ্র. shampratikdeshkal.com/opinion/news/200517137/নকশাল-বাড়ি-আন্দোলনের-৫৩-বছর

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অর্থাৎ, সশস্ত্র সংগ্রামের রাজনীতি ও বন্দুক সংগ্রহ অভিযান চালানোর রাজনীতি প্রচার করা ও পার্টি সংগঠন গড়ে তোলা। মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যেও আমাদের রাজনৈতিক প্রচার চালানোই প্রধান কাজ এবং কৃষক সংগ্রামের তাৎপর্য প্রচার করা। অর্থাৎ পার্টির সব ফ্রন্টেই দায়িত্ব হচ্ছে কৃষক সংগ্রামের গুরুত্ব বোঝানো এবং সেই সংগ্রামের অংশীদার হওয়ার আহ্বান জানানো। এ কাজ যতখানি আমরা করতে পারব, ততখানি আমরা গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সচেতন নেতৃত্বের স্তরে গিয়ে পৌছাব।

পার্টির এই মূল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পথের বিরোধিতা আসছে শুধু সংশোধনবাদীদের কাছ থেকেই নয়। সংশোধনবাদীরা সোজাসুজি শ্রেণি সহযোগিতার পথ নিচ্ছে, সুতরাং তার মুখোশ খুলে ধরা সহজ। কিন্তু আরও একধরনের বিরোধিতা আছে, পার্টির মধ্যে যাকে বলা হয় dogmatism (গোঁড়ামি)। এরা বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন; স্বীকার করেন যে, বিপ্লব একমাত্র সশস্ত্র সংগ্রামের মারফতই হতে পারে। কিন্তু তারা স্বপ্ন দেখেন যে, সারা ভারতব্যাপী গণ আন্দোলনের বিস্তৃতি ঘটিয়েই কেবল সশস্ত্র বিপ্লবের পথে যাওয়া যায়। তার আগে ছোটোখাটো এমনকি বড়ো রকমের সংঘর্ষও ঘটতে পারে; কিন্তু ক্ষমতা দখল সম্ভব নয়। ক্ষমতা দখল করা সম্বন্ধে তারা অক্টোবর বিপ্লবের একটা সংস্করণ ভারতবর্ষে ঘটবে—এ রকম আশা করেন।'[৯৭]

চারু মজুমদার আরও বলেন—

'আজকে জনসাধারণকে হত্যা করার চেষ্টা করছে সরকার। তাই জনসাধারণের পক্ষ থেকে আজ আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে হত্যা দিয়েই এই হত্যার বদলা নেওয়া। একেই "tit for tat" লড়াই বলে। চেয়ারম্যান বারবার বলেছেন, আমাদের সংগ্রামের কৌশল হবে "tit for tat" লড়াই। তাই আজকে প্রত্যেকটি বিপ্লবীর দায়িত্ব শুধু পুলিশবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করা নয়, তার রাইফেল ছিনিয়ে নেওয়া এবং রাইফেল দ্বারা কৃষকের গেরিলাদলকে সশস্ত্র করা। রাইফেল সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়েছে। শুরু হয়েছে মাগুরজান থেকে এবং ঘটেছে অনেক জায়গায়, এমনকি বেহালাতেও। এ অভিযান আমাদের রাজনৈতিক অভিযান, আমাদের রাজনৈতিক শিক্ষা—"বন্দুকের নল থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্ম হয়।"

---

[৯৭] চারু মজুমদার : চারু মজুমদার সমগ্র, আবু সালেক সম্পাদিত, *ঘাস ফুল নদী*, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৪২-৪৩।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বাংলাদেশে এই সংগ্রাম উন্নত পর্যায়ে উঠেছে। সুতরাং বাংলাদেশকেই আরও এগিয়ে যেতে হবে সশস্ত্র গেরিলা বাহিনী গড়ার কাজে। আমাদের এখানে ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কাজকে কখনো ছোটো করে দেখা উচিত নয়। দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের নেতৃত্বে সশস্ত্র গেরিলা বাহিনী কৃষকের সৃজনী প্রতিভাকে উন্মুক্ত করবে এবং তার ফলে বিপ্লবী সংগ্রাম দ্রুত ব্যাপক আকার ধারণ করবে। আমরা যেকোনো রকম আক্রমণের মোকাবিলা করতে প্রস্তুত হব এবং সমস্ত সমস্যাই এই সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা সমাধান করার পথ নেব।'[৯৮]

অন্যত্র চারু মজুমদার বলেন—

'আমি চাই পুলিশের Anti-Naxal Squad (নকশালপন্থিদের দমন করার জন্য স্কোয়াড)-এর ওপর হামলা শুরু করতে। একটু নজর রাখলেই আমাদের ছেলেরা Plain Cloth (সাদা পোশাকের) পুলিশ চিনতে পারবে। দু-তিনটে Workers Squad (শ্রমিকের স্কোয়াড)-কে দিয়ে এই Plain Cloth পুলিশের একটি স্কোয়াডকে খতম করতে হবে এবং ওদের পিস্তল কেড়ে নিতে হবে। এটা এক জায়গায় সংগঠিত করতে পারলেই ওদের Moral একেবারেই ভেঙে যাবে। দু-চারটে পুলিশের পিস্তল আমাদের হাতে এলেই ওরা আতঙ্কিত হয়ে উঠবে এবং তখন ধরে Repression করতে ওরা ভয় পাবে। গ্রামাঞ্চলে এবার ব্যাপক সংগ্রাম শুরু হবে। শহরের ছাত্র-যুবকরা অত্যন্ত উৎসাহ পাবে। মাগুরজানের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক পোস্টার দেওয়া উচিত। সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়া আজ পাগলের মতো যুদ্ধপ্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে। ওরা ভয় পায় একমাত্র সশস্ত্র জনতাকে। জনতাকে অস্ত্রসজ্জিত করা তাই আমাদের গেরিলা যুদ্ধের লক্ষ্য। কলকাতার কমরেডদের কাছে আমার অভিনন্দন জানাবেন। বাংলাদেশ এবং কলকাতা আজ সারা ভারতবর্ষকে পথ দেখাচ্ছে।'[৯৯]

রক্তাক্ত বিপ্লবের সূচনা

আশরাফ কায়সারের বিবরণে জানা যায়, ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে ভারতের দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ি অঞ্চলে এক কৃষক অভ্যুত্থান ঘটে। হাজার হাজার

---

[৯৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭।

[৯৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কৃষক জমি দখল, জমিজমার রেকর্ড বিনষ্ট করা, মহাজনদের উচ্ছেদ ও জোতদারদের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া শুরু করে। ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির শিলিগুড়ি শাখার উদ্যোগেই এই সশস্ত্র কৃষক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। নেতৃত্ব দেন চারু মজুমদার, কানু সান্যাল প্রমুখ।

আন্দোলন দমনে ভারতের যুক্তফ্রন্ট সরকারের (যার অন্যতম শরিক ছিল মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি) পুলিশ কৃষকদের ওপর গুলি বর্ষণ করে ও বহুসংখ্যক কৃষক গ্রেফতার হয়। ফলে নকশালবাড়িতে কয়েক মাসের মধ্যে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে একই ধারার আন্দোলন দ্রুত বিস্তার ঘটে। সশস্ত্র সংগ্রামকে কেন্দ্র করে ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিকে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চারু মজুমদার, কানু সান্যাল, সৌরেন বসু, সুশীতল রায় চৌধুরীসহ ৪০০ জনকে 'হটকারী' চিহ্নিত করে দল থেকে বহিষ্কার করে। অন্যদিকে চারু মজুমদার পার্টিকে সংশোধনবাদী আখ্যায়িত করে পালটা ব্যবস্থা হিসেবে গঠন করেন 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি'। ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ২২ এপ্রিল এ কমিটি 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)' নামে রাজনৈতিক দলে রূপান্তরিত হয়।

কমিউনিস্ট পার্টির এই অংশের সদস্যরাই ইতিহাসের পাতায় পরিচিত হয়েছেন 'নকশালবাদী' বা 'নকশাল' হিসেবে। শ্রেণিশত্রু খতমের মাধ্যমে 'রক্তাক্ত বিপ্লব' শুরুর ঘোষণা দিয়ে এ অঞ্চলের বামপন্থি রাজনীতিতে নতুন ধারার সৃষ্টি করে এই দলটি। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করে মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী ছাত্র-যুবকরা দলে দলে যুক্ত হতে থাকে দলটির কার্যক্রমে।

'ভারতের আকাশ থেকে বসন্তকালীন বৃষ্টি' শিরোনামে *পিপলস ডেইলিতে* সম্পাদকীয় প্রকাশ করে চীন এই আন্দোলনকে সমর্থন করে। মাও সেতুং-এর 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব'-এর ধ্বনি তুলে নকশাল নেতারা স্লোগান দেন—'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান', 'যে শ্রেণিশত্রুর রক্তে নিজের হাত রাঙায়নি, সে কমিউনিস্ট নামের উপযুক্ত নয়।'

নকশালবাড়ির কৃষক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে উপমহাদেশের বামপন্থি আন্দোলনে সশস্ত্র চরিত্র যুক্ত হয়। নকশালবাড়ির অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যায় চারু মজুমদার বলেন—'এই আন্দোলন জমি বা ফসলের জন্য ছিল না। জঙ্গি সংগ্রাম করতে হবে রাষ্ট্রক্ষমতার জন্য। এলাকায় এলাকায় কৃষককে তৈরি হতে হবে রাষ্ট্রযন্ত্রকে অচল করে দেওয়ার জন্য।' এই মতবাদের আলোকেই চারু মজুমদার ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে অনেকগুলো নতুন নীতি গ্রহণ করেন। কৃষকদের মধ্যে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সশস্ত্র সংগঠন তৈরি, গেরিলা অ্যাকশন বা শ্রেণিশত্রু খতম, গণসংগঠন বর্জন, নির্বাচন বর্জন, মুক্তাঞ্চল গঠনের মাধ্যমে সশস্ত্র বিপ্লব গড়ে তোলা প্রভৃতি ছিল এই নীতি অনুসৃত কর্মসূচি। তিনি সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করার আহ্বান জানান। চারু মজুমদারের এই বিপ্লবী মন্ত্রে এ অঞ্চলের বামপন্থি আন্দোলনে সশস্ত্র তৎপরতার দ্রুত বিস্তার ঘটে। পূর্ব বাংলার বাম দলগুলোর মধ্যে পিকিংপন্থিদের একটি অংশ এই মতবাদে উজ্জীবিত হয়ে ঘোষণা দিয়ে শ্রেণিশত্রু খতমের অভিযান শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় পরে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় জোতদার মহাজন ও বিপক্ষ দলের রাজনৈতিক নেতারা খুন হতে থাকেন।[১০০]

অমর ভট্টাচার্য তাঁর *লাল তমসুক* গ্রন্থে পশ্চিমবঙ্গে নকশালপন্থি সমাজতন্ত্রীদের সশস্ত্র তৎপরতার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেন। এর মধ্যে দেখা যায়, ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দের ৩ মার্চ প্রায় ১৫০ জনের মতো আধিয়ার, যারা নকশালবাড়ি থানা এলাকার বড়োমণিরাম জোতের জয়ানন্দ সিং-ও গগৌ সিং-এর জমিতে চাষ করত, তারা জোর করে এই মহাজনের গোলা থেকে প্রায় ৩০০ মণ ধান লুঠ করে নেয়। এদের হাতে ছিল তির, বল্লম প্রভৃতি অস্ত্র এবং সি. পি. এম.-এর পতাকা।[১০১]

নকশালবাড়ি এলাকায় একটি স্থানে নকশালিদের নেতৃত্বে জমি দখলের একটি ঘটনায় ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৪/২৫ মে সশস্ত্র পুলিশের একটি দল তদন্ত করতে গেলে সেখানে পুলিশের ওপর আক্রমণের ঘটনা ঘটে। এ বিষয়ে অমর ভট্টাচার্য প্রদত্ত বিবরণে জানা যায়, বড়োঝাড়ু জোতে পুলিশদল ঢোকামাত্র স্থানীয় মানুষের চ্যাঁচামেচিতে বুড়াগঞ্জ, আজামাবাদ, সফদোল্লাজোত ও বিজয়নগর চা বাগান থেকে হাজারখানেক মানুষ বেরিয়ে এসে পুলিশদলকে ঘেরাও করে ফেলে। উত্তেজিত অবস্থায় হঠাৎ এক যুবকের ছোড়া তির বিঁধে ইন্সপেক্টর ওয়াংদির বুকে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় অন্যদের তির বর্ষণ। তিরের আঘাতে অন্য দুজন পুলিশ অফিসারও গুরুতর আহত হয়। পুলিশ তখনকার মতো পিছু হটে। ফুসফুসে তিনটি তির বিদ্ধ সোনাম ওয়াংদি পরের দিন হাসপাতালে মারা যান। এই ঘটনার জেরে ২৫ তারিখে একটি সভা চলাকালে সশস্ত্র পুলিশদল গাড়ি থেকে নেমে পাশের ঝোপঝাড়ে পজিশন নিয়ে সভার দিকে তাক করে হঠাৎ গুলি চালাতে থাকে। এতে সেখানে ৭ জন মহিলা এবং ২ জন শিশুসহ মোট ১১ জন মারা যায়।[১০২]

---

[১০০] আশরাফ কায়সার : বাংলাদেশে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা; ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫, পৃ. ২২-২৩।

[১০১] অমর ভট্টাচার্য : লাল তমসুক (*নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রামাণ্য তথ্য-সংকলন*), অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা; মার্চ, ২০১৬, পৃ. ৪২।

[১০২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭-৫৮।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অমর ভট্টাচার্য প্রদত্ত কয়েকটি ঘটনার বিবরণ নিম্নরূপ :

- ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ১ আগস্ট : নকশালিদের একটি স্কোয়াড যায় ধরমপুরে এক মহাজনকে খতম করতে, কিন্তু তিনি পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।
- ২৭ সেপ্টেম্বর : গোপীবল্লভপুর অঞ্চলে সন্ধ্যার দিকে ৩০/৪০ জনের দল গিয়ে এক জোতদারকে তার ঘরে হত্যা করে তার বন্দুক দখল করে।
- ২৮ সেপ্টেম্বর : বহড়াগুড়ায় এক জোতদারকে হত্যা করতে যায় নকশালিরা, কিন্তু জোতদার বেঁচে যান।

এভাবে সন্ত্রাস ছড়িয়ে দিয়ে নভেম্বর-ডিসেম্বরজুড়ে এই অঞ্চলের সকল জোতদারের জমির ধান কেটে নেওয়া হয়। তাদের অনেকের বন্দুকও কেড়ে নেওয়া হয়।

এ সময় খড়গপুরে এক গোপন আলোচনা সভায় চারু মজুমদার পুলিশ অ্যাকশনের কথা জানালেন। এ সময় আশপাশের এলাকাগুলোতে যে ছোটো ছোটো পুলিশক্যাম্পগুলো ছিল, তাতে দশ-বারোজন করে পুলিশ থাকত। বিহারের দিকে যে পুলিশক্যাম্পগুলো ছিল, সেগুলোতেও আক্রমণ করা হয়। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের ৯ মার্চ ১৮ জনের একটা স্কোয়াড রূপসী কুণ্ডি থেকে ৯টি রাইফেল ও ১০৫ রাউন্ড গুলি দখল করে। এতে একজন কনস্টেবল নিহত হন। রূপসী কুণ্ডি থেকে পুলিশের পোশাকগুলো লুট করা হয়। পরে এই পোশাক পরে আরও কতগুলো অ্যাকশন নিতে সুবিধা হয়। দু-মাস পরে ওড়িশার সীমান্তে খয়েরবনিতে ওড়িশা মিলিটারি পুলিশের ক্যাম্প আক্রমণ করা হয়। এ ছাড়া গুলিপোদা ও ভোলা (ওড়িশা) এলাকায় দুটি পুলিশক্যাম্পের ওপরও হামলা করা হয়েছিল। ডেবরা থানা এলাকায় তিন নম্বর অঞ্চলের শালডহরী গ্রামের কানাই কুইতির বাড়ি আক্রমণ করে তার বন্দুক ও ধান-চাল লুট করে নেয় একদল সশস্ত্র কৃষক। তার দুদিন বাদে ওই একই থানা এলাকার নয় নম্বর অঞ্চলের ভূঁইয়া বসন গ্রামের অলোকেশ ভূঁইয়া একদল সশস্ত্র লোকের দ্বারা নিহত হন।[১০৩]

নকশালবাড়ি-বিহার সীমান্ত সংলগ্ন বিহারের ছোট্ট একটি গ্রাম মাগুরজান। ২৭ অক্টোবর, ১৯৭০ সেখানকার পুলিশক্যাম্পে নকশালপন্থিদের নেতৃত্বে একটি সশস্ত্র দল আক্রমণ চালিয়ে ছয়টি রাইফেল ও বেশ কিছু গুলি লুট করে। এই ঘটনার পর চারু মজুমদার ঘোষণা করেন—'আমাদের গণমুক্তি ফৌজের জন্ম হলো।'[১০৪]

---

[১০৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে নকশালবাড়ি আন্দোলনের সূত্র ধরেই বোলপুর, সিউড়ি বা রামপুরহাটের (বীরভূম) কিছু ছাত্র-যুবক শহরে নকশালবাড়ি আন্দোলনের পক্ষে প্রচার শুরু করেন। ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে চারজন ছাত্র এবং একজন রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ-এর কর্মচারীকে নিয়ে তৈরি হয় জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটি। এইসব এলাকার কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়ার-সি.পি.আই (মার্কস-লেনিন)-এর কার্যকলাপের কয়েকটা উদাহরণ নিম্নরূপ :

- বোলপুরের ইটিন্দা গ্রামের পাইনরা ছিলেন জোতদার। তার বিরুদ্ধে সি.পি.আই (এম. এল)-এর অভিযোগ ছিল কৃষক শোষণ, সুদ ও মহাজনি কারবারের। ১৯ মার্চ প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তি; যাদের মধ্যে ২৫টি রাইফেল, বেশ কিছু রিভলভার ও বোমাসহ সশস্ত্র কৃষক ছিলেন তারা পাইনদের বাড়ি ঘিরে ফেলে গৃহকর্তাকে গাছে বেঁধে বিচার শুরু করে। গ্রামবাসীরা তা দেখার জন্য সেখানে ভিড় করে। বিচারে গৃহকর্তার মৃত্যুদণ্ড হলে তাকে 'খতম' করা হয়।

- মাধবপুর গ্রামের তারাপদ ডাক্তার ছিল জনবিরোধী একজন সুদখোর ভূস্বামী। তার বাড়ি প্রায় তিনশো সশস্ত্র সাঁওতাল ঘিরে ফেলে, তারপর ডাক্তারকে গাছে বেঁধে বিচার শুরু করে সমবেত গ্রামবাসীদের সামনেই তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং তা কার্যকর করা হয়। বোলপুর থানার সুরুলে পার্টির সশস্ত্র ইউনিট শ্রীনিকেতন থেকে যাদবপুর পর্যন্ত প্রায় আট মাইল পথ সশস্ত্র মিছিল সংঘটিত করে।

- পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের কর্মী দিলীপ চক্রবর্তীকে পুলিশ অত্যন্ত গোপনভাবে নকশালপন্থিদের খবর নেওয়ার জন্য নিয়োগ করেছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বোলপুর ইউনিট পাতিলপুর রোডের কাছে এই গোয়েন্দাকে আক্রমণ করে। দিলীপ চক্রবর্তী দ্রুত থানার দিকে দৌড়াতে থাকে, কিন্তু তখনই বিভিন্ন দিক থেকে নকশালপন্থিরা তাকে ঘিরে ধরে খতম করে।

- এই সময়কালে প্রায় ১৭৫ জনকে 'খতম' করা হয় এবং ২৫৫টি আগ্নেয়াস্ত্র লুট করে সি.পি.আই. (এম. এল.) কর্মীরা। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ৪ জুলাই থেকে ১৮ আগস্ট পর্যন্ত মিলিটারি অপারেশনের পরে এই আন্দোলন ধাক্কার মুখে পড়ে।

সি.পি.আই (এম. এল) তৈরি হওয়ার পর 'দক্ষিণ দেশ' গ্রুপ আলাদা একটি কেন্দ্র তৈরি করেছিল 'মাওবাদী কমিউনিস্ট কেন্দ্র' নামে। এই কেন্দ্রের পরিচালনায় চব্বিশ পরগনার গোসাবা, বাসন্তী, সন্দেশখালি এলাকায়, বর্ধমানের কাঁকসা,

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বুদবুদ, হুগলির চন্দনগর, বৈদ্যবাটি, বিহারের ধানবাদ, হাজারিবাগ, গয়া প্রভৃতি এলাকায় সংগঠন ও সংগ্রাম বিস্তার লাভ করে। এই কেন্দ্র শ্রেণিশত্রু খতমের লাইন মানলেও তারা সেক্ষেত্রে কিছু পূর্বশর্ত আরোপ করে। তারা মনে করে, সীমিত খতমের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও তা কখনোই ছোটো ছোটো স্কোয়াড নিয়ে গোপন পদ্ধতিতে হওয়া উচিত নয়।[১০৫]

অমর ভট্টাচার্য জানান, কলকাতা অঞ্চলে সম্ভবত (১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম দিকে) প্রথম অ্যাকশন ছিল কাশীপুর থানার সাব-ইন্সপেক্টর প্রশান্ত সেন নিয়োগীর ওপর। সি.পি.আই. (এম. এল) কর্মীদের ছোড়া বোমায় সেন নিয়োগী নিহত হন এবং ইন্সপেক্টর প্রদ্যোত মুখার্জি গুরুতর আহত হন।

ভাতিন্দা জেলার ভূমিহীন দরিদ্র কৃষকদের সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয় ভিখি ও সামাও নামে দুটি গ্রামে। তারা গেরিলা স্কোয়াড তৈরি করে চাংকাউ থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে আক্রমণ করে এবং দুজনকে জখম করে। কাংড়ার বসন্তপুরে একটি বড়ো জমিদারবাড়িতে পুলিশক্যাম্প বসানো হয়েছিল। পার্টির কৃষক গেরিলারা ওই জমিদারকে আক্রমণ করে। জমিদার অতি কষ্টে প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলেও কৃষক গেরিলা স্কোয়াডের হাতে তিনজন বাঘা জমিদার খতম হয়। এই ঘটনাটি ঘটে ১৩ জুন। ওই সময় সাংরুল জেলায় পার্টি নির্ধারিত গণলাইন অনুযায়ী সশস্ত্র কৃষক যুদ্ধ শুরু হয়। ১৮ জুন কিলাহাকিমা গ্রামের ভূমিহীন দরিদ্র কৃষকেরা তলোয়ার ও বল্লম দিয়ে বাঘা জমিদার জেনারেল বসন্ত সিংকে আক্রমণ করে তার সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত করে নেয়। তিন দিন পরে ২১ জুন, সশস্ত্র গেরিলারা আবার তার ফার্ম আক্রমণ করে যন্ত্রপাতি ধ্বংস করে দেয়।[১০৬]

ভারতে নকশালদের হাতে নিহতের পরিসংখ্যান

ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী বিভিন্ন খ্রিষ্টাব্দে নকশালদের হাতে নিহতের হার নিম্নরূপ—

- ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে নিহত হয় ১৫৬ জন
- ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে নিহত হয় ৪২৮ জন
- ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে নিহত হয় ২৭০ জন
- ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে নিহত হয় ৩৬৩ জন

---

[১০৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

- ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে নিহত হয় ৫০ জন
- ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে নিহত হয় ১০০+ জন
- ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে নিহত হয় ১৪০ জন
- ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দে নিহত ৪৫১ জন
- ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে নিহত ৫০০+ জন
- ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে নিহত ৮৯২ জন
- ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দে নিহত ৭৪৯ জন
- ২০০৭ (৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) খ্রিষ্টাব্দে নিহত হয় ৩৮৪ জন
- ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দে ৩৮ মাওবাদীসহ নিহত হয় ৯৩৮ জন
- ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দে ১৬ এপ্রিল জাতীয় নির্বাচনের প্রথম দফা ভোট গ্রহণের সময় বিহার, ছত্রিশগড় ও ঝাড়খন্ডে হামলা চালিয়ে ১৮ জনকে হত্যা করে।
- ২৩ এপ্রিল জাতীয় নির্বাচনের দ্বিতীয় দফা ভোট গ্রহণের সময় জামশেদপুর এবং ঝাড়খন্ডে হামলা চালিয়ে কয়েকজনকে আহত করে।
- মে মাসে সম্ভাব্য মাওবাদীদের হামলায় ১৬ জন পুলিশ নিহত হয়।
- বিবিসি'র হিসাব অনুযায়ী নকশালদের কারণে এখন পর্যন্ত ৬০০০-এর বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছে।[১০৭]

ওপরের বিবরণে দেখা যায়, স্থানীয় বিভিন্ন সামাজিক বিষয়কে ইস্যু করে সমাজতন্ত্রের অ্যাক্টিভিস্টরা আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ করেন। সামাজিক শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে এসব কার্যক্রম আপাতদৃষ্টিতে প্রশংসাযোগ্য মনে হলেও এগুলো বরাবর জঙ্গি কর্মকাণ্ডে পরিণত হতে দেখা যায়। এজন্য চরমপন্থা, উগ্রবাদ, সন্ত্রাস, সশস্ত্র কর্মকাণ্ড ইত্যাদি শব্দগুলো এসব তৎপরতার ক্ষেত্রে যথার্থভাবে প্রয়োগযোগ্য হয়ে যায়। যে সকল কর্মসূচি সাধারণ মানুষকে ভীতি, আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতার গহ্বরে ঠেলে দেয়, সেগুলো কখনোই ইতিবাচক ফল বয়ে আনতে পারে না। উপরিউক্ত কর্মকাণ্ডগুলো সেই পরিণতিই লাভ করেছে এবং ইতিহাসে এ কথা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে যে, সমাজতন্ত্র তথা বামপন্থা প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রথম এ দেশে এ ধরনের নেতিবাচক তৎপরতার প্রয়োগ করা হয়।

---

[১০৭] Armed Conflicts Report India- Maoist Insurgency (1980- first combat deaths), Update: January 2008 অবলম্বনে bn.wikipedia.org/wiki//নকশাল আন্দোলন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চতুর্থ অধ্যায়

@PDF বইয়ের সমাহার

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বাংলাদেশ পর্বে বামপন্থি ধারা

ভারত ও পশ্চিমবঙ্গে যে সকল বামপন্থি সংগঠনের কার্যক্রম বিস্তৃত দেখা যায়, সেগুলোর জের একাত্তর-পূর্ববর্তী পূর্ব পাকিস্তান ও একাত্তর-পরবর্তী বাংলাদেশেও সম্প্রসারিত হয়। এই চরমপন্থি ধারায় বাংলাদেশ পর্বে চলতে থাকে নানা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। এই অধ্যায়ে থাকছে শ্রেণিশত্রু খতমের নামে হত্যাকাণ্ড, থানায় আক্রমণ, গণবাহিনীর উত্থান ও সন্ত্রাস, অস্ত্র তৈরি ও ব্যবহারের নয়া অধ্যায়, সেনাবাহিনীতে গণহত্যা, ভারতীয় হাইকমিশনে হামলা প্রভৃতি স্পর্শকাতর বিষয়ের বিবরণ।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যে সকল বামপন্থি সংগঠন সক্রিয় ছিল, সেগুলোই বাংলাদেশে তৎপর থাকে। তবে এগুলোর ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে নতুন নামেও সংগঠন তৈরি হয়। খোকা রায়ের তথ্যানুযায়ী ১৯৩৫-৩৬ খ্রিষ্টাব্দে যশোর, খুলনা, সিলেট এবং ১৯৩৭-৩৮ খ্রিষ্টাব্দে ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, কুমিল্লা, পাবনা, বরিশাল, রাজশাহী, বগুড়া, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানে কমিউনিস্ট পার্টির জেলা কমিটি সংগঠিত হয়।[১০৮]

জগলুল আলম উল্লেখ করেন—১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ বাংলাদেশে ছোটো-বড়ো মিলিয়ে বামপন্থি রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪৮টি। এদের মধ্যে দুটি মূল স্রোত যথাক্রমে মস্কোপন্থি ও বেইজিংপন্থি চিন্তাধারার অনুসারী। বহুধাবিভক্ত অপর একটি অংশ সনাতনী কায়দায় সন্ত্রাসবাদী ও সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে সামাজিক রূপান্তরে বিশ্বাসী। অপর একটি অংশ মধ্যপন্থি ধারা অনুসরণ করে জাতীয়তাবাদী চিন্তাচেতনার ভিত্তিতে সমাজ পরিবর্তনে বিশ্বাস করে। এদের মধ্যে ২৫টি দল সাংগঠনিক অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজ করছে।[১০৯]

---

[১০৮] খোকা রায় : *সংগ্রামের তিন দশক*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬।

[১০৯] জগলুল আলম : *বাংলাদেশে বামপন্থি রাজনীতির গতিধারা ১৯৪৮-৮৯*, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯০।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অমর ভট্টাচার্য উল্লেখ করেন—১৯৬৭-৭০ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ব বাংলায় যেসব পার্টি, সংগঠন ও গ্রুপগুলো ছিল, সেগুলো হলো—

১. পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল)।
২. পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি।
৩. কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটি।
৪. পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলন।
৫. কমিউনিস্ট কর্মী সংঘ।
৬. পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মণি সিংহ)।
৭. পাকিস্তান ন্যাশনাল-আওয়ামী পার্টি (ভাসানী)।
৮. পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালি)।
৯. পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি (ভাসানী)।
১০. পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন।

এই দল ও সংগঠনগুলো নকশালবাড়ি আন্দোলনের পক্ষে-বিপক্ষে অবস্থান নেয়।[১১০]

বাংলাদেশের উগ্র বাম আন্দোলন সম্পর্কে বিবিসি বাংলা'র এক প্রতিবেদনে বলা হয়—বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাগুলো একসময় বিভিন্ন চরমপন্থি গ্রুপের অভয়ারণ্য হিসেবে পরিচিত ছিল। ১৯৬০-র দশক থেকে ওই অঞ্চলে বিভিন্ন বামপন্থি দল তাদের তৎপরতা শুরু করে এবং তখন তাদের মূলভিত্তি ছিল 'মার্কসবাদ' ও 'মাওবাদী' আদর্শ। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, মাগুরা, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলায় এসব গ্রুপের তৎপরতা বাড়তে থাকে। এসব সংগঠন গোড়া থেকেই অতি বাম আদর্শে বিশ্বাস করত। তবে বামপন্থি আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে অপরাধ প্রবণতার সাথে জড়িয়ে পড়ে সংগঠনগুলো। আদর্শের দ্বন্দ্ব কিংবা আর্থিক ভাগাভাগি নিয়ে চরমপন্থি সংগঠনগুলোর মধ্যে ক্রমাগত বিভেদ এবং এর ফলাফল হিসেবে নানা উপদল সৃষ্টি হতে থাকে। অভিযোগ রয়েছে, নিজেদের প্রতিপক্ষকে অবলীলায় খুন করতেও দ্বিধা করত না এসব চরমপন্থি গ্রুপের সদস্যরা। দিনের আলোয় প্রকাশ্যে কাউকে হত্যা করা ছিল বিভিন্ন চরমপন্থি গোষ্ঠীর কাজের অন্যতম ধরন।

---

[১১০] অমর ভট্টাচার্য : *লাল তমসুক* (নকশাল বাড়ি আন্দোলনের প্রামাণ্য তথ্য-সংকলন). অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা; মার্চ, ২০১৬, পৃ. ২০৭।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উগ্র বাম এসব সংগঠনের কর্মকাণ্ড ১৯৬০-র দশক থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল হক। তিনি বিবিসি বাংলাকে বলেন—

> 'বাংলাদেশ যখন প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থায় একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখা দেয়। এই অবস্থার মধ্যে কয়েকটা মার্কসবাদী গ্রুপ আত্মপ্রকাশ করে। এর মধ্যে কিছু গ্রুপ ছিল যারা শত্রুদের গুপ্তহত্যার মাধ্যমে আতঙ্ক সৃষ্টি করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবে। চরমপন্থি গ্রুপগুলো শেষ পর্যন্ত জনসমর্থন পায়নি। তবে তাদের ভয়ে আতঙ্কিত থাকত সাধারণ মানুষ। পুরোনো কমিউনিস্ট নেতারা দৃশ্যপট থেকে বিদায় নেওয়ার পর এসব চরমপন্থি সংগঠন কার্যত মনোনিবেশ করে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে, যার মাধ্যমে তারা অর্থ উপার্জন করতে পারে। যারা এ ধরনের চরমপন্থি, তারা তাদের রাজনৈতিক আদর্শের কথা বলছে বটে, কিন্তু আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে চাঁদাবাজিতে লিপ্ত হলো।...এইভাবে শত্রুদের হত্যা করার মাধ্যমে পৃথিবীর কোনো দেশেই এ রকম শক্তি টিকতে পারেনি। জনগণ ভয় পেয়েছে। এই কর্মপদ্ধতিতে কেউ সফল হয়নি। এরা যদি ১০ জনকে মারে, পুলিশ তাদের ১০০ জনকে মারবে।'[১১১]

একাত্তরে ভূমিকা

সমাজতন্ত্রী তথা বামপন্থিদের একটি অংশ একাত্তরের স্বাধীনতাযুদ্ধ নিয়ে ব্যাপক বিভ্রান্তির শিকার হন। শুধু তা-ই নয়, এদের কেউ কেউ মুক্তিযোদ্ধাদেরও হত্যা করতে থাকে। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত বাম বুদ্ধিজীবী, নেতা ও লেখক বদরুদ্দীন উমর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। এখানে নমুনাস্বরূপ কিছু বিবরণ উল্লেখ করা হলো।

১৯৭১-এর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কমিউনিস্টদের অবস্থান ছিল দ্বিধাবিভক্ত। মহিউদ্দিন আহমদ উল্লেখ করেন, পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির একটি ক্ষুদ্র অংশ মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির একটি অংশ পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীকে সহযোগিতা জোগায় এবং মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় অবস্থান নেয়। পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি ও পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি উভয় দলের সঙ্গে জড়িত আরেকটি শাখা স্বাধীনতাযুদ্ধকে

---

[১১১] আকবর হোসেন : বিবিসি বাংলা, ঢাকা; ৯ এপ্রিল, ২০১৯।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পাকিস্তানি বুর্জোয়া ও উঠতি বাঙালি বুর্জোয়ার মধ্যকার লড়াই বলে অভিহিত করে এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধা দুপক্ষকেই জনগণের দুশমন বলে ঘোষণা করে।[১১২]

চারু মজুমদার সম্পর্কিত এক ভাষ্যে আবু সালেক উল্লেখ করেন—

> 'সত্যি বলতে কী, এ দেশের মাওবাদী কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা ১৯৭১ সালেই চারু মজুমদারের বিপ্লবী শ্রেণিসংগ্রামের লাইনকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে প্রথম সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবী লড়াইয়ের বাস্তব প্রয়োগ ঘটান। তাই সে সময় সশস্ত্র যুদ্ধরত এ দেশের সকল মাওবাদী কমিউনিস্ট পার্টি-গ্রুপগুলোকে সাধারণভাবে 'নকশাল' নামেই অভিহিত করা হতো। একাত্তরে এইভাবে ভারত ও বাংলাদেশের মাওবাদী কমিউনিস্ট আন্দোলন একাকার হয়ে ওঠে। ১৯৭১ সালে ভারত-পাকিস্তান অন্যায় যুদ্ধের মধ্য দিয়ে সম্প্রসারণবাদী ভারত সরকার, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায় পাকিস্তান আক্রমণ করে, ১৬ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তান দখল করে, বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সেখানে এক নয়া ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম করলে পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক সংগ্রাম এবং ভারতের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম একই শত্রুর বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিন্ন সংগ্রামের অংশ হয়ে পড়ে।'[১১৩]

বদরুদ্দীন উমর বলেন—

> 'আমাদের পার্টি ১৯৭০-৭১ খ্রিষ্টাব্দে চারু মজুমদারের[১১৪]নেতৃত্বাধীন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি থেকে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। আবার সেই ভারতীয় পার্টি 'স্বীকৃতি' ও সমর্থন লাভ করেছিল চীনা পার্টির।

---

১১২ মহিউদ্দিন আহমদ : *বাংলাপিডিয়া* (খণ্ড-৭), সিরাজুল ইসলাম সম্পা. বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৩০।

১১৩ আবু সালেক সম্পাদিত চারু মজুমদার সমগ্র (ভূমিকা), *ঘাস ফুল নদী*, ঢাকা, ১৯৯৭।

১১৪ চারু মজুমদার উপমহাদেশের প্রখ্যাত রাজনীতিক, কৃষক আন্দোলনের সংগঠক ও নক্শালবাড়ি আন্দোলনের নেতা। চারু মজুমদার ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে নাটোরের দিঘাপতিয়া ইউনিয়নের হাগুরিয়া গ্রামে (মতান্তরে উত্তর প্রদেশের বেনারসে) জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বীরেশ্বর মধ্যস্বত্বভোগী ভূমির অধিকারী পরিবারের কর্তা। চারু মজুমদার শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল থেকে ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে ম্যাট্রিক পাশ করে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে ভর্তি হন। ক্রমে সাম্যবাদী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে কৃষক সংগঠনে মনোনিবেশ করেন। ১৯৩৬ খ্রিস্টব্দে তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল জলপাইগুড়ি জেলা। ৬ বছর আত্মগোপন করে থাকেন। এই সময় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ পান। ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে জলপাইগুড়িতে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গ্রেফতার হয়ে দুই বছর নিরাপত্তা বন্দিরূপে থেকে ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে মুক্ত হন। উত্তরবঙ্গে ফিরে গিয়ে চা বাগানের শ্রমিক সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের কমিউনস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হলে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হন। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে মুক্তি পেয়ে পার্টির সহকর্মী লীলা সেনগুপ্তকে বিয়ে করেন। অতঃপর তরাই অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে কাজ করতে থাকেন। ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের নক্শালবাড়ি অঞ্চলের কেষ্টপুরে চা বাগিচার মালিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গ্রেফতার হন। ৪ মাসের জন্য কারারুদ্ধ হলেও পরে কৃষকদের জয় হয়। এ সময় থেকে কৃষক পক্ষের হয়ে বহু মামলা পরিচালনায় সওয়াল-জবাব করতে দেখা যায়। এসব মামলা অনেক সময় নিজ অর্থব্যয়ে চালাতেন।

১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে নির্বাচনে শিলিগুড়ি কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কংগ্রেস প্রার্থীর কাছে পরাজিত হন। এই বছর ভারত-চীন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট পার্টিতে মতভেদ দেখা দেয়। তিনি ভারতরক্ষা বিধানে গ্রেফতার হন। মুক্তি পাওয়ার পর ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে থেকে চীনের রাষ্ট্রগুরু মাও-সে-তুং-এর আদর্শে প্রভাবিত হয়ে ওঠেন। ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে পাক-ভারত যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রেফতার হন। ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে পুলিশ হেফাজতে তিনি হাসপাতালে স্থানান্তরিত হন এবং একই বছর মুক্তি পান। ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় ও যুক্ত বামপন্থি ফ্রন্ট কর্তৃক সরকার গঠন বিষয়ে CP (M) দলের নেতৃত্বের সঙ্গে বিরোধ শুরু হয়। এই বিরোধ থেকে ক্রমে কমিউনিস্ট কনসোলিডেশন (১৯৬৮) এবং শেষে ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে ১ মে কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী-লেলিনবাদী (CP-ML) দল গঠন করে একজন সাধারণ কৃষককর্মী থেকে সারা ভারতে সর্বাধিক উচ্চারিত নামের বিপ্লবী নেতারূপে পরিচিত হন। সাধারণভাবে এই দলটি নক্শালপন্থি নামে পরিচিত। নক্শালবাড়িতে প্রকৃত কৃষকদের জমির মালিকানা-লাভের আন্দোলন থেকেই এই নামের উৎপত্তি।

১৯৬৯-৭১ খ্রিষ্টাব্দে প্রায় দুই বছর এই নবগঠিত দল পশ্চিম বাংলার সবচেয়ে পরাক্রান্ত, সুগঠিত এবং মারমুখী বিপ্লবী দলরূপে বর্তমান ছিল। এই দলের প্রভাব বিহার, অন্ধ্র প্রদেশসহ বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তাঁর নির্দেশে কৃষিবিপ্লব এবং রাজনৈতিক আন্দোলন ক্রমশ শহরাঞ্চলে ব্যক্তিগত হত্যা, বরেণ্য দেশনেতা, শিক্ষাবিদ ও মনীষীদের মূর্তি ভাঙা, স্কুল-কলেজ পোড়ানো প্রভৃতি বিকৃত আন্দোলনে পর্যবসতি হয়। প্রথম দিকে চীন প্রকাশ্যে CM (ML)-এর কৃষিবিপ্লবের নীতি সমর্থন করলেও পরে তাদের কর্মপদ্ধতির সমালোচনা করে। এই সমালোচনা এবং নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে CM (ML) ক্রমশ কয়েকটি উপদলে ভাগ হতে শুরু করে। সরকার এই দলটির বিরুদ্ধে অতি কঠোর দমন নীতি প্রয়োগ করেন। এর ফলে দলের বহু কর্মী নিহত এবং অনেকে কারারুদ্ধ হন; পুলিশ এবং অনেক সাধারণ লোকও মারা পড়ে। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে নির্বাচনে কংগ্রেস দল ক্ষমতায় আসে। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ জুলাই তিনি গোপন আবাস থেকে গ্রেফতার হন এবং ২৮ জুলাই ভোরে হৃদ্‌রোগে তাঁর মৃত্যু হয় বলে সরকারপক্ষ ঘোষণা করে। তবে তাঁর সমর্থকগণ দাবি করে থাকেন যে, নির্যাতনের কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। দ্র. সরদার আবদুর রহমান : *বরেন্দ্র চরিতকোষ*, হেরিটেজ রাজশাহী, ২০১৭, পৃ. ১২৬।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সেই অনুযায়ী আমাদের পার্টিও পরোক্ষভাবে 'স্বীকৃতি' লাভ করেছিলচীনা পার্টিও; যদিও আগেই বলেছি যে, ঢাকায় চীনা দূতাবাসের সাথে বা অন্য কোনোভাবে চীনা পার্টির সাথে আমাদের পার্টির অথবা পূর্ব বাংলা পার্টির কোনো সরাসরি যোগাযোগ ছিল না। উপরন্তু সে যোগাযোগের চেষ্টা করে এখানকার নেতারা বিফল হয়েছিলেন। যাহোক, ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় 'দুই কুকুরের বিরোধিতা'র সাথে সাথে গ্রামাঞ্চলে জোতদারদের গলা কাটা লাইন উপরিউক্ত দুই পার্টির দ্বারা জোরেশোরে কার্যকর করা শুরু হলো। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের স্বাধীনতাযুদ্ধের মতো একটি জাতীয় নির্যাতনবিরোধী যুদ্ধের সময় সারা দেশে ঐক্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই লাইন যে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে, তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই।'

বদরুদ্দীন উমর আরও বলেন—

'মহাজন, ব্যবসায়ী অথবা যে-ই হোক, একজনকে হত্যা করলে তার আত্মীয়স্বজন, শ্রেণিগত বন্ধু ও সমর্থক, এমনকি সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সেই নিহত ব্যক্তির প্রতি বিরূপ মনোভাব পরিত্যাগ করে অনেক ক্ষেত্রে সহানুভূতিশীল হয়। কাজেই রাজনৈতিক লাইন হিসেবে শত শত গ্রামীণ জোতদার মহাজনকে হত্যা করলে তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া যে নিদারুণ বিরূপ হবে, সেটাই স্বাভাবিক। সে সময় হত্যার "বিপ্লবী" তাগিদ এক একজনকে এমন পেয়ে বসেছিল যে, তারা অনেকে একা একাই এক্ষেত্রে সেঞ্চুরি করেছিল। অর্থাৎ একশতের বেশি জোতদার মহাজন অথবা সেইভাবে কথিত ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল। সেই সময় কেউ কেউ স্থানীয়ভাবে, রাজনীতির নামে ব্যক্তিগত হিসাব-নিকাশ করতেও দ্বিধাবোধ করেনি। এর ফলে জুলাই আগস্ট মাসের মধ্যেই আমাদের পার্টির সামরিক স্কোয়াডগুলোকে জনগণই আতঙ্কের চোখে দেখতে শুরু করলেন এবং অনেক জায়গায় তারা জনগণের ও মুক্তিবাহিনীর তাড়া খেয়ে ভ্রাম্যমাণ সন্ত্রাসী গ্রুপ হিসেবে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় পালিয়ে বেড়াতে বাধ্য হলো। বিচ্ছিন্নভাবে অনেকে ঢাকা শহরে এসে আশ্রয় গ্রহণ করল। এভাবেই তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবী লাইন জনগণের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে, নিজেদের পার্টি সংগঠনের মধ্যে চক্রান্তমূলক তৎপরতার নানা শর্ত সৃষ্টি করে এবং সামরিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে ছিন্নভিন্ন হলো।'[১১৫]

---

[১১৫] বদরুদ্দীন উমর : *একাত্তরের স্বাধীনতাযুদ্ধে বাঙলাদেশের কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক ভূমিকা*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা; এপ্রিল, ১৯৯৬, পৃ. ১৪।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আব্দুল কুদ্দুস সিকদার উল্লেখ করেন, বামপন্থিদের যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল, তারা মনে করতেন যে, দুই শক্তির পারস্পরিক সংঘাতে জনসাধারণের কোনো ভূমিকা থাকতে পারে না। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে এটাই ছিল তাদের তত্ত্বগত অবস্থান। এই তত্ত্বগত অবস্থানের কারণেই সেদিন তারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল। এ চেতনার অন্যতম নেতা আব্দুল হক বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর কাছে বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালনার জন্য সাহায্য চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন মর্মে ভুট্টোর জীবনীতে উল্লেখ করা হয়েছে। সে সময় জনাব তোয়াহাও আব্দুল হকের সাথে একই সংগঠন করতেন।[১১৬]

গবেষক আব্দুল কুদ্দুস সিকদার আরও উল্লেখ করেন—দেবেন সিকদার, আবুল বাশার, আব্দুল মতিন, আলাউদ্দিন আহমদ, আমজাদ হোসেন, টিপু বিশ্বাস প্রমুখের নেতৃত্বাধীন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। দেবেন সিকদার, আবুল বাশার প্রমুখের নেতৃত্বাধীন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি মুক্তিযুদ্ধের মূল স্রোতে রয়ে যায়। এ অংশের সশস্ত্র তৎপরতা ছিল প্রধানত নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে। এ সংগঠনের নেতা বি এম কলিমুল্লাহ'র নেতৃত্বে চাঁদপুরে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে এক বিরাট বাহিনী ও ঘাঁটি গড়ে উঠেছিল। তবে আব্দুল মতিন, আলাউদ্দিন আহমদ, আমজাদ হোসেন, টিপু বিশ্বাস প্রমুখের নেতৃত্বাধীন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি মোহাম্মদ তোয়াহা-সুখেন্দু দস্তিদার এবং আব্দুল হক-শরদিন্দু দস্তিদার-এর নেতৃত্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (এম.এল)-এর মতই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অনেকটা বিভ্রান্তির শিকার হন। এদের তৎপরতা ছিল বৃহত্তর রাজশাহী, বৃহত্তর পাবনা এসব এলাকায়। যুদ্ধের প্রথমদিকে অহিদুর রহমানের নেতৃত্বে নওগাঁর আত্রাইসহ এক বিরাট অঞ্চল মুক্ত এলাকা হিসেবে গড়ে উঠেছিল। পাবনা শহরকে স্বাধীন করা এবং সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু করার ক্ষেত্রে টিপু বিশ্বাসের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়; কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধেও অস্ত্র ধারণ করেছিল।[১১৭]

---

[১১৬] আব্দুল কুদ্দুস সিকদার : *বাংলাদেশের বাম রাজনীতি*, ১৯৪৭-১৯৭১, পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, ২০১২-২০১৩, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

[১১৭] প্রাগুক্ত।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বাংলাদেশে তৎপরতা

বামপন্থা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে সমাজতন্ত্রীদের যেসব স্লোগান পুরো ৭০ দশক থেকে ৯০ দশকজুড়ে অব্যাহত থাকতে দেখা যায়, তার মধ্যে ছিল—'শ্রেণিশত্রু খতম করো, শ্রমিক রাজ কায়েম করো', 'বন্দুকের নলই সকল ক্ষমতার উৎস', 'সাম্রাজ্যবাদের পরিণাম বাংলা হবে ভিয়েতনাম', কিংবা বাংলাদেশে (সোভিয়েতপন্থি) 'আফগান স্টাইলে বিপ্লব' করা হবে প্রভৃতি। এ ছাড়া 'মুক্তিযুদ্ধ হলো দুই কুকুরের লড়াই', 'সংসদ হলো শুয়োরের খোঁয়াড়', 'ভোটের বাক্সে লাথি মারো, অস্ত্র হাতে তুলে ধরো', 'হারামজাদা জনগণ থাকল তোদের নির্বাচন আমরা চললাম সুন্দরবন'—এ জাতীয় 'বাণী'-ও মানুষের স্মৃতিপটে জাগরূক আছে। এসব স্লোগান, কর্মকাণ্ড ও তৎপরতা বাংলাদেশে অত্যন্ত দাপটের সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে। আর এসবের কৃতিত্বের দাবিদার দেশের বামপন্থি রাজনৈতিক দলগুলো এবং তাদের নেতা-কর্মীরা।

বাংলাদেশের অর্ধশত বছরের ইতিহাসে দেখা যায়, শ্রেণিশত্রু খতমের নামে বিচারবহির্ভূত নির্বিচার হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করা, গ্রামে গ্রামে বেসরকারি আদালত বসিয়ে 'মৃত্যুদণ্ড' ঘোষণা ও রায় কার্যকর করা, বাংলাদেশের বুকে বিদেশি দূতাবাসে হামলার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা, থানা ও পুলিশফাঁড়িতে হামলা, অস্ত্র-গোলাবারুদ লুণ্ঠন, জনপ্রতিনিধিদের হত্যা, আইন প্রয়োগকারী সদস্যদের হত্যা প্রভৃতি আইন ভঙ্গকারী ও রাজদ্রোহমূলক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে বামপন্থি রাজনৈতিক দলগুলোর মাধ্যমে।

বাংলাদেশে বামপন্থি দলসমূহ

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে অন্তত ২৫টি বামপন্থি রাজনৈতিক দল রয়েছে। প্রকাশ্যে তৎপর দলগুলোর অধিকাংশ নেতাই গোপন ও সশস্ত্র

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাজনীতির অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। প্রকাশ্যে তৎপর দলগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি (মেনন), বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি (সাইফুল), জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ (ইনু), জাসদ (রব), বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ (খালেকুজ্জামান), বাসদ (মাহবুব), ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-ন্যাপ (ভাসানী), ন্যাপ (মোজাফফর), গণতন্ত্রী পার্টি, শ্রমিক-কৃষক সমাজবাদী দল, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগ, বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল প্রভৃতি। গোপনে তৎপর পার্টিগুলোর মধ্যে নাম জানা গেছে—কর্নেল (অব) তাহের প্রতিষ্ঠিত গণবাহিনী (জাসদ), বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল), পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল), পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-বিপিসি (জিয়াউদ্দিন), বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (মার্কসবাদী-লেলিনবাদী), বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ (মা. লে.), গণমুক্তি ফৌজ প্রভৃতি। এর মধ্যে গণবাহিনী এবং সর্বহারাদের বিভিন্ন খণ্ডাংশের তৎপরতা এখন অত্যন্ত সীমিত হয়ে পড়েছে।

এসব বামপন্থি দল ও গ্রুপের বিভিন্নমুখী 'কেবলা' রয়েছে। মূল দুই 'কেবলা' মস্কো ও পিকিং থেকে বিচ্যুতির পর এসব বামপন্থিরা বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব, দল ও দেশের লেজুড়ে পরিণত হয়। কার্ল মার্কস, লেনিন, মাও সেতুং, স্ট্যালিন, ট্রটস্কি প্রমুখের জীবনাবসানের পর কেউ চারু মজুমদারের নকশালবাড়ির লাইন নেয়, কেউ ভারতের বামপন্থিদের লেজুড়বৃত্তি গ্রহণ করে, কেউ কিউবার ফিদেল ক্যাস্ট্রো কিংবা চে-গুয়েভারা, কেউবা আলবেনিয়ার আনোয়ার হোজ্জাকে তাত্ত্বিক নেতা মেনে টিকে থাকার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে।

বামপন্থিরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সবচেয়ে বড়ো লড়াকু হিসেবে প্রচারের প্রয়াস চালালেও দেখা যায়, সে সময় এদের বড়ো অংশই মুক্তিযুদ্ধকে 'দুই কুকুরের লড়াই' হিসেবে আখ্যা দিয়ে একই সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা ও পাক বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। একটি অংশ আবার ভারতকে সম্প্রসারণবাদী আখ্যা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাও করেছে। এমনকি তারা বহু মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যাও করেছে। বৃহত্তর পাবনা অঞ্চলে বামপন্থিদের হাতে মুক্তিযোদ্ধা নিহত হওয়ার বেশ কিছু ঘটনার কথা জানা যায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরও কোনো কোনো বামপন্থি গ্রুপ নামের আগে 'পূর্ব পাকিস্তান' ব্যবহার অব্যাহত রাখে। এর অন্যতম ছিল 'পূর্ব পাকিস্তানের বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কর্স-লেনিন)।'

'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি' নামক চরমপন্থি সংগঠন সম্পর্কে অমর ভট্টাচার্য তাঁর *লাল তমসুক* গ্রন্থে জানান—ইপিসিপি (এম-এল) থেকে কাজী জাফর আহমেদ, হায়দার আকবর খান রনো ও রাশেদ খান মেনন

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রমুখ বের হয়ে এক উপদল গঠন করেন। এই দলের নেতারা নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলনকে সমর্থন করেন এবং নিজেদের খাঁটি 'নকশালপন্থি' হিসেবে তুলে ধরতে শুরু করেন। এমনকি (সিপিআই এম এল গঠনের পূর্বে) সারা ভারত কো-অর্ডিনেশন কমিটির অনুসরণে উপরিউক্ত নেতৃবৃন্দ পূর্ব বাংলায় কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটি গঠন করেন। তাঁরা নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলন দ্বারা এতদূর অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যে, পূর্ব বাংলায় নকশালবাড়ির অনুরূপ ঘটনা ঘটাতে চেষ্টা করেন। বাহিরদিয়া ও হাওর করাইয়ারতে তাঁরা এক আন্দোলনের সৃষ্টি করে 'হাওর করাইয়ার লাল, আগুন দিকে দিকে জ্বালাও দ্বিগুণ'—এরূপ স্লোগান দিয়েছিলেন। বলা যায়, তাঁরা নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলন দ্বারা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।[১১৮]

বাংলাদেশে পিকিংপন্থি নামে খ্যাত ও পরিচিত কমিউনিস্টদের একটি অংশের নেতৃত্বে ছিলেন সুখেন্দু দস্তিদার, তোয়াহা, আবদুল হক প্রমুখ নেতা। এই দল নকশালবাড়ি আন্দোলনের ঘটনা প্রথমে সমর্থন করেননি। কিন্তু যখন চীন একে সমর্থন দেয়, তারপরই দ্বিধাহীনভাবে নেতারা সমর্থন করতে থাকেন। এদের নেতা টিপু বিশ্বাস ও আলাউদ্দিন আহমেদ গ্রেফতার হওয়ার পর মনিরুজ্জামান তারা নেতৃত্বে আসেন। ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের আগেই মনিরুজ্জামান তারা মুজিববাদীদের হাতে নৃশংসভাবে নিহত হন। তবে পরবর্তী নেতৃত্বে পরিচালিত দল চারু মজুমদারের 'শ্রেণিশত্রু খতম' লাইন আঁকড়ে থাকে। তাঁরা মনে করেন, চারু মজুমদারের লাইনই সঠিক। তাঁরা নকশালবাড়ি আন্দালনে দৃঢ় সমর্থন জারি রাখেন। এই দলের পথনির্দেশক তাত্ত্বিক ভিত্তি হচ্ছে মার্কসবাদ, লেনিনবাদ, মাও সেতুং-এর চিন্তাধারা ও চারু মজুমদারের শিক্ষা।[১১৯]

পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির একটি লিফলেটে জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলা হয়—

'আমরা ডাক দিচ্ছি পূর্ব বাংলার শোষিত কৃষক শ্রমিক মধ্যবিত্ত বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী ও ক্ষুদে দেশপ্রেমিক ধনিকদের; আপনারা প্রতি গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধ ছড়িয়ে দিন, খতম করুন শ্রেণিশত্রুদের, প্রতিষ্ঠা করুন জনগণের গণতান্ত্রিক স্বাধীন পূর্ব বাংলা। এই সময় পার্টির ঢাকা জেলা ইউনিটও এক লিফলেট প্রচার করে।

---

[১১৮] অমর ভট্টাচার্য : *লাল তমসুক* (নকশাল বাড়ি আন্দোলনের প্রামাণ্য তথ্য-সংকলন), অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা; মার্চ, ২০১৬, পৃ. ২১৩।

[১১৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

"পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব এবং জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের পথে এগিয়ে আসুন" শীর্ষক সাইক্লোস্টাইলকৃত এই লিফলেটে বলা হয়—পূর্ব বাংলার বিপ্লবী জনগণ পূর্ব বাংলাকে শোষণমুক্ত করা ও পূর্ব বাংলায় শোষণমুক্ত সুখী সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে আপনারা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি আপনাদের বিপ্লবী সালাম জানাচ্ছে।...বন্দুকের নল থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতা বেরিয়ে আসে এবং যে জনগণের নিজস্ব সেনাবাহিনী নেই, সে জনগণের কিছুই নেই। বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের নেতা কমরেড মাও সেতুং-এর শিক্ষানুযায়ী পূর্ব বাংলায় জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে জনতার মুক্তি ফৌজ আমাদের গড়ে তুলতেই হবে। পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি এ নীতির ভিত্তিতে এগিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি পূর্ব বাংলার নিপীড়িত জনগণের পার্টি। এ পার্টি আপনাদের সংগ্রামের সাথে আছে। যেকোনো প্রকার আপস প্রতিহত করুন। নিপীড়িত জনতার জয় সুনিশ্চিত।'[১২০]

@PDF বইয়ের সমাহার

[১২০] আমজাদ হোসেন : *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের রূপরেখা*, পড়ুয়া, ঢাকা; মার্চ, ১৯৯৭, পৃ. ৮৩।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শ্রেণিসংগ্রাম ও গেরিলা যুদ্ধ

বামপন্থি তথা সমাজতন্ত্রীদের সংজ্ঞা অনুযায়ী তাদের প্রধান প্রতিপক্ষ হলো– বুর্জোয়া, ধনিকশ্রেণি, মৎসুদ্দী, মহাজন ইত্যাদি। কোনো কোনো মতের সমাজতন্ত্রীর অভিধায় এরা হলো শ্রেণিশত্রু এবং এদের বিরুদ্ধে লড়াই হলো শ্রেণিসংগ্রাম। সমাজতন্ত্রের চরমপন্থার অনুসারীরা এই শ্রেণিশত্রু খতম বা বিনাশ করাকে সংগ্রামের মূল হাতিয়ার বিবেচনা করে থাকেন।

শ্রেণিসংগ্রামের অন্যতম কৌশল ছিল গেরিলা যুদ্ধ। এ বিষয়ে সমাজতন্ত্রীদের কোনো রাখঢাক ছিল না। চারু মজুমদারের ভাষ্যেই সেটি প্রতীয়মান হয়। তাঁর মতে—

> 'শ্রেণিশত্রুকে খতম করা হলো শ্রেণিসংগ্রামের উন্নত রূপ এবং এই খতম করার কাজটিই হলো গেরিলা সংগ্রামের প্রাথমিক স্তর। শ্রেণিশত্রুকে খতম করার অর্থ শুধু ব্যক্তিকে খতম করা নয়; তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিপত্তিকেও খতম করা।...একমাত্র শ্রেণিশত্রুকে নির্মূল করার অভিযানের মাধ্যমে দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষক সমগ্র কৃষক জনতার ওপর নেতৃত্ব কায়েম করতে পারে।'[১২১]

চারু মজুমদারের মতে, একমাত্র ক্ষমতা দখলের রাজনীতিই পারে দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে তীব্র শ্রেণিঘৃণা জাগিয়ে তুলতে এবং এই রাজনীতিকে অধিনায়ক করেই খতম অভিযানকে উচ্চতর স্তরে তোলা যায়।[১২২]

---

[১২১] চারু মজুমদার : ভারতের বিপ্লবী কৃষক সংগ্রামের অভিজ্ঞতার সারসংকলন করে এগিয়ে চলুন, দেশব্রতী; ৪ ডিসেম্বর, ১৯৬৯।

[১২২] চারু মজুমদার সমগ্র (ভূমিকা), আবু সালেক সম্পাদিত, *ঘাস ফুল নদী, ঢাকা*, ১৯৯৭।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমদ উল্লেখ করেন, ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি সর্বহারা পার্টির নেতৃত্বাধীন 'পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তিবাহিনী'র নাম বদলে 'পূর্ব বাংলার সশস্ত্র দেশপ্রেমিক বাহিনী' রাখা হয়। অনুরূপভাবে জন্মকালে জাসদ নিজেকে একটি সমাজতান্ত্রিক গণসংগঠন হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিল। তৃতীয় বছরে তারা একটি বিপ্লবী পার্টি গড়ার প্রক্রিয়া শুরু করে। যদিও এই পার্টির নামকরণ হয়নি। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দের জুনে গঠন করা হয় 'বিপ্লবী গণবাহিনী'। সর্বহারা পার্টির 'সশস্ত্র দেশপ্রেমিক বাহিনী' এবং জাসদের 'বিপ্লবী গণবাহিনী'র লক্ষ্য ছিল অভিন্ন— ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারকে উৎখাত করা।[১২৩]

সর্বহারা নামধারী সমাজতন্ত্রীদের সশস্ত্র লড়াই প্রসঙ্গে মহিউদ্দিন আহমদের দীর্ঘ বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি উল্লেখ করেন—১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের শুরু থেকে সর্বহারা পার্টি[১২৪] তার নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার কাজ শুরু করে জোর কদমে। এর নাম দেওয়া হয় 'দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনী'। এর কাঠামো অনেকটা দেশের সামরিক বাহিনীর মতো। সবার নিচে হলো গেরিলা গ্রুপ। একটি গ্রুপে পাঁচ থেকে নয়জন সদস্য। তাঁদের হাতে থাকবে কমপক্ষে তিনটি থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল এবং একটা আধা স্বয়ংক্রিয় এসএলআর অথবা জি-থ্রি রাইফেল। তিনটি গেরিলা গ্রুপ নিয়ে হবে একটি প্লাটুন। প্লাটুনের কাছে কমপক্ষে একটি স্টেনগান থাকবে। তিনটি প্লাটুন নিয়ে তৈরি হবে একটি কোম্পানি। কোম্পানির সংগ্রহে থাকবে ন্যূনতম একটি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র— এলএমজি এবং একটি রিভলবার বা পিস্তল। একটি ব্যুরোতে এক বা একাধিক সেক্টর থাকতে পারে। কোম্পানি থাকবে

---

[১২৩] মহিউদ্দিন আহমদ : *লাল সন্ত্রাস : সিরাজ সিকদার ও সর্বহারা রাজনীতি*, বাতিঘর, ঢাকা; এপ্রিল, ২০২১, পৃ. ১৩৯।

[১২৪] 'পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি' হচ্ছে বাংলাদেশের একটি কমিউনিস্ট দল। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চের ঘটনার পর সিরাজ সিকদার বরিশাল জেলার স্বরূপকাঠি অঞ্চলে চলে যান। এখানে তিনি স্থানীয় যুবক, সেনাবাহিনীর প্রাক্তন ও পলাতক সৈনিকদের সংগঠিত করে একটি বাহিনী গঠনের প্রচেষ্টা নেন। স্বরূপ কাঠির পেয়ারাবাগানে তার নেতৃত্বে গঠিত হয় 'পূর্ব বাংলার সশস্ত্র দেশপ্রেমিক বাহিনী' (১৯৭০ সালেন ৩০ এপ্রিল)। ১৯৭১ সালের ১ থেকে ৩ জুন স্বরূপকাঠির পেয়ারাবাগানে সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় সিরাজ সিকদার উল্লেখ করেন, 'সর্বহারা পার্টি সর্বপ্রথম তুলে ধরে জাতীয় শত্রু খতমের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীলতার ভিত্তিতে জাতীয় মুক্তির গেরিলা যুদ্ধ সূচনা করার সঠিক সামরিক লাইন।' সর্বহারা পার্টির 'বিপ্লবী কর্মী ও গেরিলারা সর্বপ্রথম ১৯৭১ সালের প্রথমদিকে জাতীয় শত্রু খতম করে। দ্র. আমজাদ হোসেন, বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল, পড়ুয়া, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১৫৮।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সরাসরি সেক্টর কমান্ডারের অধীনে। অস্ত্রের সংখ্যা নিয়ে নিয়মের এত কড়াকড়ি ছিল না। এটা নির্ভর করত অস্ত্র পাওয়া বা না পাওয়ার ওপর। প্রত্যেক স্তর বা ইউনিটে আছেন একজন রাজনৈতিক প্রধান। তাঁর পদবি রাজনৈতিক কমিসার। তাঁর সঙ্গে আছেন একজন সামরিক প্রধান। তাঁর পদবি কমান্ডার। গেরিলাদের অস্ত্রের প্রশিক্ষণের সঙ্গে সামরিক দলিল পড়ানো হয় এবং সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা কীভাবে তৈরি করা হয়, তার খুঁটিনাটি শেখানো হয়। প্রশিক্ষণের দায়িত্বে থাকেন রাজনৈতিক কমিসার ও কমান্ডার।

দল চালাতে টাকা-পয়সা লাগে। কর্মীরা যথেষ্ট কৃচ্ছ্রসাধন করেন। আয়-ব্যয়ের সব হিসাব দলের ঊর্ধ্বতন পরিচালকের কাছে দিতে হয়। টাকা-পয়সার টানাটানি লেগেই থাকে। দলের শেল্টার চালানো, দলিল ছাপানো ও বিলি করা—এসব কাজের জন্য টাকা জোগাড় করতে হয়। এজন্য ব্যাংক লুটের পথ বেছে নেওয়া হয়। অস্ত্র জোগাড়ের প্রধান উৎস হলো পুলিশের ফাঁড়ি কিংবা থানা লুট। গেরিলারা দুই ধরনের আক্রমণে অংশ নেন। আচমকা কোনো লক্ষ্যবস্তুর ওপর হামলার জন্য অস্ত্রপাতি ব্যবহারের কোনো বাধাধরা নিয়ম নেই। হাতের কাছে যা পাওয়া যায়, তা দিয়েই আক্রমণ করা হয়। এরা হলো কমান্ডো। এদের দেওয়া হয় রিভলবার, পিস্তল, স্টেনগান, হ্যান্ড গ্রেনেড, ছুরি ইত্যাদি। সুবিধামতো অস্ত্র না পাওয়া গেলে শুধু গামছা ব্যবহার করেই কাজ সারা হয়। মেহেন্দিগঞ্জে একটি কমান্ডো গ্রুপ একবার শুধু ছাতায় ব্যবহৃত লোহার শিক, ছুরি ও পেনসিল দিয়ে আক্রমণ চালিয়েছিল। বরিশালে একবার একটি পুলিশফাঁড়িতে হামলা করা হয়েছিল শুধু ব্লেড দিয়ে।

বড়ো ধরনের কোনো আক্রমণের জন্য সাজানো হয় বিশেষ দল। এদের সার্বক্ষণিকভাবে প্রস্তুত রাখা হয়, যাতে যেকোনো সময় অভিযান চালানো যায়। এজন্য ভালো রকমের প্রস্তুতির দরকার হয়। এসব অভিযানে কমপক্ষে দুটি স্টেনগান থাকলে ভালো। কারণ, প্রয়োজনের সময় একটি স্টেনগান নাও কাজ করতে পারে। বরিশালে একটি অভিযানে একবার এ রকম ঘটেছিল। দলের সঙ্গে একটি স্টেনগান ছিল। গুলি করার সময় এটি জ্যাম হয়ে যায়। গুলি বের হয়নি। একবার একটি অপারেশনে গেরিলারা দুটি হ্যান্ড গ্রেনেড নিয়ে গিয়েছিল। একটাও ফাটেনি। একবার একটি শহরে আক্রমণের পরিকল্পনা হয়। গেরিলা, গাইড, স্কাউটসহ প্রস্তুত করা হয় একটি দল। যথাসময়ে শুরু হয় আক্রমণ। কিন্তু স্টেনগান দিয়ে ব্রাশফায়ার করার সময় গুলি বের হয়নি। এতে ওই কমান্ডো ঘাবড়ে যান। আরেকজন কমান্ডো দ্বিতীয় স্টেনগানটি দিয়ে গুলি ছুড়তে গেলে সেটা দিয়েও গুলি বের হয়নি। এটা দেখে প্রথম কমান্ডো আরও ঘাবড়ে যান। অপারেশনের আগে অস্ত্রগুলো ভালোভাবে পরীক্ষা করা হয়নি। অন্য একটি

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অপারেশনে দুটি হাতবোমা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত ছিল। প্রথম বোমাটি ছোড়ার পর ফাটেনি। দ্বিতীয় বোমাটি লক্ষ্যবস্তুর ওপর ঠিকমতো পড়েনি। এই অপারেশনে গাইডের দায়িত্বে থাকা কর্মীটি অস্বাভাবিক আচরণ শুরু করে। সে কমান্ডোদের যে পথ দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তা ছিল তাদের অপরিচিত। ফেরার পথে তাদের অনেক সমস্যা হয়।[১২৫]

জাতীয় শত্রু খতম

১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি থেকে সর্বহারা পার্টির কর্মীরা তাদের আক্রমণের গতি বাড়িয়ে দেয়। তাদের প্রধান লক্ষ্য 'জাতীয় শত্রু খতম'। মহিউদ্দিন আহমদের বিবরণে জানা যায়, ১৯৭৩-এর জুলাই থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ১৪টি পুলিশফাঁড়ি, থানা ও ব্যাংকে হামলা চালানো হয়। এর মধ্যে ছিল—

- ২৬ জুলাই : মুন্সিগঞ্জের লৌহজং থানা ও ব্যাংক।
- ১ আগস্ট : মানিকগঞ্জের ঘিওর থানার জাবরা পুলিশক্যাম্প।
- ৯ আগস্ট : ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে উচাখিলা পুলিশক্যাম্প।
- আগস্ট : ময়মনসিংহের ত্রিশালে ধানিখোলা পুলিশক্যাম্প।
- আগস্ট : মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া থানা ও খাদ্যগুদাম।
- নভেম্বর : সিলেটে বালাগঞ্জ থানা।
- ৩ নভেম্বর : চাঁদপুরে মতলব থানা ও ব্যাংক।
- ৩ ডিসেম্বর : ময়মনসিংহে আঠারোবাড়ি ব্যাংক।
- ১২ ডিসেম্বর : পার্বত্য চট্টগ্রামে চন্দ্রঘোনা থানা।
- রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে খানখানাপুর ব্যাংক।
- ফরিদপুর সদরে চানপুর পুলিশফাঁড়ি।
- বরিশাল সদরে ইন্দেরহাট পুলিশক্যাম্প ও ব্যাংক।
- বরিশালের ভাসানচর পুলিশফাঁড়ি।
- নেত্রকোনার বারহাট্টা থানা।

এর মধ্যে বারহাট্টা থানা আক্রমণ পুরোপুরি ব্যর্থ হয় এবং আঠারোবাড়ি ব্যাংক হামলায় আংশিক বিপর্যয় ঘটে। বাকি আক্রমণগুলো সফল ও দখল হয়েছে বলে

---

[১২৫] মহিউদ্দিন আহমদ : *লাল সন্ত্রাস : সিরাজ সিকদার ও সর্বহারা রাজনীতি*, বাতিঘর, ঢাকা; এপ্রিল, ২০২১, পৃ. ১৪৫-১৪৭।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সর্বহারা পার্টির দাবি। ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে ফাঁড়ি, থানা ও ব্যাংকে হামলা অব্যাহত থাকে। ফেব্রুয়ারিতে আক্রমণ হয় ময়মনসিংহের গফরগাঁও থানা, আগস্ট মাসে ঢাকার কেরানীগঞ্জে আটি পুলিশফাঁড়ি। এরপর একে একে আক্রমণের শিকার হয়—

- পটুয়াখালীর বাউফল থানা।
- বরিশালের বাবুগঞ্জ থানা।
- টাঙ্গাইল সদরে পাতরাইল পুলিশক্যাম্প।
- বরিশাল সদরে টরকিতে একটি ব্যাংক।
- নেত্রকোনার মদন থানা।
- পার্বত্য চট্টগ্রামে ফারোয়া পুলিশক্যাম্প।
- বরিশালে বল্লাফাঁড়ি (অবশ্য এ আক্রমণটি ব্যর্থ হয়)।
- বাউফল থানা (আক্রমণ করতে গিয়ে সর্বহারা পার্টির লোকেরা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে)।[১২৬]

সাপ্তাহিক *বিচিত্রা*-এর বরাতে মহিউদ্দিন আহমদ উল্লেখ করেন—১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ৫ জানুয়ারি জাতীয় সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এক বিবৃতিতে বলেন, ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি থেকে তেহাত্তরের মে পর্যন্ত সারা দেশে দুষ্কৃতকারীদের হামলা ও গুপ্তহত্যার শিকার হয়েছে ৪ হাজার ৯২৫ জন। *বিচিত্রা*-এর নিবন্ধে বলা হয়, তেহাত্তরের ১২ জুন থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ২০৩ দিনে ৫৮টি থানা ও ফাঁড়িতে সশস্ত্র হামলা হয়। এর মধ্যে ২৮টি থানা ও ফাঁড়ি লুট হয়। অস্ত্র লুট হয় ৩০০-এর বেশি। হতাহত পুলিশের সংখ্যা শতাধিক। দিনাজপুর, রংপুর ও পাবনা ছাড়া সব জেলা থেকেই থানা ও ফাঁড়ি লুটের খবর এসেছে। পুলিশের মতে, সশস্ত্র হামলাকারীরা কোনো একটি সংঘবদ্ধ দলের নয়। তারা বিভিন্ন দলের। এসব হামলা ও লুটের অনেকগুলোই করেছে সর্বহারা পার্টির লোকেরা।[১২৭]

১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে যেসব থানা ও ফাঁড়ি লুট হয়েছে, তার একটা তালিকা পাওয়া যায় *বিচিত্রা*'য় প্রকাশিত নিবন্ধে। তালিকায় পুরোনো বৃহৎ জেলার নাম উল্লেখ করা হয়েছে—

- ১৮ জুন : ছাতরা ফাঁড়ি, নিয়ামতপুর থানা, রাজশাহী
- ২২ জুন : মাধায়া ফাঁড়ি, দৌলতপুর থানা, কুষ্টিয়া।
- ২৬ জুন : মিয়াবাজার ফাঁড়ি, কাঁঠালিয়া থানা, বরিশাল।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

- ২৮ জুন : চরফ্যাশন থানা, বরিশাল।
- ২ জুলাই : লালমোহন থানা, বরিশাল।
- ৯ জুলাই : আলীপুর ফাঁড়ি, বৈদ্যেরবাজার থানা, ঢাকা ।
- ২৬ জুলাই : রামকৃষ্ণ মিশন ফাঁড়ি, কোতোয়ালি থানা, ফরিদপুর।
- ১ আগস্ট : জাবরা ফাঁড়ি, ঘিওর থানা,
- ৯ আগস্ট : উচাখিলা ফাঁড়ি, ঈশ্বরগঞ্জ থানা, ময়মনসিংহ।
- ১৩ আগস্ট : ইন্দেরহাট ফাঁড়ি, স্বরূপকাঠি থানা, বরিশাল।
- ২৩ আগস্ট : চন্দনপুর ফাঁড়ি, হোমনা থানা, কুমিল্লা।
- ১ সেপ্টেম্বর : ধানিখোলা ফাঁড়ি, ত্রিশাল থানা, ময়মনসিংহ।
- ৩ সেপ্টেম্বর : চানপুর ফাঁড়ি, কোতোয়ালি থানা, ফরিদপুর।
- ২৯ সেপ্টেম্বর : দামনাস ফাঁড়ি, বাগমারা থানা, রাজশাহী ।
- ৯ অক্টোবর : হরিনাকুণ্ড ফাঁড়ি, যশোর।
- ১৩ অক্টোবর : হালদা ফাঁড়ি, মিরপুর থানা, কুষ্টিয়া।
- ২১ অক্টোবর : হারতা ফাঁড়ি, উজিরপুর থানা, বরিশাল।
- ২৫ অক্টোবর : বালিয়াকান্দি ফাঁড়ি, ফরিদপুর।
- ২৬ অক্টোবর : ভাসানচর ফাঁড়ি, মেহেন্দিগঞ্জ থানা, বরিশাল।
- ২৮ অক্টোবর : পাথরঘাটা থানা, পটুয়াখালী।
- ২ নভেম্বর : পাথরাইল ফাঁড়ি, টাঙ্গাইল।
- ২২ নভেম্বর : বালাগঞ্জ থানা, সিলেট।
- ২৫ নভেম্বর : পাচন্দর ফাঁড়ি, তানোর থানা, রাজশাহী।
- ২৯ নভেম্বর : মতলব থানা, কুমিল্লা।
- ১২ ডিসেম্বর : চন্দ্রঘোনা থানা, পার্বত্য চট্টগ্রাম।

এর সঙ্গে যোগ হয়েছিল ব্যাংকে হামলা। তেহাত্তরের পয়লা আগস্ট জাতীয় সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, তেহাত্তরের ওই দিন পর্যন্ত ব্যাংক থেকে লুট হয়েছে ৪০ লাখ টাকা। ২১ সেপ্টেম্বর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, লুটের পরিমাণ ৪৯ লাখ টাকা। সব হামলা ও লুটের সঙ্গে সর্বহারা পার্টি জড়িত ছিল না। যে এলাকায় যে দলের শক্তি বেশি, তারা এ ব্যাপারে সুযোগ নিয়েছে। সশস্ত্র ডাকাতদলের তৎপরতাও ছিল অনেক জায়গায়।[১২৮]

---

[১২৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১-১৭২।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

@PDF বইয়ের সমাহার

একপর্যায়ে এই চরমপন্থি সমাজতন্ত্রীদের নিজেদের মধ্যে হানাহানিও শুরু হয়। তারা নিজেদের লোকদেরও ধরে ধরে বিচার ও মৃত্যুদণ্ড দিতে থাকে। চীনের কুখ্যাত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে একটি গ্রুপ আলাদা কমিটি গঠন করে। প্রতিপক্ষকে তারা 'ভ্রান্ত ও প্রতিবিপ্লবী' আখ্যা দিয়ে বিদ্রোহ করে। ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর তারা গঠন করেন 'অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থাপকমণ্ডলী (অবম)'। প্রতিপক্ষের নেতাদের বিরুদ্ধে 'অবম' শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়। কয়েকজন নেতাকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করে তাঁদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারিতে কয়েকজন কর্মী ঢাকার গ্রিন সুপার মার্কেটের সামনে অতর্কিত আক্রমণের শিকার হন। তাঁদের ওপর গুলি চালানোর চেষ্টা করা হয়। এ ধরনের দ্বন্দ্বের পরিণতিতে খুন হন মাহতাব। সেইসঙ্গে খুন হন তাঁর স্ত্রী জীবন ওরফে পারভিন আখতার।[১২৯]

এভাবে সরকার উৎখাত করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের প্রক্রিয়ায় অন্যের ঘর উজাড় করার জন্য যে অগ্নিযজ্ঞ শুরু করা হয়, তার লেলিহান শিখায় নিজেদের ঘরও পুড়তে থাকে। দলের শীর্ষ নেতা আর নীতিনির্ধারক কেউই এই আগুন থেকে রেহাই পায়নি। প্রতিভাবান কমরেড ফজলু আর বুদ্ধিজীবী কবি হুমায়ুন কবিরও বাদ যাননি। দলের 'বিশ্বাসঘাতকতা' রেহাই দেয়নি কমরেড সিরাজ সিকদারকেও।

আশরাফ কায়সার *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*'য় চরমপন্থি হত্যাযজ্ঞের বিবরণ প্রদান করেন এভাবে—

---

[১২৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'ত্রিশোর্ধ্ব শফি মাহমুদের জীবনে অন্য অনেক দিনের মতোই হয়তো শুরু হয়েছিল ১৬ মের সকালটি। দিনের পুরো সময়টিতেই তিনি স্বাভাবিক কর্মতৎপর থেকেছেন সাতক্ষীরার তালা থানার দেওয়ানী পাড়া গ্রামে। কিন্তু গভীর রাতের নিস্তব্ধতায় পুরোপুরি পালটে যায় তার নিজস্ব পৃথিবী। জবাই করে হত্যা করা হয় তাকে। গ্রামের উত্তরণ সংস্থার পূর্ব পার্শ্বের রাস্তার ওপর পড়ে থাকে তার খণ্ডিত মস্তকের নিথর দেহটি। পাশে সাদা কাগজের ওপর লাল হরফের একটি চিঠি। তাতে লেখা—'জনগণের স্বার্থ পার্টির স্বার্থ। পার্টির শৃংখলা ভঙ্গ করে ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় পার্টির নামে চাঁদা আদায় করার অপরাধে আঞ্চলিক কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শফী ওরফে আজাদকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইল।'

এই ঘটনাটি দেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া অসংখ্য হত্যাকাণ্ড ঘটনার একটি। গোপন রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, পারস্পরিক কোন্দল এবং রাজনৈতিক মতাদর্শের কথিত শ্রেণিশত্রু খতমের অভিযানে মৃত্যু উপত্যকা হয়ে উঠেছে দেশের ওই বিশেষ অঞ্চলটি। প্রায় প্রতিরাতেই খুন হচ্ছে মানুষ। একাকী কিংবা দলবদ্ধভাবে। কাউকে খুন করা হচ্ছে গুলিবিদ্ধ করে, কেউ হত্যার শিকার হচ্ছেন জবাই-এর মতো বীভৎস প্রক্রিয়ায়। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা বিশেষ করে ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, সাতক্ষীরা ও যশোর এখন ভয়ার্ত জনপদ। চরমপন্থি কয়েকটি সশস্ত্র দলের মধ্যে এলাকা দখল ও প্রভাব বিস্তারের প্রতিযোগিতায় গত পাঁচ মাসে এ জেলাগুলোতে হত্যার শিকার হয়েছেন প্রায় দেড়শত মানুষ। এই সময়ে শুধু ঝিনাইদহ জেলাতেই সশস্ত্র গ্রুপের হাতে খুন হন ৫৪ জন।'[১৩০]

আশরাফ কায়সারের আরও বর্ণনা করেন—সাম্প্রতিক সময়ের (১৯৯৩) হত্যাকাণ্ড ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ তীব্র আকার ধারণ করেছে এসব সংগঠনের পারস্পরিক বিরোধকে কেন্দ্র করে। সব কটি দলই সশস্ত্র পন্থায় ক্ষমতা দখলের আদর্শ প্রচার করলেও এর প্রক্রিয়া, বিপ্লবের স্তর, রাজনৈতিক চিন্তাধারায় সংশোধনবাদ প্রভৃতি বিষয়ে ভিন্নমত এবং দেশীয় পরিস্থিতির সঙ্গে অনেকাংশেই সম্পর্কহীন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তাত্ত্বিক প্রসঙ্গে বিতর্ক রয়েছে। এসব কারণে দেখা যায় এক দল আরেক দলকে 'প্রতিবিপ্লবী', 'দালাল' প্রভৃতি নামে অভিহিত করে থাকে। দলগুলোর মধ্যে সার্বক্ষণিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিদ্যমান এলাকার নিয়ন্ত্রণ-দখলকে

---

[১৩০] আশরাফ কায়সার, *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ১৮ জুন, ১৯৯৩।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কেন্দ্র করে। এসব কারণে শ্রেণিশত্রু খতমের পাশাপাশি মতাদর্শিক শত্রু নিধনেও সমান গুরুত্ব দেখাচ্ছে এই দলগুলো।

হত্যাকাণ্ডগুলোর অধিকাংশের নেপথ্যেই বর্তমানের রয়েছে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা। গত ৬ মাসে যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলে দলগুলোর সংঘাতে প্রাণ হারিয়েছেন ৭৪ জনের বেশি মানুষ। বন্দুকযুদ্ধে এক দিনে নিহত হয়েছেন ১২ জন। গত ৩ মার্চ একসঙ্গে ৭ জনকে জবাই করার মতো নৃশংস ঘটনাও ঘটেছে। এই হানাহানি প্রধানত ঘটে বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি ও পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে।[১৩১]

প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট চুয়াডাঙ্গা থানার কুতুবপুর ইউনিয়নের রতন মন্ডল ও তার বড়ো ছেলেকে প্রকাশ্য দিনের আলোতে মাঠের মধ্যে জবাই করা হয়। বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক এ দুজন গরু কেনার জন্য হাটে যাচ্ছিলেন। জবাই-এর পর এদের মাথা শ্যালো মেশিনের বোরিং-এর ওপর ঝুলিয়ে রেখে গরু কেনার ১১ হাজার টাকা নিয়ে যায় পূর্ব বাংলার কর্মীরা। এরপর ঝিনাইদহের গোপালপুরের আক্কাস আলী, ডাকবাংলো এলাকার সমর্থক আব্দুল মান্নান (ডুডি)-সহ পার্টির হিসাব মতে, ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দেই প্রতিপক্ষের হাতে খুন হন তাদের ৪৩ জন কর্মী-সমর্থক।

১৯৯৩-এর ১৯ মে খুলনার ডুমুরিয়া থানার আল্লাদীপুর গ্রামে খুন হন ভবতোষ রায় ভক্ত (৪০) ও পঞ্চানন মন্ডল (৫০)। পঞ্চানন মণ্ডল ছিলেন মাগুরখালী ইউনিয়নের চৌকিদার। সুখ নদীর পাড়ে ভক্তকে হত্যার সময় তিনি ঘটনাটা দেখে ফেললে তাকেও হত্যা করা হয়। ৪ মে চুয়াডাঙ্গা সদরের ঘাসপাড়া গ্রামে আপন দুই ভাই মধু (২৮) ও ইউনুসকে ধান মাড়াইরত অবস্থায় খুন করা হয়। ৩ মে ঝিনাইদহের কোর্ট চাঁদপুরে হত্যা করা হয় জাসদ (রব) নেতা আলী বক্সকে। ২৭ এপ্রিল ঝিনাইদহের আসাননগরে খুন হন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী মজনু (৩৫)। পূর্ব বাংলার কর্মীরা তাকে কুপিয়ে হত্যা করে একটি চিঠিতে 'পুলিশের দালাল' হিসেবে চিহ্নিত করে যায়।[১৩২]

আশরাফ কায়সার উল্লেখ করেন, ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে নেতৃত্ব নিয়ে সৃষ্ট পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্বে খুন হন ফজলু, সুলতান, হুমায়ূন কবীরসহ অনেক কর্মী। ১৯৭৩-৭৫ সময়ে দলের গেরিলাদের একটি বড়ো অংশ নিহত হয় রক্ষীবাহিনী ও পুলিশের সঙ্গে সশস্ত্র যুদ্ধে। এ সময় মুন্সিগঞ্জে মোশাররফ, খলিল, লোকমান, কালামসহ

---

[১৩১] প্রাগুক্ত।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গ্রায় ২০০ জন কর্মী নিহত হন। একইভাবে ফরিদপুরের রাজেরে নিহত হন ৬০ জন। বরিশাল ও মাদারীপুরে নিহত হয় দেড়শতের মতো কর্মী। এ ছাড়া কুষ্টিয়া, খুলনা, বগুড়া, পাবনা ও টাঙ্গাইলে দলের অনেক কর্মী নিহত হয়। ১৯৭৫-এর জানুয়ারি মাসে দলের প্রধান ব্যক্তি সিরাজ সিকদারকে গ্রেফতার ও হত্যা করা হয়। এই হত্যার ফলে সর্বহারা পার্টির সশস্ত্র কর্মকাণ্ড কমে আসে এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে শুরু হয় নেতৃত্বের প্রশ্নে উপদলীয় কোন্দল ও দলের ভেতরের হত্যাকাণ্ড।[১৩৩]

সিরাজ সিকদার হত্যাকাণ্ড

৩ জানুয়ারি ১৯৭৫ দেশের প্রতিটি দৈনিক পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় সংবাদ শিরোনাম—'সিরাজ শিকদার গ্রেফতার : পালাতে গিয়ে নিহত।' ২ জানুয়ারি গভীর রাতে প্রদত্ত পুলিশের সংবাদ বিজ্ঞপ্তির বরাত দিয়ে সংবাদে বলা হলো—'পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি নামে পরিচিত আত্মগোপনকারী চরমপন্থি দলের নেতা সিরাজুল হক সিকদার ওরফে সিরাজ সিকদারকে পুলিশ গত ১ জানুয়ারি চট্টগ্রামে গ্রেফতার করে। সেই দিনই তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ঢাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।'[১৩৪]

আশরাফ কায়সার উল্লেখ করেন—দলের ভেতরে অন্তর্দ্বন্দ্বের শুরু সিরাজ সিকদারের জীবিতকাল থেকেই। দলের ভেতরে বিভিন্ন সময়ে সৃষ্ট বিভক্তি ও মতবিরোধের কারণে সর্বহারা পার্টির অনেক নেতা-কর্মী খুন হয়েছে। বিশেষ করে সিরাজ সিকদারের মৃত্যুর পর নেতৃত্ব শূন্যতার সময়টিতে দলের মধ্যে বিভিন্ন গ্রুপ গড়ে ওঠে। একপক্ষ আরেক পক্ষকে 'মৃত্যুদণ্ড' প্রদানের রীতি প্রচলন করে। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সর্বহারা পার্টি কয়েকটি উপদলে বিভক্ত হয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

এই দলটির শীর্ষস্থানীয় নেতাদের অধিকাংশই বিভিন্ন সময়ে নিহত হয়েছে দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বে। দলটি আওয়ামী লীগ আমলে তাদের সবচে বেশি সদস্য নিহত হওয়ার কথা বলে থাকে। কিন্তু একটি বিশেষ পর্যালোচনায় দেখা গেছে—১৯৭২-৭৫ সময়ে নিহত সর্বহারা সদস্যদের অধিকাংশই ছিল সাধারণ সমর্থক, সেখানে নেতৃস্থানীয় ক্যাডার বা পার্টি গেরিলাদের সংখ্যা খুবই কম।

---

[১৩৩] আশরাফ কায়সার : *বাংলাদেশে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা: ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫, পৃ. ৫৫।

[১৩৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত সময়ে দলের পাঁচজন নেতা সিরাজ সিকদার, পলাশ, তাহের, সাঈদ, জাহিদ নিহত হন শত্রুপক্ষের হাতে। অন্যদিকে ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দলটির ১২ জন নেতৃস্থানীয় ক্যাডার নিহত হন অর্ন্তদ্বন্দ্বে, পার্টি সদস্যদের হাতে। এরা হলেন ফজলু, হুমায়ুন কবীর, ইঞ্জিনিয়ার আমানুল্লাহ (মাসুদ), মাহতাব, মনসুর, আতিক (চঞ্চল), বিন্দু, জীবন, আনিস, রতন, মজিব (মোটা) ও রফিক। এরা সবাই ছিলেন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি বা সমপর্যায়ের সদস্য। এই হত্যাগুলোর বেশির ভাগই সংঘটিত হয় সিরাজ সিকদার নিহত হওয়ার পরবর্তী এক বছরে।

নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলে 'সামান্য' অপরাধে দলীয় কর্মী হত্যার রীতি সর্বহারা পার্টিতে চালু ছিল প্রথম থেকেই। ১৯৭৪-এ ঢাকার কেরানীগঞ্জে হত্যা করা হয় পার্টি কর্মী তরনকে। প্রথমে প্রেম করার অপরাধে দল তাকে বহিষ্কার করে। পরে চাঁদা আদায়ের অভিযোগে তাকে হত্যা করা হয়। তুচ্ছ কারণে কর্মী হত্যার এ রকম অনেক ইতিহাস রয়েছে সর্বহারা পার্টির। শ্রেণি নির্ধারণেও দলটি আদর্শের পাশাপাশি উত্তেজনা ও আবেগ দ্বারা চালিত হয়। যেমন : সিরাজ সিকদার মারা যাওয়ার পর বরিশালের এক গ্রামে 'ময়সর' নামে এক পাগলকে খুন করে পার্টি কর্মীরা। তার অপরাধ সে পার্টি সম্পর্কে পাগলামির প্রলাপ বকেছিল।

সর্বহারা পার্টির ভেতরের হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে দলটির সাবেক নেতা রইসউদ্দিন আরিফ লিখেছেন—

> 'বিপ্লবী পার্টিতে মতবিরোধ থাকে। কিন্তু মতবিরোধকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষ পার্টি কমরেডদেরকে জলে-স্থলে-অন্তরিক্ষে যেখানে পাওয়া যায়, সেখানেই ধরে জবাই করার উদ্ভট লাইন সর্বহারা পার্টিতে যেভাবে শেকড় গেড়ে বসেছিল, পৃথিবীর আর কোনো বিপ্লবী পার্টির ইতিহাসে তার নজির খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। পার্টি কর্মীদেও ভুলত্রুটি এমনকি ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের কারণে কর্মীদের খতম করার ঘটনা লেনিন এবং মাও-এর পার্টিতে একটিও ঘটেছে বলে আমার জানা নেই।'[১৩৫]

মৃত্যুদণ্ডের ছড়াছড়ি

চরমপন্থি সর্বহারাদের 'মৃত্যুদণ্ড' আতঙ্ক সৃষ্টি করে পুরো দক্ষিণাঞ্চলে। এই মৃত্যুদণ্ড অনুসারেই দল দুটো ('সর্বহারা' ও পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি)

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একের পর এক খুন করে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে। আশরাফ কায়সার উল্লেখ করেন, গত বছরের অক্টোবর মাসে (১৯৯২) নড়াইল সদর থানার সিংরাশোলপুর বাজারে সন্ত্রাসবিরোধী সভায় বক্তব্য রাখছিলেন কৃষক সংগ্রাম সমিতির নেতা মহব্বত হোসেন এবং অন্য কয়েকজন। এ কারণে ১৯ অক্টোবর সর্বহারা পার্টি মাইক বাজিয়ে ও দেওয়ালে পোস্টার সেঁটে ঘোষণা দেয় মহব্বত হোসেনসহ পাঁচজনের মৃত্যুদণ্ড। এর মধ্যে গত বছরের ১৩ নবেম্বর (১৯৯২) মহব্বত হোসেনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। শহর থেকে বাড়ি ফেরার সময় পিটিয়ে হত্যা করে মহতের লাশ ফেলে রাখা হয় সিঙ্গাশোলপুর বাজারে। একই প্রক্রিয়ায় নারায়ণ মাস্টার কিছুদিন আগে নড়াইলে খুন হন।[১৩৬]

সংবাদপত্রের কিছু প্রতিবেদন

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য চরমপন্থা গ্রহণ ও সশস্ত্র আক্রমণের ঘটনা নিয়ে প্রচুর প্রতিবেদন সংবাদপত্রের পাতায় প্রকাশিত হয়। দেশে গণতান্ত্রিক ধারায় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কালেও এ ধরনের খবর প্রকাশ অব্যাহত থেকেছে। নমুনা হিসেবে কয়েকটি প্রতিবেদন এখানে পরিবেশিত হলো।

দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার (২০০৪) এক প্রতিবেদনে জানানো হয়—

> 'অর্থশালী মানুষের কাছে সশস্ত্র সর্বহারারা মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি করত। চাঁদা না দিলে তাদের হত্যা করা হবে বলে হুমকি প্রদান করা হতো। কেউ কেউ চাঁদা দিয়ে এলাকায় বসবাস করত, কেউ কেউ ভয়ে এলাকা ছেড়ে শহরে এসে বসবাস করত। ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ এপ্রিলে সারাদেশে আলোচিত আত্রাই নৈদীঘি গ্রামে সিক্স মার্ডার-এর শিকার বিএনপি নেতা আব্দুল জব্বার, সুকবর আলী, জাহাঙ্গীর আলম, মোজাম্মেল হক, শাহজাহান আলী ও ইকবাল হোসেন বিদ্যুত; ১০ মে পুলিশের সোর্স আত্রাইয়ের আবু হোসেন সাজ্জাদ; ২১ সেপ্টেম্বর যুবদল নেতা আয়নুল হক ভুট্টু; ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দের ১২ জানুয়ারি রানীনগর একডালা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মো. আফজাল হোসেন; ৬ ফেব্রুয়ারি আত্রাই গ্রামসরকার প্রধান আহম্মদ আলী ও ১১ মার্চ মান্দার প্রসাদপুর বাজারে থানা বিএনপির সহসভাপতি মো. মুনসুর আলী মৃধাকে হত্যা করা হয়। ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ২০ মার্চ যুবলীগ নেতা লাল মোহাম্মদ লালু; ২৯ মে কৃষক লীগ নেতা গোলাম নবী; ১০ ডিসেম্বর আব্দুল লতিফ মেম্বার; ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ মার্চ আ'লীগ নেতা এডভোকেট

---

[১৩৬] আশরাফ কায়সার, *বিচিত্রা*; ১৮ জুন, ১৯৯৩।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সিদ্দিকুর রহমান রাজা ও শ্রমিক লীগ নেতা অরুণ সরকার; ৪ অক্টোবর যুবলীগ নেতা দেলোয়ার হোসেন বেলাল; ৭ অক্টোবর বিএনপি নেতা ও মনিয়ারী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এডভোকেট আব্দুস সাত্তার চৌধুরী; ২০০০ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ জুন রানীনগর থানা ছাত্রলীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম নজু; ২০০১ খ্রিষ্টাব্দের ৩ জানুয়ারি রানীনগরের আ'লীগ নেতা মজিবর রহমান; ১৬ জুন যুবলীগ নেতা সাখাওয়াত হোসেন; ৫ জুলাই ব্যবসায়ী শহিদুল ইসলাম; ১৪ আগস্ট আত্রাই আ'লীগ নেতা মোজাফফর হোসেন; ৮ অক্টোবর রানীনগর বিএনপি নেতা সোলায়মান আলী; ১ নভেম্বর আ'লীগ নেতা আনিছুর রহমান; ২০০২ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ জানুয়ারি রানীনগরের ছাত্রদল নেতা মুকুল; ২০ জানুয়ারি আত্রাইয়ের বিএনপি কর্মী হোটেল ব্যবসায়ী মজিবর রহমান; ২১ মে যুবলীগ নেতা মো: ভুট্টু; ২৩ জুন রানীনগর থানা আ'লীগের সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন মাস্টার; ২৩ জুলাই ভাটকে বাজারের মুদি দোকানদার আব্দুল মজিদ; ৩০ আগস্ট আত্রাই বিএনপি নেতা এডভোকেট আব্দুস সোবহান চৌধুরী; ৪ সেপ্টেম্বর রানীনগরের মাছ ব্যবসায়ী আব্দুল গফুর; ৯ সেপ্টেম্বর আত্রাই বিষা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বিএনপি নেতা হাজী মোজাম্মেল হোসেন; ১৮ অক্টোবর সোহাগী বেগম; ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারি আত্রাইয়ে মুক্তিযোদ্ধা গিয়াস উদ্দিন; ২৪ মার্চ আব্দুল জাব্বার বাচ্চু; ৩ এপ্রিল নওগাঁ শহরের শরিষাহাটির মোড়ে আত্রাই ছাত্রদলের নেতা সালামত হোসেন চৌধুরী ওরফে সুবাস; শরিয়া গ্রামের জাগ্রত জনতার কর্মী আব্দুর রাজ্জাক ও নজরুল ইসলামকে গ্রাম পাহারা দেওয়ার সময় চরমপন্থিরা মসজিদের বারান্দায় জবাই করে হত্যা করে গত ১৭ মে রাতে।'[১৩৭]

দৈনিক সমকাল পত্রিকায় (২০০৬) পরিবেশিত এক প্রতিবেদনে জানানো হয়–

'নাটোরে পুলিশফাঁড়িতে হামলার আট মাসের মাথায় নওগাঁর চৌবাড়িয়া হাটে চার পুলিশসহ পাঁচজনকে জবাই করে হত্যাসহ অস্ত্র লুটের ঘটনায় খোদ পুলিশের মধ্যেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় সংঘটিত হত্যাকাণ্ড ও অস্ত্র লুটের ঘটনার সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পর চরমপন্থি অধ্যুষিত এলাকার থানা ও ফাঁড়ির পুলিশ সদস্যরা হতভম্ব হয়ে পড়ে। সীমিত জনবলের এসব পুলিশফাঁড়ি বর্তমানে ঝুঁকিতে রয়েছে। গত বছর ২৮ ডিসেম্বর চরমপন্থিরা সিংড়ার বামিহাল পুলিশফাঁড়িতে হামলা চালিয়ে তিন আর্মড পুলিশকে হত্যা করে গোলাবারুদ লুট করে নিয়ে যায়।

---

[১৩৭] *দৈনিক ইনকিলাব*, ঢাকা: ১ জুন ২০০৪।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এ ঘটনার আট মাস পেরুতে চললেও লুণ্ঠিত কোনো অস্ত্র উদ্ধার বা প্রকৃত অপরাধীদের গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। স্বাধীনতার ৩৫ বছরে নাটোর ও নওগাঁসহ উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় ২০টি থানা, পুলিশফাঁড়ি ও পুলিশক্যাম্পে হামলা চালিয়েছে চরমপন্থি দলের সদস্যরা। এসব হামলায় অন্তত অর্ধশত পুলিশ নিহত হয়েছে। লুট করা হয়েছে পাঁচ শতাধিক অস্ত্র। এসব হামলায় মামলা দায়ের করা হলেও হামলাকারীরা রয়েছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। লুণ্ঠিত অস্ত্রেও বেশির ভাগই আজও উদ্ধার করা যায়নি।

একটি সূত্র জানায়, এসব ঘটনায় দায়েরকৃত বেশ কটি মামলা রাজনৈতিক দেখিয়ে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। কিছু মামলার নথি উধাও হয়ে গেছে। আবার কিছু মামলার বিচার কাজ ২০ বছরেও শেষ হয়নি। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে নওগাঁর মান্দা থানার দামনাশ ও আত্রাই থানার গণ্ডগোহালী এবং নিয়ামতপুরের ছাতরা পুলিশফাঁড়িতে হামলা, গুলিবিনিময়, পুলিশ হত্যা ও অস্ত্র লুট মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে ১৯৭৯-৮০ খ্রিষ্টাব্দে। মামলাগুলো রাজনৈতিক মামলা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব ঘটনায় ৩২ পুলিশ নিহত ও বিপুল অস্ত্র লুণ্ঠিত হয়। দামনাশে চরমপন্থিদের হামলায় ২২ জন এবং গণ্ডগোহালীতে ১০ পুলিশ নিহত হয়। অন্যদিকে ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে নাটোরের গুরুদাসপুর থানায় চরমপন্থিরা হামলা চালিয়ে এক পুলিশ কনস্টেবলকে হত্যা করে থানা হাজতে আটক তিন চরমপন্থি দলের সদস্যকে হাজতখানা ভেঙে ছিনিয়ে নেওয়াসহ বিপুল পরিমাণ অস্ত্র লুট করে। লুণ্ঠিত অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে ১৮টি রাইফেল, ৪টি এসএলআর, ২টি এসএমজি, রাইফেলের গুলি ৮০০ রাউন্ড, এসএলআরের গুলি ৩২০ রাউন্ড এবং ১৮০ রাউন্ড এসএমজির গুলি। ২০ বছরেও গুরুদাসপুর থানা লুট মামলা নিষ্পত্তি হয়নি। ৫ বছর আগে সব সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ সম্পন্ন হলেও মামলার রায় দেওয়া হয়নি।

সূত্রমতে, স্বাধীনতার পর চরমপন্থি দলের সদস্যরা উত্তরাঞ্চলের নাটোর, নওগাঁ, রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি জেলার চলনবিল অধ্যুষিত দুর্গম থানা ও পুলিশক্যাম্পগুলোতে হামলা করেছে। তারা লুটে নিয়ে গেছে অস্ত্র ও গুলি। পুলিশের লুণ্ঠিত অস্ত্র দিয়েই তারা বিভিন্ন স্থানে অপারেশন চালিয়েছে। নাটোর ও নওগাঁর বিভিন্ন থানা ও পুলিশক্যাম্প লুট করা ছাড়াও ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে বগুড়ার দুপচাঁচিয়া থানা ও ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে পাবনার আটঘরিয়া থানায় হামলা চালানো হয়।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুর থানার নাজিরগঞ্জ ক্যাম্পে হামলা করে ৪টি রাইফেল ছিনতাই করা হয়। ২০০২ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ সেপ্টেম্বর সিরাজগঞ্জের বেলকুচি রাঙ্কনীবাড়ী পুলিশফাঁড়িতে হামলা চালিয়ে চরমপন্থিরা ৪ পুলিশ হত্যাসহ ৭টি এসএলআর ও ২টি রাইফেল লুট করে।'[১৩৮]

দৈনিক নয়া দিগন্ত পত্রিকার (২০০৬) প্রতিবেদনে বলা হয়—

'১৯৭২ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত গত ৩৫ বছরে রাজশাহী বিভাগের আট জেলায় বাম-চরমপন্থিরা ১২ হাজার মানুষ হত্যা করেছে। এদের ভয়ে ৩০ হাজার পরিবারের ৫০ হাজারেরও বেশি মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে আশ্রয় নিয়েছে। এ সময় অনেকে ভিটামাটি বিক্রি করে চলে গেছে। অনেকে আবার বিদেশ চলে গেছে চরমপন্থিদের ভয়ে। এখনও এ আট জেলার কমপক্ষে ৪০টি গ্রাম চরমপন্থি সর্বহারাদের দখলে। গত ৩৫ বছরে চরমপন্থিরা কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার নামে অবাধে গণহত্যা, ডাকাতি ও চাঁদাবাজি করেছে। নিজেরাও মরেছে কিন্তু কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার কিছুই করতে পারেনি।'[১৩৯]

দৈনিক যুগান্তর (২০০৩) এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করে—

'রাজশাহীর বাগমারা ও নওগাঁর আত্রাই-রানীনগর এখন সন্ত্রাস ও রক্তাক্ত জনপদ। শ্রেণিশত্রু খতমের নামে চরমপন্থি সন্ত্রাসীদের হাতে প্রতিনিয়ত খুন হচ্ছে মানুষ। কিন্তু তার কোনো প্রতিকার নেই। বাগমারা, আত্রাই ও রানীনগরবাসীর মৃত্যুর তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। গত ৫ বছরে বাগমারা, আত্রাই ও রানীনগর এলাকায় চরমপন্থিদের হাতে খুন হয়েছে অর্ধশতাধিক ব্যক্তি।

গত ৭ ফেব্রুয়ারি (২০০৩) বাগমারা থানার তাহেরপুর পুলিশফাঁড়ি থেকে মাত্র দেড়শত গজ দূরে খুন হন জেলা বিএনপি'র সহ-সভাপতি আবদুল ওয়াহেদ মণ্ডল। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার কারণেই খুনিরা ওয়াহেদ মণ্ডলকে হত্যা করে নিরাপদে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। পরে এ কারণে বিক্ষুব্ধ জনতা ফাঁড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। আত্রাই থানার নৈদীঘি গ্রামে এই ৬ খুনের কিছু সময় আগে নিহতরা দীঘিরপাড় পুলিশক্যাম্পে গিয়ে গ্রামবাসীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার জন্য পুলিশকে অনুরোধ করেন। কিন্তু ক্যাম্পের পুলিশ এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নেয়নি। গত বছরের

---

[১৩৮] *দৈনিক সমকাল*, ঢাকা: ২৮ আগস্ট, ২০০৬।

[১৩৯] *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ঢাকা; ৩১ আগস্ট, ২০০৬।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

(২০০৫) ৫ সেপ্টেম্বর বাগমারায় খুন হন আলোকনগর ইউপির ৯ নম্বর ওয়ার্ড শাখা জাপার সভাপতি ও ইউপি মেম্বার আমজাদ হোসেন চৌধুরী ওরফে বাবুল, এর আগে ২৯ মে চরমপন্থিরা খুন করে আলোকনগর ইউপি জাপার সাংগঠনিক সম্পাদক রেজানুর বারী ওরফে মনাক্কাকে। চাঁদা না দেওয়ায় ৩ জানুয়ারি খুন হন জাপা নেতা ও ব্যবসায়ী আবুল হোসেন সরকার দুলু।

গত বছর অর্থাৎ ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে আত্রাই-রানীনগরে খুন হন মুনিয়ারি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আবদুস সোবহান, যুবলীগ নেতা ভুট্টু প্রামানিক, আওয়ামী লীগ নেতা মুজিবুর রহমান। এর আগের বছর ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে বাগমারায় খুন হন আলোকনগর ইউপি চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলী খামারুর ছেলে মমতাজ আলী খামারু, চরমপন্থি গ্রুপের কিলার ফারতুলের বাবা মোজাফফর প্রামানিক। একই বছরে আত্রাই-রানীনগরে খুন হন আওয়ামী লীগ নেতা মনসুর আলী, কৃষক লীগ নেতা মোজাফ্ফর হোসেন, বড়োগাছা সাধারণ ইউপি যুবলীগের সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন, আওয়ামী লীগ নেতা মজিবর রহমান। ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে বাগমারায় চরমপন্থিরা খুন করে শুভডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম রব্বানীকে। এই বছর আত্রাই-রানীনগরে খুন হন রানীনগর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম নজু।'[১৪০]

রক্ষীবাহিনীর সত্য-মিথ্যা গ্রন্থের লেখক আনোয়ারুল আলম লিখেছেন—

'....বিভিন্ন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলে গড়ে ওঠা মুক্তিবাহিনী বিশেষত চীনপন্থি উগ্র বামপন্থিরা কোথাও অস্ত্র জমা দেয়নি। তারা সেসব অস্ত্র, তাদের ভাষায় "সশস্ত্র শ্রেণিসংগ্রামের" নামে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, জোতদার, এমনকি এমপি হত্যার কাজে পর্যন্ত লাগাতে থাকে। কারণ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তাদের উদ্দেশ্য ছিল শ্রেণিশত্রু খতম করা। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারত বিভক্তির পর সদ্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানে একশ্রেণির উগ্র বামপন্থি স্লোগান তুলেছিল, "লাখো ইনসান ভুখা হায়/ইয়ে আজাদি ঝুটা হায়"। তেমনি সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের চীনপন্থি তথাকথিত উগ্র বামপন্থিরা স্বাধীনতাকে স্বীকার করতে চায়নি। তাদের দলের নাম পর্যন্ত বদলায়নি। তারা দলের নাম পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি রাখে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার

---

[১৪০] সমীর কুমার দে, *দৈনিক যুগান্তর*, ঢাকা; ২৭ এপ্রিল, ২০০৩।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিরুদ্ধে প্রচারপত্র বিতরণ করতে শুরু করে। তখন পর্যন্ত গণচীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। না দেওয়ার কারণে তারাও (চীনপন্থি উগ্র বাম দল) চায়নি বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিতে। এমন ঘটনা পৃথিবীর কোথাও ঘটেছে বলে আমার জানা নেই। এ সময় ভারতের পশ্চিমবঙ্গে চারু মজুমদারের নেতৃত্বে চীনপন্থি উগ্র বামপন্থিরা নকশাল আন্দোলনের নামে বহু মানুষ হত্যা করতে থাকে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আগেই পশ্চিমবঙ্গে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা শুরু হয়েছিল। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশেও এর প্রভাব পড়ে। সদ্য স্বাধীন দেশে সবকিছু ছিল বিশৃঙ্খল অবস্থায়। উগ্রপন্থিরা এই সুযোগ কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। সরকার তখন বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নিয়ে এদের কার্যক্রম অনেকটা দমন করতে সক্ষম হয়। স্বাধীনতার এত বছর পর আমার মনে হচ্ছে, এসব কার্যক্রম প্রথম দিকেই দমন না করতে পারলে বাংলাদেশের জন্য গভীর সংকটের কারণ হতো। কারণ, তাদের সন্ত্রাসী আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল পুলিশের থানা, ফাঁড়ি লুট করা; মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ সংগ্রহ করা এবং নিজেদের সন্ত্রাসী তৎপরতা বৃদ্ধি করে সদ্য স্বাধীন দেশে সন্ত্রাস ও অরাজকতা সৃষ্টি করা।'[১৪১]

বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির হালচিত্র

বাংলাদেশে একটি কমিউনিস্ট পার্টির হানাহানির সর্বশেষ যে চিত্র পাওয়া যায়, তা বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চিত্রটি নিম্নরূপ :

- ২০০৮ সালের ১ জানুয়ারি বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির আমিরুল ইসলাম ওরফে রুলু পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হন।
- বাংলাদেশ পুলিশ বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির ৩ জনকে ২০০৮ সালের ৮ মার্চ কুষ্টিয়া থেকে আটক করে।
- ২৯ জুন ২০০৮, বাংলাদেশ পুলিশ অফিসারদের সাথে বন্দুকযুদ্ধে বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির একজন নেতা নিহত হন।
- ২০ আগস্ট ২০০৮ সালে, বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির তিনজন বিদ্রোহীকে ঝিনাইদহ জেলা থেকে আটক করা হয়।

---

[১৪১] আনোয়ারুল আলম : *রক্ষীবাহিনীর সত্য-মিথ্যা*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা; অক্টোবর, ২০১৩।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

- বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির একজন নেতাকে ২০০৯ সালের এপ্রিলে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির হাতে হত্যা করা হয়।
- বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি ১১ এপ্রিল ২০০৯ সালে খুলনা বিভাগে সক্রিয় ১৩টি বহিরাগত দলের একটি ছিল।
- ২৮ মার্চ ২০০৯, বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির তিন নেতাকে টাঙ্গাইলে ২০০২ সালে এক ওষুধ ব্যবসায়ীকে হত্যার দায়ে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
- ২০০৯ সালের অক্টোবরে, বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির একজন কর্মী, আবু সাঈদ সরকার ওরফে রাঙ্গা সাঈদ খুলনায় বন্দুকযুদ্ধে নিহত হন।
- ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি চুয়াডাঙ্গা জেলায় পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির এক নেতাকে গুলি করে হত্যা করে।
- বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির মোজাম সরদার ২৩শে সেপ্টেম্বর ২০১০ ঝিনাইদহ জেলায় বাংলাদেশ পুলিশ ও র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হন।
- র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন ফেব্রুয়ারি, ২০১১ তারিখে মেহেরপুর জেলা থেকে বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির চার সদস্যকে বন্দুক ও বোমাসহ আটক করে।
- র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন ৬ অক্টোবর, ২০১১ তারিখে বন্দুকযুদ্ধে দলের সদস্যকে হত্যা করে।
- বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির শৈলেন্দ্র নাথ বিশ্বাস জানুয়ারী ২০১২ তারিখে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হন।
- ২ জানুয়ারি, ২০১৪, পুলিশ বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির একজন সদস্যকে আটক করে। বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির সিরাজ আকঞ্জি জুলাই, ২০১৪ তারিখে পার্টির একটি অংশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হন।
- ৪ সেপ্টেম্বও, ২০১৫, বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির দুই কর্মী, যাদেরকে পাংশা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান হত্যার সাথে জড়িত সন্দেহ করা হয়েছিল, বাংলাদেশ পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হন। বন্দুকযুদ্ধে পাংশা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি) আবু শামা ইকবাল হায়াত আহত হয়েছেন।
- ২০২০ সালের ১৯ ডিসেম্বর খুলনা জেলায় বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির এক নেতাকে গুলি করে হত্যা করা হয়।[১৪২]

---

[১৪২] ডেইলি স্টার (ঢাকা)-এর বিভিন্ন তারিখের প্রতিবেদন অবলম্বনে bn.wikipedia.org/wiki/বিপ্লবী/কমিউনিস্ট/পার্টি

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একটি জবানবন্দি

সাপ্তাহিক *বিচিত্রা*-তে একজন সর্বহারা কর্মীর আর্তি তুলে ধরা হয়, যার সূচনা ছিল—'...এগুলো করে একদিন আমিও শেষ হয়ে যাব।' বিবরণে উল্লেখ করা হয়—

'১৯৯৩ সালে পুলিশের বড়ো একটি দল দীর্ঘক্ষণ বন্দুকযুদ্ধের পর লক্ষীপুর থেকে গ্রেফতার করে পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির আলোচিত নেতা শাহাবুদ্দীন স্বপনকে। এই ঘটনার মাত্র ৬ দিন আগে ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু থানার কুমার নদীর তীরে ৩ ব্যক্তিকে খুন করে তার নেতৃত্বাধীন বাহিনী। মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেফতারের পর স্বপন আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করে। জবানবন্দিতে সে উল্লেখ করে—১৯৮৫ সালে আলমডাঙ্গা কলেজ হতে এইচএসসি পাস করি। ১৯৭৭ সালে সন্ত্রাসীদের হাতে আমার পিতা নিহত হয়। ওই মামলায় দুজনের জেল হয়। তারা বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। ১৯৮৫ সালে হরিণাকুন্ডুর কালিশংকরপুরের জনৈক কামালের সঙ্গে পরিচয় হয়। কামালের মাধ্যমে জাসদ গণবাহিনীতে যোগ দিই। গোপন কর্মকাণ্ড চালাই। ৩/৪ মাস পূর্বে আলমডাঙ্গার লাল মোহাম্মদ রাতো নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হয়। সে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। সে ভারতের সীমান্ত হতে বুদাপেস্টে তৈরি একটি রাইফেল আনে এবং আমাকে দেয়। এই রাইফেলের মূল্য বাবদ ৬০ হাজার টাকা পরিশোধ করি। একদিন রাত্রিবেলা উক্ত লাল মোহাম্মদ রাতো মালেক নামক ব্যক্তিকে সাথে করে মোটরসাইকেলযোগে চাদর গায়ে দিয়ে আমার বাড়িতে এসে রাইফেল দিয়ে যায়। দুই মাস পূর্বে ৩০ হাজার টাকা দিয়ে আরও দুটি একনলা বন্দুক ক্রয় করি। এই অস্ত্র চাঁদা আদায়ের সময় ব্যবহার করতাম। গত ২৭/৪/১৯৯৩ তারিখে আমি সঙ্গীয় মিজান, শহিদুল, সবদুল, আজিজুল, প্রদীপ, মালেক ও আমিরুলকে সাথে নিয়ে পার্টির পক্ষে পোস্টারিং করার জন্য কুষ্টিয়া থানাধীন হরিনারায়ণপুর যাই। ওই দিন রাত্রি বেলা আমরা হরিনারায়ণপুর বাজারে পোস্টার লাগাই এবং রাত অনুমান ১০ ঘটিকার সময় পুনরায় মধুপুর হরিনারায়ণপুর আসিলে রাস্তার ওপর কুমারখালির মীরপুর গ্রামের জনৈক আলফাজউদ্দীন, কাইয়ুম ও হোসেন আলীকে দেখি। তাদের কাছে একটি শর্টগান, ৩ রাউন্ড গুলি, দুটি ভোজালি ও একটি কাঠের শর্টগান পাই। তারা ডাকাত ছিল, আমরা তাদের আটক করি। অস্ত্র-গুলি, ভোজালি কেড়ে নিই।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তারা আমাদের বিরোধিতা করত। আমি ও দলীয় লোকজন ওই তিনজনকে বেঁধে ফেলে কুষ্টিয়া থানার বিষ্ণুদিয়ায় আনি। কুমার নদীর চরে আমার নির্দেশে আমার দলীয় মিজান ওরফে মন্টু তার বন্দুক দিয়ে গুলি করে আলফাজকে হত্যা করে। শামসুর বন্দুক দিয়ে গুলি করে কাইয়ুমকে এবং ফখরুল গুলি করে হোসেনকে হত্যা করে। অতঃপর ৩টি লাশ নদীর চরে ফেলে নদী পার হয়ে কুষ্টিয়া চলে যাই।'[১৪৩]

ওপরে উদ্ধৃত বিবরণাদিতে দেখা যায়, কীভাবে বাংলাদেশে বামপন্থি সন্ত্রাস বিস্তৃতি লাভ করল। একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামে বামপন্থিদের একাংশের ভূমিকা কী ছিল। তারা শ্রেণিশত্রু খতমের নামে কী কী কর্মকাণ্ড করেছে, কীভাবে থানায় আক্রমণ ও পুলিশ হত্যা করে অস্ত্র লুট করেছে তার বিবরণ। অন্যদিকে গণবাহিনীর উত্থান ও সন্ত্রাস, তাদের অস্ত্র তৈরি ও ব্যবহারের নতুন একটি অধ্যায় রচিত হতে দেখা গেছে। তারা সেনাবাহিনীতে গণহত্যা চালিয়েছে, ভারতীয় হাইকমিশনে হামলা করে রাষ্ট্রদ্রোহী কর্মকাণ্ড করেছে। এসবই ছিল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের তথাকথিত 'গৌরবময় অধ্যায়।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পঞ্চম অধ্যায়

@PDF বইয়ের সমাহার

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ও গণবাহিনীর উত্থান

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য হলো উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটানো এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানা স্থাপন করা। এর ফলে পুঁজিবাদ এবং উৎপাদন নিয়ে প্রতিযোগিতা ও শোষণের অবসান ঘটবে। একই সঙ্গে তারা সর্বহারার একনায়কত্ব তথা শ্রেণিহীন, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করার কথাও বলেন।

১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর 'সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা'র লক্ষ্য নিয়ে জন্ম নেয় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল নামে একটি রাজনৈতিক দল। দলটি 'জাসদ'[১৪৪] নামে পরিচিতি পায়। জন্মলগ্নেই জাসদ শ্রেণিসংগ্রামের মাধ্যমে সরকার উৎখাতের ঘোষণা দেয়। দলের নেতারা বলতেন, জাসদ হলো

---

[১৪৪] ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর সকালে এক সভায় 'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)' নামে নতুন একটা রাজনৈতিক দল গঠনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন সিরাজুল আলম খান, কাজী আরেফ আহমেদ, মেজর জলিল, আ স ম রব, মনিরুল ইসলাম, শাজাহান সিরাজ, বিধানকৃষ্ণ সেন, নূরে আলম জিকু, মোশাররফ হোসেন, খন্দকার আবদুল মালেক, সুলতানউদ্দিন আহমদ, এম এ আউয়াল, রহমত আলী, শরীফ নুরুল আম্বিয়া ও হাসানুল হক ইনু। সাত সদস্যের একটা আহ্বায়ক কমিটি তৈরি করা হয়। জলিল ও রব যুগ্ম আহ্বায়ক মনোনীত হন। আহ্বায়ক কমিটির অন্য পাঁচজন সদস্য ছিলেন শাজাহান সিরাজ, বিধানকৃষ্ণ সেন, সুলতানউদ্দিন আহমদ, নূরে আলম জিকু ও রহমত আলী। দলের লক্ষ্য ও কর্মসূচি সম্পর্কে বলা হয় : বিপ্লবী চেতনার অধিকারী বাঙালি জাতির জীবনে কৃষক, শ্রমিক ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের মধ্য থেকে গড়ে ওঠা সঠিক নেতৃত্বের মাধ্যমেই কেবল একটি সফল সামাজিক বিপ্লব সংগঠন ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দ্বারাই সেই ইপ্সিত শ্রেণিহীন, শোষণহীন সমাজ ও কৃষক-শ্রমিকের রাজ কায়েম করা যেতে পারে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একটি সমাজতান্ত্রিক গণসংগঠন। চর্চা ও প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তারা শিগগিরই একট বিপ্লবী পার্টি গড়ে তুলবেন।[১৪৫]

ড. মর্তুজা খালেদ উল্লেখ করেন—

'সদ্যস্বাধীন মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে শ্রেণি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯৭২ সালের শেষের দিকে। এ দল গঠনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকের ছাত্র আন্দোলনের জাতীয়তাবাদী ধারার নেতৃবৃন্দ। যাঁদের মধ্যে ছিলেন সিরাজুল আলম খান, কাজী আরেফ আহমেদ, আ স ম আবদুর রব, শাজাহান সিরাজ, সুলতানউদ্দিন আহমদ, নূরে আলম জিকু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। তাঁরা ১৯৭২ সালের এপ্রিলে গোপন বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম বিরোধী দল ছিল এই জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল বা জাসদ। আত্মপ্রকাশ করামাত্র জাসদ হয়ে উঠেছিল তারুণ্য, উদ্দামতা ও প্রগতিশীলতার প্রতীক। এ দলে যোগ দিয়েছিল বাম মতাদর্শে বিশ্বাসী অজস্র তরুণ। ব্যাপক সাড়া জাগায় এ দল জন্ম থেকেই হঠকারী রাজনৈতিক ধারা অনুসরণ করে ও সরকারের সাথে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। জাসদ রাজনীতির সংস্পর্শে এসে বাংলাদেশের হাজার হাজার তরুণ জীবন বিসর্জন দেয়।'[১৪৬]

শ্রেণিদ্বন্দ্ব অবসানের জন্য শ্রেণিসংগ্রাম তীব্রতর করে সামাজিক বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার জন্য পরিস্থিতি ও পরিবেশগত কারণে 'সহায়ক শক্তি' হিসেবে রাজনৈতিক গণসংগঠনের যে ঐতিহাসিক প্রয়োজন, তা উপলব্ধি করেই এবং বাংলাদেশের লাখ লাখ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অনুমতি লাভ করে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল বাংলাদেশের শোষিত, বঞ্চিত কৃষক-শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীদের নিজস্ব সংগঠন হিসেবে জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করছে এবং এই জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল শোষকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এক জনযুদ্ধ ঘোষণা করছে। জাসদের অন্যতম আদর্শ নির্ধারণ করা হয় :
১. বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রেণিহীন-শোষণহীন সমাজ ও কৃষক-শ্রমিকরাজ কায়েম। ২. বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সফল সামাজিক বিপ্লব সংগঠনে সকল প্রকার সহায়তা দান। ৩. সমাজতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থাকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হিসেবে গণ্য করা। দ্র. মহিউদ্দিন আহমদ : *জাসদের উত্থান-পতন : অস্থির সময়ের রাজনীতি*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা; অক্টোবর, ২০১৪, পৃ. ৮৭।

[১৪৫] মহিউদ্দিন আহমদ : *অপারেশন ভারতীয় হাইকমিশন*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা; মার্চ, ২০২১, পৃ. ১১।

[১৪৬] ড. মর্তুজা খালেদ : *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট ও বাম আন্দোলনের বিকাশধারা এবং রাজশাহী জেলা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা; জানুয়ারি, ২০২২, পৃ. ১৫৯।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বাংলাদেশে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ধারণা প্রচার করে মূলত জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ। এই 'তন্ত্র' প্রতিষ্ঠাকল্পে এর অনুসারীরা বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যাপক সশস্ত্র ধারার প্রয়োগ করেন। তাদের তৎপরতার মধ্যে যে সকল বিষয় সক্রিয় দেখা যায়, তার মধ্যে ছিল দেশের সশস্ত্র বাহিনীতে হত্যাকাণ্ড চালানো, থানা-ফাঁড়ি লুট ও পুলিশ হত্যা করা, জনপ্রতিনিধিদের হত্যা করা, বিদেশি দূতাবাসে আক্রমণ ও রাষ্ট্রদূতকে অপহরণের চেষ্টা, নিজস্ব অস্ত্রভান্ডার তৈরি প্রভৃতি।

জাসদ তার 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে গঠন করে 'গণবাহিনী' নামক গোপন সশস্ত্র সংগঠন। এর তৎপরতার খবর ৮০-৯০-এর দশকজুড়ে জনমানসকে রাখতো ভীতসন্ত্রস্ত। গবেষক মহিউদ্দিন আহমদ জানান, ২৭-২৮ জুনের (১৯৭৪) বৈঠকে দলের সামরিক সংগঠন হিসেবে 'বিপ্লবী গণবাহিনী'[১৪৭] তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বলা হয়, দেশের ক্ষমতাসীন শ্রেণি ক্ষমতা টিকিয়ে

---

১৪৭ জাসদের উদ্যোগে ১৯৭৪ সালের ১৭ মার্চের পর বিভিন্ন স্থানে 'সন্ত্রাসবিরোধী স্কোয়াড' গড়ে তোলা হতে থাকে। প্রধানত ছাত্রলীগের সদস্যরাই এসব স্কোয়াডের সদস্য ছিলেন। চুয়াত্তরের জুলাই মাস থেকে কেন্দ্রীয় ফোরামের উদ্যোগে বিভিন্ন জেলায় 'পার্টি ফোরাম' গড়ে তোলা শুরু হয়। 'বিপ্লবী গণবাহিনী'র কর্মকাণ্ডও বিচ্ছিন্নভাবে শুরু হয় এ সময়। বিভিন্ন জেলার পার্টি ফোরাম থেকেই গণবাহিনীর উদ্ভব। মার্কিন লেখক লরেন্স লিফশুলজ অবশ্য দাবি করেছেন, চুয়াত্তরের জুলাই মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে গণবাহিনী প্রতিষ্ঠা করা হয়। গণবাহিনীর একটা সাংগঠনিক কাঠামো দাঁড় করানো হয়। রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি মো. শাজাহানকে গণবাহিনীর 'সুপ্রিম কমান্ডার' নিয়োগ করা হয়। তাঁর পদবি হয় 'রাজনৈতিক কমিসার'। সাংগঠনিক কাঠামোটি গড়ে তোলা হয় অনেকটা সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি ও তার নিয়ন্ত্রণাধীন লাল ফৌজের আদলে। লে. কর্নেল (অব.) আবু তাহেরকে গণবাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার এবং জাতীয় কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক হাসানুল হক ইনুকে ডেপুটি কমান্ডার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। বাংলাদেশকে চারটি অঞ্চলে ভাগ করে প্রতিটি অঞ্চলের জন্য একজন রাজনৈতিক কমিসার ও কমান্ডার মনোনীত করা হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের (খুলনা বিভাগ) রাজনৈতিক কমিসার হলেন শরীফ নুরুল আম্বিয়া এবং কমান্ডার হলেন কামরুজ্জামান টুকু। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের (রাজশাহী বিভাগ) রাজনৈতিক কমিসার ও কমান্ডার ছিলেন যথাক্রমে মনিরুল ইসলাম এবং এ বি এম শাহজাহান। মধ্যাঞ্চলের দায়িত্ব হাসানুল হক ইনুর হাতেই থাকে। অবশ্য পূর্বাঞ্চলে (সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম অঞ্চল) কাজী আরেফ আহমেদকে রাজনৈতিক কমিসার করা হলেও কাউকে কমান্ডার মনোনীত করা হয়নি। এই অঞ্চলে গণবাহিনীর সংগঠনগুলো এবং তাদের কার্যক্রম শুরু হয় দেরিতে এবং তারা ছিল তুলনামূলকভাবে দুর্বল। বিপ্লবী গণবাহিনীর একটি ১০ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমান্ড ছিল, যার মধ্যে ছিলেন কাজী আরেফ আহমেদ, মো. শাজাহান, মনিরুল ইসলাম, লে. কর্নেল এম এ তাহের, হাসানুল হক ইনু, শরীফ নুরুল আম্বিয়া, কামরুজ্জামান টুকু এবং এ বি এম শাহজাহান। দ্র. মহিউদ্দিন আহমদ : জাসদের উত্থান-পতন : অস্থির সময়ের রাজনীতি, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা; অক্টোবর, ২০১৪, পৃ. ১৩৫

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাখার জন্য সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আঁতাঁত করে জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমন ও নির্মূল করতে চায়। রাজনৈতিক আন্দোলন ও শ্রেণিসংগ্রাম করার জন্য চাই শোষিত শ্রেণিগুলোর সশস্ত্র বাহিনী। তাদেরকে হতে হবে একটি সামরিক পার্টি। কেবল শক্তি প্রয়োগ করেই সমস্যার সমাধান সম্ভব। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে যুদ্ধ অনিবার্য ও অপরিহার্য। বিরোধ মীমাংসার সর্বোচ্চ রূপ হচ্ছে যুদ্ধ। শোষিত শ্রেণির এই বাহিনী হচ্ছে বিপ্লবী গণবাহিনী। গণবাহিনী হচ্ছে শোষিত শ্রেণিসমূহের রাজনৈতিক আন্দোলন ও শ্রেণিসংগ্রামের হাতিয়ার, গণবিপ্লবের বাহক। গণবাহিনী হচ্ছে সর্বহারার রাজনৈতিক পার্টির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, এটি গড়ে ওঠে জনগণের সামগ্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।[১৪৮]

মহিউদ্দিন আহমদ প্রদত্ত বিবরণে আরও জানা যায়, জাসদ গোপনে সামরিক সংগঠন তৈরি করেছিল আওয়ামী লীগ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য। এ ব্যাপারে দলটির রাখঢাক ছিল না। দলের প্রকাশিত একটি দলিলে বলা হয়, 'শেখ মুজিবের নির্যাতন, গেস্টাপো বা ও রক্ষীবাহিনী ইত্যাদির মোকাবিলার জন্য এবং যেকোনো প্রকার বিদেশি শক্তির হামলা প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে, শ্রমিক এলাকায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ও মুক্তিযোদ্ধাদের সমবায়ে গড়ে ওঠে 'বিপ্লবী গণবাহিনী'। শুধু সেখানেই শেষ না। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সিপাহিদের মধ্যেও অতি গোপনে ও সতর্কতার সঙ্গে সাংগঠনিক কাজ চালানো হয়। ধীরে ধীরে প্রতিটি সেনানিবাসে গড়ে ওঠে স্থল, বিমান ও নৌবাহিনী, বিডিআর ও পুলিশের মধ্যে 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা'। সিপাহিরা তো সাধারণ শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তেরই সন্তান। জাসদের মধ্য দিয়ে যে গণবাহিনী তৈরি হয়েছিল, তার কমান্ড কাঠামোয় গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে ছিলেন হাসানুল হক ইনু।[১৪৯]

বাংলার বাণী পত্রিকাকে উদ্ধৃত করে মহিউদ্দিন আহমদ উল্লেখ করেন—

> 'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের আবরণে দুটি রাজনৈতিক সংগঠন পাশাপাশি ও সমান্তরাল ধারায় কাজ করে যাচ্ছিল। একটি ধারার নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন সাবেক ছাত্রনেতা সিরাজুল আলম খান। বিক্ষিপ্তভাবে সশস্ত্র আক্রমণ পরিচালনা করে সরকারকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলার স্ট্রাটেজি নিয়ে এই গ্রুপটি কাজ করে। ...সংসদের নির্বাচনের পর দলের এই গ্রুপটি সিদ্ধান্ত নেন, গোপন ক্যাডার সংগঠন গড়ে তুলতে হবে

---

[১৪৮] মহিউদ্দিন আহমদ : *অপারেশন ভারতীয় হাইকমিশন*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা: মার্চ, ২০২১, পৃ. ১৩।

[১৪৯] মহিউদ্দিন আহমদ : *প্রতিনায়ক সিরাজুল আলম খান*, প্রথমা, ঢাকা: মার্চ, ২০২১, পৃ. ৩১৮

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এবং দেশের বাস্তবতাকে নিজেদের স্বপক্ষে টেনে এনে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করতে হবে। এমনকি এদের একাংশ সম্পূর্ণ জাসদ দলটিকে একটি গুপ্ত সংগঠন হিসেবে ঢেলে সাজানোর প্রস্তাব রাখেন। তাদের এই নতুন রাজনৈতিক তৎপরতার স্বপক্ষে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা লাভের জন্য সিরাজুল আলম খান[১৫০] ভারতে যান। এক খবরে জানা যায়, তিনি কলকাতায় সফররত ট্রটস্কিপন্থি পাকিস্তানের জনাব তারিক আলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তার সাহায্য চান। জাসদ নেতারা বলতেন, একটি মূল শক্তি অচিরেই গড়ে উঠবে, যার নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হবে।'[১৫১]

---

১৫০ সিরাজুল আলম খান বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত সাবেক ছাত্রনেতা ও রাজনীতিবিদ। তিনি বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে ১৯৬২ সনে গোপন সংগঠন 'নিউক্লিয়াস' গঠন করেন। নিউক্লিয়াস 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' নামেও পরিচিত। এ ছাড়াও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ গঠন এবং '৭ নভেম্বর, ১৯৭৫'-এর নেপথ্য পরিকল্পনাকারী ছিলেন সিরাজুল আলম খান। সিরাজুল আলম খানের জন্ম নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার আলীপুর গ্রামে, ১৯৪১ সালের ৬ জানুয়ারি; মৃত্যু : ৯ জুন, ২০২৩। তার বাবা খোরশেদ আলম খান ছিলেন স্কুল পরিদর্শক। মা সৈয়দা জাকিয়া খাতুন, গৃহিণী। ছয় ভাই ও তিন বোনের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। স্থানীয় স্কুলে কিছুদিন লেখাপড়া করে চলে যান বাবার কর্মস্থল খুলনায়।

১৯৫৬ সালে খুলনা জিলা স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে এসএসসি পাস করেন। তারপর ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৫৮ সালে এইচএসসি পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত বিভাগে সম্মান শ্রেণিতে ভর্তি হন। থাকতেন ফজলুল হক হলে। গণিতে স্নাতক ডিগ্রি নেওয়ার পর তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয় 'কনভোকেশন মুভমেন্টে' অংশগ্রহণ করার কারণে। প্রতিদিন রাত করে হলে ফিরতেন। ফলে হল থেকেও একবার বহিষ্কৃত হন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করায় তার পক্ষে মাস্টার্স ডিগ্রি নেওয়া সম্ভব হয়নি। ১৯৬১ সালে ছাত্রলীগের সহ-সাধারণ সম্পাদক হন। ১৯৬৩ সালে সিরাজুল আলম খান ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। আন্দোলন, নির্বাচন, সমান্তরাল প্রশাসন এবং ১৯৭১-এর সশস্ত্র সংগ্রামকে হিসাবে নিয়ে বিভিন্ন বাহিনী গড়ে তোলার কৃতিত্ব সিরাজুল আলম খানের। ১৯৭১ সনে স্বাধীনতার পর আন্দোলন-সংগ্রামের রূপ ও চরিত্র বদলে যায়। গড়ে ওঠে একমাত্র বিরোধী দল জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরে অনুষ্ঠিত 'অভ্যুত্থান' বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসে এক ঘটনা। জাসদ গঠন এবং 'অভ্যুত্থান'-এর নেপথ্য পরিকল্পনাকারী ছিলেন সিরাজুল আলম খান। আর এই দুটি বৃহৎ ঘটনার নায়ক ছিলেন মেজর জলিল, আ স ম আবদুর রব এবং লেফটেন্যান্ট কর্নেল আবু তাহের।

দ্র. সিরাজুল আলম খান রহস্য : একটি রাজনৈতিক বিতর্ক, পরিবর্তন.কম এবং *বাংলাদেশ প্রতিদিন* অবলম্বনে bn.wikipedia.org/wiki/সিরাজুল আলম খান।

১৫১ মহিউদ্দিন আহমদ : *প্রতিনায়ক সিরাজুল আলম খান*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা; মার্চ, ২০২১, পৃ. ৩০৬।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গণবাহিনীর সন্ত্রাস

জাসদের সশস্ত্র লড়াইয়ের বিষয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক মোহাঃ রোকনুজ্জামান উল্লেখ করেন, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসের পর থেকে সশস্ত্র সংগ্রামের পথে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ধারা অনুসরণ শুরু করে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসা ঘেরাও ও সহিংস ঘটনার পর তাদের রাজনৈতিক লাইন পরিবর্তন করে। এতদিন পর্যন্ত জাসদ অনুসরণ করে আসছিল সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি। ১৯৭৪ সালের মার্চের পর থেকে তারা সশস্ত্র সংগ্রামের পথে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার ধারা অনুসরণ করে এ উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে গণবাহিনী গঠন করে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে সরকার উৎখাত করে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হয়।

১৯৭৩ সালের নির্বাচনের পরই জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের কর্মকাণ্ডে রাজনৈতিক লাইন পরিবর্তন করার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল। ১৯৭৩ সালের নির্বাচনের ফলাফল জাসদ নেতৃবৃন্দকে হতাশ করে। নির্বাচনে তারা বিপুল বিজয় আশা করেছিল। ফলাফল জাসদ নেতা-কর্মীদের ভীষণভাবে হতাশ করেছিল। তারা উপলব্ধি করেছিল সংসদীয় রাজনীতির ধারা অনুসরণ করে ভোটের মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে পরাজিত করা যাবে না। দ্বিতীয়ত, জাসদের নেতাসহ কর্মীবাহিনীর সদস্যরা সবাই ছিল তরুণ। তারুণ্যের দল হিসেবে পরিচিত জাসদ কর্মী ও নেতারা সংসদীয় গণতন্ত্রের সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে সুদূর ভবিষ্যতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার নীতিতে আস্থাশীল ছিল না, এরা সবাই চাইত দ্রুত পরিবর্তন এবং সে পরিবর্তন কেবল সম্ভব ছিল অসাংবিধানিকভাবে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে। এ জাসদ বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংসদীয় গণতন্ত্রের যে রীতি অনুসরণ করছিল, তার স্বীকৃতি মার্কসবাদে ছিল না। মার্কসবাদ অনুযায়ী সর্বহারা শ্রেণির শক্তি প্রয়োগ করে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে। তখন পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রে সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্তও ছিল না। সুতরাং মার্কসবাদের অপ্রথাগত এ পথ বর্জন করা জাসদ নেতৃবৃন্দের পক্ষে অস্বাভাবিক ছিল না। এ সকল কারণে জাসদ তার রাজনৈতিক লাইন পরিবর্তন করে সশস্ত্র যুদ্ধ করার পথে অগ্রসর হয়। আর এ যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য জাসদ নেতৃবৃন্দ গঠন করে গণবাহিনী। এ ছাড়া যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে গঠন করা হয়েছিল আধা সামরিক রক্ষীবাহিনী। এ বাহিনী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডসহ জাসদের কর্মীদের দমনে অত্যন্ত তৎপর ছিল। রক্ষীবাহিনীর নির্যাতন তরুণ জাসদ কর্মীদের উৎসাহিত করেছিল পালটা ব্যবস্থা হিসেবে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। যুদ্ধপরবর্তী বাংলাদেশে সামরিক অস্ত্রের সহজলভ্যতাও জাসদকে উৎসাহিত করেছিল সশস্ত্র সংগ্রামের লাইন অনুসরণ করতে।[১৫২]

রোকনুজ্জামান আরও উল্লেখ করেন—

> '১৯৭৫ সালের শুরুতে জাসদ গণবাহিনী গঠন করে। গণবাহিনী পরিকল্পিত ও মার্কসীয় মতাদর্শে দীক্ষিত সুপরিকল্পিত কোনো বাহিনী ছিল না। গণবাহিনীর কার্যক্রম সুশৃঙ্খলও ছিল না।...তবে কাজ শুরু করার পর জাসদ কর্মীগণ গণবাহিনী সদস্যদের মার্কসবাদী তাত্ত্বিক আদর্শে দীক্ষিত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রগতিশীল তরুণদের বিক্ষোভকে পুঁজি করে অল্প দিনেই গণবাহিনী একটি শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয়। এ বাহিনী দেশের অভ্যন্তরে পরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে থাকে।
>
> গণবাহিনীকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। বেসামরিক গণবাহিনী, অর্থাৎ সাধারণ জনগণ নিয়ে গঠিত যে গণবাহিনী, তা-ই বেসামরিক গণবাহিনী। এই অংশের নেতার দায়িত্ব পালন করেন হাসানুল হক ইনু। দ্বিতীয়ত, বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা, যা মূলত কর্মরত এবং অবসরপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর সদস্যকে এই সংস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এ অংশের নেতৃত্ব প্রদান করেন কর্নেল তাহের। তার নেতৃত্বে ১৯৭৫ সালের জাসদের ৭ নভেম্বরের সশস্ত্র বিপ্লব সম্পন্ন হয়।'[১৫৩]

---

[১৫২] মোহা ঃ রোকনুজ্জামান : *জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ও বাংলাদেশের রাজনীতি*, মীরা প্রকাশন, ঢাকা; ফেব্রুয়ারি, ২০১০, পৃ. ৬৩।

[১৫৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১১ এমপিকে হত্যা

মহাজোট সরকারের শরিক দল জাসদের অঙ্গসংগঠন গণবাহিনীসহ সশস্ত্র বামপন্থিরা ১৯৭২-৭৫ সালে আওয়ামী লীগের ১০ জন এমপিকে হত্যা করে। এ সময় এরাসহ আরও বহু নেতা-কর্মীকে হত্যা করে গণবাহিনীর সদস্যরা। রক্ষীবাহিনীর তৎকালীন সহকারী পরিচালক এবং এই বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম আনোয়ার উল আলম তাঁর *রক্ষীবাহিনীর সত্য-মিথ্যা* নামক গ্রন্থে আওয়ামী এমপিদের এই হত্যাকাণ্ডের বিবরণ প্রদান করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন, এসব হত্যাকাণ্ডের পেছনে সমাজের দুষ্কৃতিকারী, চরম বামপন্থি, নকশাল বাহিনী, সর্বহারা ও জাসদের গণবাহিনীর হাত ছিল। তিনি জানান, জনগণের নির্বাচিত স্থানীয় নেতারা ছাড়াও অনেক নির্বাচিত এমপি তাদের হাতে নিহত হন :

- ৬ জুন, ১৯৭২ আবদুল গফুর এমপি নিহত হন। তাঁর সঙ্গের কামাল ও রিয়াজ নামের দুজনও নিহত হন।
- ৩ জানুয়ারি, ১৯৭৩ নিহত হন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে মঠবাড়িয়া থেকে নির্বাচিত এমপি সওগাতুল আলম সগির।
- ৩০ মে, ১৯৭৩ নিহত হন ১৯৭০-এ পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য হিসেবে নড়িয়া থেকে নির্বাচিত নুরুল হক।
- ১০ জানুয়ারি, ১৯৭৪ নিহত হন ১৯৭০-এ ভোলা থেকে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্য মোতাহার উদ্দিন আহমদ।
- ১৬ মার্চ, ১৯৭৪ নরসিংদীর মনোহরদী এলাকা থেকে নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য গাজী ফজলুর রহমান নিহত হন।
- ১ আগস্ট, ১৯৭৪ ময়মনসিংহ আ'লীগের কোষাধ্যক্ষ ও সংসদ সদস্য ইমান আলী নিহত হন।
- ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৭৪ কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ঈদের নামাজ পড়ার সময় নিহত হন ১৯৭০ সালে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত গোলাম কিবরিয়া।
- ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫ নেত্রকোণার এমপি আবুল খালেক নিহত হন।
- এ ছাড়া সংসদ সদস্য আবদুল মুকিম, আমিন উদ্দিনসহ (ফরিদপুর) আওয়ামী লীগের আরও অনেক নেতা-কর্মী বিভিন্ন সময়ে নিহত হন।[১৫৪]

---

[১৫৪] আনোয়ার উল আলম : *রক্ষীবাহিনীর সত্য-মিথ্যা*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা: অক্টোবর, ২০১৩, পৃ. ২১০।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

- গবেষক আলতাফ পারভেজ প্রদত্ত বিবরণে জানা যায়, গণবাহিনী গঠনের পর কুষ্টিয়ায় ইপিসিপি-এমএল'র একটি দুর্ধর্ষ গ্রুপ (লাল্টু-মন্টু নামের দুই ভাইয়ের নেতৃত্বে) জাসদে যোগ দেওয়ায় তাদের সামরিক শাখার অভিযান ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায় এবং পুরো অঞ্চলজুড়ে খুনোখুনিও বাড়ে তাতে। ১৯৭৫ সালের শুরুতে মেহেরপুরে সরকারি কোষাগারে থাকা অস্ত্র লুট করে গণবাহিনীর এই ক্যাডাররা। পুলিশ তখন উল্লেখযোগ্য কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি বা করেনি। তবে সেই অভিযানে মন্টু মারা যাওয়ায় এবং কিছুদিন পর (১৯৭৫ সালের ১১ মে) রক্ষীবাহিনীর হাতে শামসুল হাদি, মুসা, উম্মত আলী প্রমুখ কুষ্টিয়াকেন্দ্রিক গুরুত্বপূর্ণ সংগঠকদের প্রায় ১০-১১ জন একই সঙ্গে খুন হওয়ায় অত্র এলাকায় গণবাহিনীর অভিযানের তীব্রতা ধীরে ধীরে কমে আসে। দৌলতপুর ও আমলার সীমান্ত এলাকায় ছাতারপাড়া নামের গ্রামে সংগঠিত সম্মুখযুদ্ধের এই বিপর্যয়ে গণবাহিনীর স্থানীয় প্রথম সারির সামরিক সংগঠকদের অনেকেই নিহত হন।[১৫৫]

আলতাফ পারভেজ উল্লেখ করেন, সৈনিক সংস্থার (জাসদের বিপ্লবী সংগঠন) কিছু সংগঠক নভেম্বর বিপ্লব (৭ নভেম্বর ১৯৭৫) ব্যর্থ হওয়ার পর আর সেনানিবাসে ফেরত যাননি। এরা পরে গণবাহিনীর সঙ্গে বেসামরিক জনপদে কাজে যুক্ত হন। কেউ কেউ আবার জনবিচ্ছিন্ন সশস্ত্র তৎপরতা চালাতেও শুরু করেন। এক্ষেত্রে সবচেয়ে আলোচিত ঘটনার জন্ম দেন মেজর জিয়াউদ্দিন। নভেম্বর বিপ্লবে আবু তাহেরের পর তিনিই ছিলেন সংশ্লিষ্ট দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সেনা কর্মকর্তা। অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় সপ্তাহে তিনি ২০-২৫ জন সেনাসদস্যকে নিয়ে ঢাকা থেকে একটি দোতলা লঞ্চ হাইজ্যাক করে প্রথমে শরণখোলা ও পরে গভীর সুন্দরবনে ঢুকে পড়েন। শরণখোলায় তাঁরা পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের বেঁধে থানা থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র এবং স্থানীয় সরকারি খাদ্যগুদাম থেকে বিপুল খাদ্যশস্য লুট করে নিয়ে যান। আশপাশের অঞ্চলের গণবাহিনীর বেসামরিক যোদ্ধারাও এ পর্যায়ে বনের ভেতরে গিয়ে জিয়াউদ্দিন ও সহযোগীদের সঙ্গে যোগ দেন। ১৯৭৫ সালের ৪ ডিসেম্বর সমগ্র খুলনা অঞ্চলের পুলিশ প্রশাসন ও নৌবাহিনী মিলিত অভিযান চালিয়ে দীর্ঘ কয়েক সপ্তাহের চোরাগোপ্তা যুদ্ধ শেষে ২ জানুয়ারি (১৯৭৬) জিয়াউদ্দিনকে আটক করতে সমর্থ হয়।[১৫৬]

---

[১৫৫] আলতাফ পারভেজ : *মুজিব বাহিনী থেকে গণবাহিনী-ইতিহাসের পুনর্পাঠ*, ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা: ফেব্রুয়ারি, ২০১৫, পৃ. ৩৬১ (টীকা)।

[১৫৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬১।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আলতাফ পারভেজের বিবরণে আরও জানা যায়, ১৯৭৫ সালের ১৭ মার্চ মধ্যরাতে মেহেরপুরের ট্রেজারি লুটের ঘটনাটি দেশব্যাপী গণবাহিনীর সবচেয়ে বড়ো সামরিক 'সাফল্য' হিসেবে চিত্রিত করা হয়। এই অপারেশনে প্রায় ৮০ জন ক্যাডার অংশ নিয়েছিল। তাদেরই একজন আনোয়ারুল ইসলাম বাবু জানিয়েছেন, অভিযানের আগে স্থানীয় ওই ক্যাডারদের ১৯টি অস্ত্র ছিল; অপারেশনের সময় তারা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ৭৫টি অস্ত্র নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। এ সময় কেন্দ্রীয় গণবাহিনীর এক মূল্যায়নে অস্ত্র সামর্থ্যে বগুড়া ও মানিকগঞ্জের পরই চুয়াডাঙ্গা তৃতীয় অবস্থানে চলে আসে। মেহেরপুর ট্রেজারি থেকে পাওয়া অস্ত্রের এক অংশ ঝিনাইদহে পাঠানো হয় সেখানকার গণবাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য। তবে পরিকল্পনা ছিল অস্ত্রের বড়ো অংশ কুষ্টিয়ায় পাঠানো হবে সেখানকার কারাগারে অভিযান চালানোর জন্য। মন্টুর স্ত্রী আলেয়া ছিলেন তখন কুষ্টিয়া কারাগারে। জীবিত অবস্থায় স্ত্রীকে কারাগার থেকে বের করে আনতে পাগলপ্রায় হয়ে উঠেছিলেন মন্টু। কেবল এ কারণেই সেখানে গণবাহিনীর ব্যানারে প্রচুর অপারেশন হয়েছে; যদিও 'বিপ্লবী জনযুদ্ধে'র অংশ হিসেবেই তা দেশব্যাপী মূল্যায়িত হয়ে চলেছিল। মেহেরপুর ট্রেজারি থেকে কারাগারে অভিযান চালানোর মতো অস্ত্র পাওয়া গেলেও পরিকল্পিত অপারেশনটি আর হয়ে ওঠেনি। কারণ, ট্রেজারি অপারেশনে যে দুজন গেরিলা নিহত হয়, তাদের মধ্যে দলনেতা মন্টুও ছিলেন। মন্টুর মৃত্যুর কিছুদিন পর আটক হন সুলতান রাজাও (এপ্রিল, ১৯৭৫)। এই দুই ঘটনা স্থানীয় গণবাহিনীর মনোবল ভেঙে দেয়। অনেকে গোপনে বাহিনী ছেড়ে পালাতেও শুরু করে।[১৫৭]

পঁচাত্তরের জানুয়ারিতে সদর থানার (দামুড়হুদার নিকটবর্তী) 'উক্ত' নামক গ্রামে এক অপারেশনে গিয়ে গণবাহিনীর হাতে সাতজন পুলিশ মারা যান। এর পর থেকে পুলিশ ও রক্ষীদের মাঝে ব্যাপক আতঙ্ক তৈরি হয়। জাসদের অভিযোগ ছিল, এই অপারেশনে পুলিশকে উৎসাহিত করেছিলেন তাদের তখনকার প্রতিপক্ষ ডা. হেবা। কিন্তু নিজেদের ব্যাপক জীবনহানির ফলে এরপর পুলিশ গণবাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ অনেক কমিয়ে দেয়। এ পর্যায়ে প্রতিপক্ষকে মোকাবিলায় প্রশাসন বেশি ব্যবহার করত রক্ষীবাহিনীকে। জেলা সদর থেকে থানা পর্যন্ত রক্ষীদের বিস্তৃতি থাকলেও মন্টুর মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত এখানে রক্ষীদের সফলতার হার ছিল খুব কম। সাত পুলিশ সদস্য খুনের কিছুদিন আগে গণবাহিনী গাংনি থানায়ও এক ব্যর্থ আক্রমণ চালিয়েছিল।[১৫৮]

---

[১৫৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৯।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঘরে বসে টাইম বোমা তৈরি

বাংলাদেশে ঘরে বসে বোমা তৈরি ও প্রতিপক্ষের ওপর বিস্ফোরণ ঘটানোর প্রথম প্রচলনও করে বামপন্থিরা, বিশেষত জাসদ। মহিউদ্দিন আহমদ জানিয়েছেন, পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবেন— এ রকম একটি কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছিল। এ উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ধোয়ামোছার কাজ চলছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন এমএ দ্বিতীয় পর্বের পরীক্ষা চলছিল। ছাত্র-শিক্ষক সবাই ব্যস্ত। বিপ্লবী গণবাহিনীর ঢাকা নগর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা বেশ তৎপর হয়ে ওঠে। শেখ মুজিবের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন উপলক্ষ্যে একটা শক্তির মহড়া দেওয়ার চিন্তা করা হয়; কিন্তু তেমন কোনো বিক্ষোভ বা মিছিলের পরিকল্পনা করা যায়নি। চুয়াত্তরের নভেম্বরে বোমা বানাতে গিয়ে নিখিল নিহত হয়েছিল। তার নামে ওই বোমার নামকরণ হয় 'নিখিল'। আগেই বলা হয়েছে, 'নিখিল'-এর প্রস্তুতপ্রণালি ছিল খুবই স্থূল। ঢাকা নগর গণবাহিনীর কমান্ডার আনোয়ার হোসেন তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগের লেকচারার। তিনি 'নিখিল' ইমপ্রভাইজ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর শেখ মুজিবের আগমন যাতে নির্বিঘ্ন না হয়, সেজন্য আনোয়ারের নির্দেশে গণবাহিনীর সদস্যরা ১৪ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে তিনটি 'নিখিল' ফাটায়। এগুলো ছিল টাইম বোমা। আনোয়ারের সরবরাহ করা এই বোমাগুলোর একটি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কাছে, একটি সায়েন্স অ্যানেক্স বিল্ডিংয়ের চত্বরে এবং আরেকটি কার্জন হলের সামনে রেখে দিয়েছিলেন গণবাহিনীর সদস্যরা। দুপুর ১১টা থেকে ১২টার মধ্যে এগুলোর বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এর ফলে কিছু হুড়োহুড়ি ও হইচই হয়। তবে এটা ছিল ক্ষণস্থায়ী।[১৫৯]

'নিখিল বোমা'র জন্মকাহিনি : 'নিখিল বোমা'র জন্মকাহিনি প্রসঙ্গে মহিউদ্দিন আহমদ আরও উল্লেখ করেন, ঢাকা নগর গণবাহিনীর অধীনে অনেকগুলো সেক্টর বা ইউনিট ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণবাহিনীর একটি স্বতন্ত্র ইউনিট ছিল। নগর কমান্ডারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে ও নির্দেশে এই ইউনিট কাজ করত। এই ইউনিটের সদস্যরা নগর কমান্ডারের নির্দেশে তারই সরবরাহ করা চারটি বোমা পঁচাত্তরের ১৪ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফাটিয়েছিল। পরদিন চ্যান্সেলর শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে আসবেন— এটা জেনে সবাইকে সন্ত্রস্ত করার লক্ষ্যেই বোমাগুলো ফাটানো হয়েছিল। এটি ছিল বিশেষ ধরনের টাইম বম্ব, যা নগর কমান্ডার নিজেই উদ্ভাবন করেছিলেন।

---

[১৫৯] মহিউদ্দিন আহমদ : *জাসদের উত্থান-পতন : অস্থির সময়ের রাজনীতি*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা; অক্টোবর, ২০১৪, পৃষ্ঠা : ১৭০।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বোমার নাম 'নিখিল'। চুয়াত্তরের নভেম্বরে জাসদের হরতাল উপলক্ষ্যে বোমা বানাতে গিয়ে জাসদের কর্মী নিখিল চন্দ্র সাহা দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন। নিখিল ছিলেন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার। তার নামেই বোমার নামকরণ হয়। ৭ নভেম্বরের পর গণবাহিনীর সদস্যরা 'নিখিল' ব্যবহারের চেষ্টা করেছে অনেক জায়গায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন ছাত্র ওই সময় একটি মোটরবাইকে করে ধানমন্ডির ২ নম্বর সড়ক দিয়ে যাচ্ছিল। তারা দুজনই গণবাহিনীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের সদস্য। একজন বাইক চালাচ্ছিল। পেছনে আরেকজনের হাতে ছিল 'নিখিল' বোমা। ভারতীয় হাইকমিশনের সামনে এসে তারা একটি বোমা চলন্ত বাইক থেকে হাইকমিশনের দেওয়ালের ওপর দিয়ে ছুড়ে মারে। হতে পারে বোমাটি বিস্ফোরিত হয়নি এবং এটিকে গ্রেনেড হিসেবে প্রচার করা হয়েছে।[১৬০]

নিজস্ব অস্ত্রের ভান্ডার

জাসদের ইতিহাসপ্রণেতা মহিউদ্দিন আহমদ আরও জানিয়েছেন, জাসদের গণবাহিনীর একটি কেন্দ্রীয় কমান্ড থাকলেও ঢাকা নগর গণবাহিনী পরিচালিত হতো মূলত (ঢাবি শিক্ষক) আনোয়ার হোসেনের নির্দেশে। তাঁর চিঠি বা চিরকুটের ভিত্তিতে অস্ত্রশস্ত্রের লেনদেন হতো। প্রতিটি ইউনিটের নিজস্ব অস্ত্রের ভান্ডার ছিল। একটা উদাহরণ দিলেই বিষয়টা আরও পরিষ্কার হবে। লালবাগ অঞ্চলে গণবাহিনীর ইউনিটের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ছিল একটি করে স্টেনগান, কাটা রাইফেল, পয়েন্ট থ্রি-এইট রিভলবার, পয়েন্ট টু-টু রিভলবার এবং সেভেন পয়েন্ট সিক্স ফাইব মি.মি পিস্তল। কাটা রাইফেলকে তারা সংক্ষেপে বলতেন ডিএমজি (ডাকাত মারা গান)। অস্ত্রের ভান্ডার ছিল ইসলামবাগে। ভান্ডারের দায়িত্বে ছিলেন হোসেন। তাকে বলা হতো 'কোঁত কমান্ডার'। পুরো ইউনিটে ৩০ জন সদস্য ছিলেন। তারা মাঝেমধ্যে বিডিআরের সদস্যদের কাছ থেকে গুলি সংগ্রহ করতেন। একটু খাতির করে চা-নাশতা খাওয়ালে বিডিআরের 'কোঁত' থেকে তারা ২০-২৫টি গুলি দিতেন। 'কোঁত' থেকে গুলি বিক্রিও হতো।[১৬১]

---

[১৬০] মহিউদ্দিন আহমদ : *অপারেশন ভারতীয় হাইকমিশন*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা: মার্চ, ২০২১, পৃ. ৭৮।

[১৬১] মহিউদ্দিন আহমদ : *জাসদের উত্থান-পতন : অস্থির সময়ের রাজনীতি*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা; অক্টোবর, ২০১৪, পৃ. ১৬১।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সেনাবাহিনীতে গণহত্যা

শুধু বেসামরিক লোকদেরই নয়, রীতিমতো সেনাবাহিনীতেও হত্যাকাণ্ড চালান বামপন্থি অ্যাকটিভিস্টরা। নিহত এ লোকদের 'অপরাধ' ছিল কেবল সেনা অফিসার হওয়া। 'অফিসারের রক্ত চাই' স্লোগান দিয়ে এই হত্যাকাণ্ড ছিল এক নজিরবিহীন ঘটনা। সাবেক সেনা কর্মকর্তা মইনুল হোসেন চৌধুরী তাঁর স্মৃতিচারণে উল্লেখ করেন—

> '৭ নভেম্বর[১৬২] (১৯৭৫) সৈনিকদের সঙ্গে বেসামরিক প্রশাসনের তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণির কিছু সরকারি কর্মচারীও যোগাযোগ করার চেষ্টা করে। তারাও বেসামরিক প্রশাসনে তাদের উর্ধ্বতন অফিসারদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের চেষ্টা করছিল। ফলে কিছু কর্মরত এবং অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক তাদের সঙ্গে সেনানিবাসের বাইরে চলেও গিয়েছিল। কিন্তু সেনানিবাসের পরিস্থিতি আয়ত্তে আসায় পরে বাইরে তারা আর তেমন কোনো উচ্ছৃঙ্খলতা করার সাহস পায়নি। আজও ভাবলে গা শিউরে ওঠে যে,

---

১৬২ বাংলাদেশে ৭ নভেম্বর তারিখটিকে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস (একটি অংশ মুক্তিযোদ্ধা সৈনিক হত্যা দিবস) হিসেবে পালন করা হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড এবং ৩ নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে জাতীয় চার নেতাকে হত্যার ঘটনার ধারাবাহিকতায় ওই দিনই সেনাবাহিনীর উপপ্রধান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খালেদ মোশাররফ তার অনুসারী সেনা সদস্যদের নিয়ে এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে বন্দি করেন। স্বঘোষিত পদোন্নতি নিয়ে খালেদ মোশাররফ মেজর জেনারেলের ব্যাজ ধারণ এবং সেনাপ্রধানের পদ দখল করেন।

৬ নভেম্বর খালেদ মোশাররফ বঙ্গভবনে গিয়ে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদকে গ্রেফতার করে মন্ত্রিসভা বাতিল ও জাতীয় সংসদ ভেঙে দেওয়ার ঘোষণা দেন। একই দিনে তিনি প্রধান বিচারপতি আবু সা'দাত মোহাম্মদ সায়েমকে দেশের প্রেসিডেন্টের পদে বসান। একপর্যায়ে ৬ নভেম্বর গভীর রাতে সেনাবাহিনীর সাধারণ সিপাহিরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। সেই অভ্যুত্থানে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন দিয়ে সর্বস্তরের জনতা রাজপথে নেমে আসে। সিপাহি-জনতার মিলিত সেই বিপ্লবে বন্দি অবস্থা থেকে মুক্ত হন জিয়াউর রহমান। পালটা অভ্যুত্থান ঠেকাতে গিয়ে প্রাণ হারান খালেদ মোশাররফ ও তার কিছু অনুসারী। পরদিন ৭ নভেম্বর সর্বস্তরের সৈনিক ও জনতা সম্মিলিতভাবে নেমে আসে ঢাকার রাস্তায়, ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। অভূতপূর্ব এক সংহতির নজির সৃষ্টি হয় দেশের রাজনীতিতে। তার পর থেকেই ৭ নভেম্বর পালিত হচ্ছে 'জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস' হিসেবে। বিএনপি সরকারের আমলে এ দিনটিতে ছিল সরকারি ছুটি। দ্র. দৈনিক *নয়া দিগন্ত*, ঢাকা; ৭ নভেম্বও, ২০২২।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঢাকা সেনানিবাসের সৈনিকদের যদি সেদিন নিয়ন্ত্রণে আনা না যেত, তাহলে সারা দেশে সামরিক-বেসামরিক পর্যায়ে একটা নেতৃত্বহীন ভয়াবহ উচ্ছৃঙ্খল শ্রেণিসংগ্রাম শুরু হয়ে যেত। সৈনিকদের সেদিনের স্লোগানই ছিল "সিপাহি সিপাহি ভাই ভাই, অফিসারের রক্ত চাই। সিপাহি-জনতা ভাই ভাই, অফিসারদের রক্ত চাই।"[১৬৩]

আরেকজন সাবেক সেনা কর্মকর্তা এমএ হামিদ পিএসসি'র বিবরণে বলা হয়–

'৭/৮ নভেম্বরের (১৯৭৫) ওই বিভীষিকাময় রাতে গভীর অন্ধকারে উন্মাদ সৈনিকরা অফিসারদের রক্তের নেশায় পাগল হয়ে উঠল। ঘটে গেল বেশ কয়েকটি হত্যাকাণ্ড। বহু বাসায় হামলা হলো। অনেকে বাসায় ছিলেন না। অনেকে পালিয়ে বাঁচল। সৈনিকরা মেজর করিম, মিসেস মুজিব, মিসেস ওসমানকে গুলি করে হত্যা করল, মেজর আজিম ও মুজিব চট্টগ্রামে যাচ্ছিলেন। বিপ্লবী সৈনিকরা তাদের এয়ারপোর্টে পাকড়াও করে। আজিমকে গুলি করে হত্যা করে। মেজর মুজিব প্রাণ নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়।

অর্ডিন্যান্স অফিসার মেসে সৈনিকরা হামলা করে তিনজন তরুণ অফিসারকে গুলি করে হত্যা করে। এদের মধ্যে ছিলেন মেজর মহিউদ্দিন; যিনি শেখ সাহেবের লাশ টুঙ্গিপাড়ায় নিয়ে দাফন করেন। সৈনিকরা বনানীতে কর্নেল ওসমানের বাসায় আক্রমণ করে। ওসমান পালিয়ে যান, তারা মিসেস ওসমানকে গুলি করে হত্যা করে। হকি খেলতে এসেছিল দুজন তরুণ লেফটেন্যান্ট। তাদের স্টেডিয়ামের পাশে গুলি করে হত্যা করা হয়। অর্ডিন্যান্স স্টেটে দশজন অফিসারকে এক লাইনে দাঁড় করানো হয় মারার জন্য। প্রথমজন এক তরুণ ই.এম.ই. ক্যাপ্টেন। তার পেটে গুলি করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। বাকিরা অনুনয়বিনয় করলে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। বেঁচে গেল তারা অপ্রত্যাশিতভাবে। একজন টেলিভিশনের অফিসার মুনিরুজ্জামান। বঙ্গভবনে খালেদের সময় খুবই অ্যাকটিভ ছিলেন। তাকে ধরে গুলি করা হয়। তিন দিন পর তার লাশ পাওয়া যায় মতিঝিল কলোনির ডোবায়। সেনাবাহিনী মেডিকেল কোরের ডাইরেক্টর কর্নেল (পরে ব্রিগেডিয়ার) খুরশিদ। বিপ্লবীরা তার বাসা আক্রমণ করে কয়েক ঝাঁক গুলি বর্ষণ করে। তিনি পালিয়ে যান।

---

[১৬৩] মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী (অব:) বীর বিক্রম : *এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য : স্বাধীনতার প্রথম দশক*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা; ফেব্রুয়ারি, ২০০০, পৃ. ৯৬।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিন্তু পরে আবার সেপাইদের হাতে ধরা পড়েন। বিপ্লবীরা তার দুই হাত বেঁধে যখন গুলি করতে উদ্যত, ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি অলৌকিকভাবে বেঁচে যান। হঠাৎ আশুরিক শক্তিতে বনবাদাড় ভেঙে তিনি দেন ছুট। তারা পেছনে গুলি ছুড়লেও আর তাকে ধরতে পারেনি। রাস্তার ওপরে অর্ডিন্যান্স স্টেটের অবস্থা ছিল ভয়াবহ। উচ্ছৃঙ্খল সৈনিকরা দলবেঁধে প্রায় প্রতিটি অফিসার্স কোয়ার্টারে হামলা চালায়। ভীত-সন্ত্রস্ত অফিসাররা বাসা ছেড়ে অন্ধকারে পেছনের পানির ডোবায়, ঝোপে-জঙ্গলে আত্মগোপন করে সারা রাত কাটায়। এই সময় COD-এর কমান্ডিং অফিসার কর্নেল বারী সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যান। হত্যাকাণ্ডের সময় তিনি জীপে চড়ে ভেতরে যাচ্ছিলেন। গোলাগুলির খবর শুনে তার বিশ্বস্ত ড্রাইভার গেট থেকেই সজোরে মোড় ঘুরিয়ে তাকে নিয়ে পালিয়ে যায়। COD-এর ভেতরে ঢুকলেই নিশ্চিত তিনি বিদ্রোহী সৈনিকদের হাতে মারা পড়তেন।'[164]

এক রাতে ১২ অফিসার হত্যা

১২ জন অফিসার মারা পড়েন ওই রাতে। আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যান বেশ কজন অফিসার। নিহত কজন অফিসার হলেন মেজর আনোয়ার আজিম, মেজর মহিউদ্দিন, ক্যাপ্টেন খালেক, ক্যাপ্টেন আনোয়ার, লে. সিকান্দার, লে. মুস্তাফিজ, বেগম ওসমান ও অন্যান্য। সারা রাত ভয়ানক আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে কাটে। মাঝেমধ্যে থেমে থেমে গুলির আওয়াজ। বিপ্লবী সৈনিকরা সত্যি সত্যিই অফিসারদের রক্ত নেশায় পাগল হয়ে ওঠে। ভাগ্যিস অধিকাংশ অফিসার ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে সন্ধ্যার আগেই শহরে তাদের নাগালের বাইরে চলে যান। সেপাইগণ কর্তৃক আপন অফিসারদের ওপর হামলা কস্মিনকালেও ঘটেনি এর আগে! বস্তুত এসব অবিশ্বাস্য ঘটনা!'[১৬৫]

এম. এ. হামিদ আরও জানান, ভোর হতে না হতেই সারা ক্যান্টনমেন্টে অফিসারদের মধ্যে গভীর আতঙ্কের ছায়া। আপন সেপাইদের কাছ থেকে অফিসাররা ছুটে পালাতে লাগল। কোনো ইউনিটে, হেডকোয়ার্টারে, অফিসে অফিসার নাই। সবাই ছুটে পালাচ্ছে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে। যে যেদিকে পারছে ছুটে যাচ্ছে আশ্রয়ের খোঁজে। প্রস্থানের পথে বহু অফিসার স্টেশন

---

[১৬৪] লে. কর্নেল (অব.) এম. এ. হামিদ পি.এস.সি : *তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা*, হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা; ফেব্রুয়ারি, ২০১৩, পৃ. ১৩৯-১৪০।

[১৬৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হেডকোয়ার্টারে এসে ভিড় করলেন। বিপ্লবের আকস্মিকতায় সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। বেশির ভাগ অফিসার নিজের জন্য নয়; বরং তাদের পরিবারের নিরাপত্তার চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লেন। ওই দিন সকাল ৮টার সময়ও কয়েকজন অফিসারের ওপর গুলি বর্ষণ করা হলো। বহু অফিসারকে সৈনিকরা নাম ধরে খুঁজতে লাগল। অরাজকতার মধ্যে কে কাকে ধরছে, মারছে, লাঞ্ছিত করছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না।[166]

আরেকজন সাবেক সেনা কর্মকর্তা সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীর প্রতীক তাঁর স্মৃতিচারণে লেখেন—

> '...ত্বরিত জাসদ এবং গোপন সৈনিক সংস্থা বিপ্লবের সিদ্ধান্ত নিল। প্রচার করল, অফিসার মারতে হবে; কারণ, অফিসারেরা প্রথাগত শৃঙ্খলা ও নিয়মকানুনে বিশ্বাস করে। এদিকে বন্দি অবস্থায় জিয়াউর রহমান ভাবলেন, বাংলাদেশকে রক্ষা করতে হলে, প্রথম কাজ হলো বন্দিত্ব থেকে মুক্ত হওয়া। একই সময় জাসদ ভাবল জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করতে হবে এবং জিয়াউর রহমানের ভাবমর্যাদাকে কাজে লাগাতে হবে। ৬ নভেম্বর ১৯৭৫ দিনের শেষে, আন্তর্জাতিক নিয়ম মোতাবেক ৭ তারিখ শুরু হওয়ামাত্রই, তথা মধ্যরাত ১২:০১ মিনিটে বিপ্লব শুরু হলো। অফিসারদের বাসায় বাসায়, অফিসে অফিসে হামলা হলো। হত্যা করা হলো অনেককেই। নারী (ডাক্তার) অফিসারদের হত্যা বা অপদস্থ করা হলো। অফিসারদের অমান্য করার জন্য প্রকাশ্যে মাইকে ঘোষণা দেওয়া হলো। অফিসারদের মধ্যে বেশির ভাগই যে যেদিক পারে, সেদিকে পালিয়ে নিরাপত্তা খুঁজলেন।
>
> ঢাকা সেনানিবাসের অনেক ইউনিট বা রেজিমেন্ট বা ব্যাটালিয়ন যেখানে যেখানে গোপন সৈনিক সংস্থা সক্রিয় ছিল, তারা অন্ধকার রাতে সেনানিবাসের রাজপথে নেমে এলো। হাজার হাজার অস্ত্র থেকে বের হওয়া গুলির আওয়াজ কত প্রকট ছিল, সেটা বাংলায় কোনো শব্দ দিয়ে বোঝাতে পারবো না। আমি নিজে বেঙ্গল রেজিমেন্টের যেই ব্যাটালিয়নে ১৯৭০ সালে জন্ম নিয়েছিলাম এবং যাদের সাথে ৯ মাস মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম, সেই দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগ দিলাম রাত সাড়ে ১২টায়। নেতৃত্ব দিলাম সকাল সাড়ে ৭টা পর্যন্ত।'

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম উল্লেখ করেন—

'জাসদপন্থি সৈনিকদের সঙ্গে হাজার হাজার সাধারণ সৈনিকও বের হয়ে পড়ল। অনেক সৈনিক জেনারেল জিয়ার বাসায় গিয়ে তাকে মুক্ত করলেন। মুক্ত জিয়া পড়লেন এক বিপদে। জাসদপন্থি সৈনিকেরা চাইলেন জিয়াকে নিয়ে যেতে ঢাকা মহানগরীর এলিফ্যান্ট রোডে। সাধারণ সৈনিকেরা চাইলেন জিয়াকে সেনানিবাসে নিরাপদ জায়গায় রাখতে। জিয়া এলিফ্যান্ট রোডে গেলেন না। জাসদের পরিকল্পনা বড়ো হোঁচট খেল। জাসদ চেয়েছিল, সম্ভবত জিয়াকে দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ঘোষণা দেওয়াতে, যথা সরকারের সমাজতান্ত্রিক কাঠামো, সরকারের বৈদেশিক নীতি পুনরায় রুশ-ভারতমুখী করা, অফিসারবিহীন সৈনিকের কাঠামো ইত্যাদি। সাধারণ সৈনিকেরা, ব্যক্তিগতভাবে বন্ধুত্ব আছে—এমন গোপন সৈনিক সংস্থার সদস্যদের কাছ থেকে অনেক কথাই জানতে পেরেছিল। জিয়া পুনরায় দায়িত্ব নিলেন সেনাবাহিনীর। জাসদপন্থি সৈনিকেরা এবং সাধারণ সৈনিকেরা সেনানিবাসের বিভিন্ন জায়গায় মুখোমুখি হয়ে গেলেন। বিদ্যুৎবিহীন সেনানিবাসে অকল্পনীয় ভীতিকর পরিস্থিতি ছিল।'

সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম আরও উল্লেখ করেন, জিয়াউর রহমানকে নিজেদের আয়ত্তে বা নিয়ন্ত্রণে না পেয়ে জাসদ হতবিহ্বল হয়ে পড়ে, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। কিন্তু ইতোমধ্যেই জাসদপন্থি সৈনিকেরা, যারা এতদিন গোপন ছিলেন, তারা চিহ্নিত হয়ে পড়েছেন সাধারণ সৈনিকদের দৃষ্টিতে। বহুসংখ্যক অফিসারকে হত্যা করা হয়েছে, অফিস আদালত তছনছ হয়েছে, গোলাগুলির আঘাতে প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে...এর দায়দায়িত্ব জাসদপন্থি সৈনিকদের ওপরই বর্তে গেল। অপরপক্ষে জাসদপন্থি সৈনিকেরা, রাজনৈতিক দল জাসদের ব্যর্থতার জন্য যুগপৎ হতাশ ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। যেসব সাবেক সেনাকর্মকর্তা জাসদে জড়িত ছিলেন বা যেসব চাকরিরত সেনা কর্মকর্তা জাসদের প্রতি সহমর্মী ছিলেন, তারা সাংঘাতিক বেকায়দায় পড়ে গেলেন। জাসদপন্থি, বামপন্থি বিপ্লব ব্যর্থ করেছে কারা? ব্যর্থ করে দিয়েছিল সাধারণ সৈনিক ও সাধারণ নাগরিকেরা।

জেনারেল ইবরাহিম প্রশ্ন রাখেন, ৭ নভেম্বর যেসব অফিসার নিহত হয়েছেন, তাদের হত্যাকারী কে? বেশির ভাগের হত্যাকারী জাসদপন্থি সৈনিক সংস্থা বা জাসদের গণবাহিনী? হত্যাকারীদের নির্দেশদাতা কে? উত্তর, এই লেখায় বিস্তারিত আলোচনা করা গেল না। সৈনিকদের মধ্যে রাজনীতি ঢুকিয়েছিল তৎকালীন জাসদ। যার কুফল পরবর্তী পাঁচ বছর তো বটেই, তিরিশ-চল্লিশ

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বছর পর্যন্ত লক্ষণীয় ছিল। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আমলে যে কটি ব্যর্থ সেনাবাহিনীর অভ্যুত্থান বা বিমানবাহিনীর অভ্যুত্থান হয়, প্রত্যেকটির সাথে জাসদের দেওয়া শিক্ষা শ্রেণিবিহীন সমাজব্যবস্থা ও অফিসারবিহীন সামরিক ব্যবস্থার মন্ত্র কাজ করেছে। অফিসারদের হত্যা করার যে রেওয়াজ ৭ নভেম্বর স্থাপিত হয়েছে, তার কুফল ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা মহানগরের পিলখানা পর্যন্ত এসেছে। ১৯৭৭-এ বগুড়ায় ব্যর্থ বিদ্রোহে সেনাবাহিনীর অফিসার হত্যা করা হয়। ১৯৭৭-এ ঢাকায় ব্যর্থ বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর সৈনিকদের বিদ্রোহে অনেক বিমানবাহিনীর অফিসারকে হত্যা করা হয়। প্রত্যেকটি ব্যর্থ বিদ্রোহ দমন করার কাজে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকেই দায়িত্ব পালন করতে হয় আদেশপ্রাপ্ত হয়ে। ১৯৭৫-এর পর পরবর্তী পাঁচ বছরের রক্তাক্ত ইতিহাসের পেছনে ইন্ধন জুগিয়েছে ১৯৭৫। পিলখানায় নিহত ৫৭ জন অফিসারকে হত্যা করা হয়েছে, যার রহস্য সন্তোষজনকভাবে এখনও উদ্‌ঘাটিত হয়নি।[১৬৭]

হাইকমিশনে অপারেশন

রাজনৈতিক ও সামরিক গণফ্রন্টসমূহ চরম নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির ওপর জাসদ নেতৃবৃন্দের নিজেদের হারিয়ে যাওয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মূলত তাহেরের গ্রেফতারের পরই জাসদের দ্বিতীয় সারির একদল জঙ্গি সংগঠক ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রী সমর সেনকে জিম্মির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মোহাঃ রোকনুজ্জামানের মতে, (১৯৭৫ সালের) ২৪ নভেম্বর জাসদের মূল নেতা সিরাজুল আলম খানের অজ্ঞাতেই ঢাকা শহরের গণবাহিনীর প্রধান আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে এই জিম্মি ঘটনা ঘটে। বাংলাদেশের ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ছিলেন শ্রী সমর সেন। এই অপারেশনের মূল দায়িত্ব ছিল ৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি সুইসাইড স্কোয়াডের ওপর। এর সদস্য ছিলেন বাহার, বেলাল, সবুজ, মাসুদ, হারুন ও বাচ্চু। কর্নেল তাহেরের ভাই সাখাওয়াত হোসেন বাহারই ছিলেন এই স্কোয়াডের অধিনায়ক। ভারতে অধ্যয়নে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীর ছদ্মবেশে স্কোয়াডের সদস্যরা ২ নভেম্বর দূতাবাসে যেয়ে সামগ্রিক অপারেশনের ছক তৈরি করে আসেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৬ নভেম্বর সকালে সমর সেন তার কার্যালয়ে এসে গাড়ি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গেই স্কোয়াডের ৪ সশস্ত্র সদস্য তাকে জিম্মি করে দূতাবাস ভবনের ভেতরে প্রবেশ করে। গ্রুপের বাকি ২ সদস্য উপস্থিত রক্ষীদের অস্ত্র ফেলে হাত উঁচু করে দাঁড়াতে বাধ্য করে।

---

[১৬৭] মে. জে. (অব :) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীর প্রতীক, জিয়ার আমলের সেনা হত্যার জন্য দায়ী জাসদ-গণবাহিনী, দৈনিক *নয়া দিগন্ত*, ঢাকা; ৭ নভেম্বও, ২০১৪।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পরিস্থিতির নাটকীয়তায় সমর সেন ছিলেন হতবিহ্বল। গণবাহিনীর সদস্যগণ চিৎকার করে বলছিলেন, কেউ গুলি চালালে রাষ্ট্রদূতকে হত্যা করা হবে। একপর্যায়ে তাকে জোর করেই দোতলার সিঁড়িতে তুলতে হচ্ছিল। ঠিক তখনই নিচতলায় এক কক্ষ থেকে ১০/১২ জন সশস্ত্র ভারতীয় রক্ষী বেরিয়ে এসে তাদের লক্ষ করে গুলি চালায়। এটা ছিল একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। কারণ ২৫ নভেম্বরে ভারতীয় রক্ষীদের এরূপ অবস্থান সম্পর্কে সুইসাইড স্কোয়াডের কোনো ধারণাই ছিল না। তা ছাড়া গণবাহিনীর সদস্যদের মাঝে রাষ্ট্রদূত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, ভারতীয় রক্ষীরা একই সময় ভবনের নিচে পাহারারত গণবাহিনীর সদস্যের ওপর গুলি চালিয়েছিল। খুবই স্বল্প দূরত্বে এসব গুলি বর্ষণের কারণে সাথে সাথে উভয় স্থলে স্কোয়াডের ৪ সদস্য নিহত হন। সেন নিজেও গুলিবিদ্ধ হন। তবে গণবাহিনীর সদস্যরা সমর সেনকে গুলি করেননি। যদিও তারা রক্ষীদের উদ্দেশে বলছিলেন যে, গুলি চালালে রাষ্ট্রদূতকে হত্যা করা হবে, কিন্তু আসলে তাদের ওপর নির্দেশ ছিল কোনো অবস্থাতেই সেনকে হত্যা করা যাবে না। কারণ, তিনি মারা গেলে পুরো অভিযানেই আর কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

ভারতীয় রক্ষীদের পালটা হামলার আকস্মিকতা এবং তাতে নিজস্ব চার সহযোদ্ধার মৃত্যুর পর গণবাহিনীর আহত দু-সদস্য বেলাল ও সবুজ তাৎক্ষণিকভাবে ভারতীয় রক্ষীদের একজনকে জাপটে ধরে ফেলেন এবং তাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে ভবনের একটি কক্ষে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন। প্রাথমিকভাবে অভিযানটি ছিল খুবই সফল। অভিযানে অংশ নেওয়া সদস্যদের পকেটে ছিল একটি লিখিত বক্তব্য। তারা আশা করেছিলেন, সমর সেনকে তার অফিসে আটক করে সায়েম ও জিয়াউর রহমানের ওপর চাপ প্রয়োগ করে রেডিও ও টিভিতে ওই বক্তব্য প্রচার করবেন। ওই লেখনীতে জাসদ ও সৈনিক সংস্থার নেতৃবৃন্দের মুক্তিসহ অন্য কয়েকটি দাবিও ছিল—যা পূরণের জন্য সরকারকে ১২ ঘণ্টা সময় বেঁধে দেওয়াও হয়েছিল। পরিকল্পনাকারীরা বিবেচনা করেছিলেন যে, ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কের স্পর্শকাতরতা বিবেচনায় সফলভাবে যদি সমর সেনকে জিম্মি করা যায়, তাহলে সরকার হয়তো দাবি মেনে নিতে বাধ্য হবে। তবে উক্ত লিখিত বক্তব্যে এও বলা ছিল যে, এই জিম্মি নাটকের অজুহাতে ভারত যদি কোনোভাবে বাংলাদেশে হস্তক্ষেপ করে, তাহলে রাষ্ট্রদূত সঙ্গে সঙ্গেই নিহত হবে। বাস্তবেও অভিযানে আকস্মিকভাবে রক্ষীরা হস্তক্ষেপ করলে স্কোয়াডের সদস্যরা সমর সেনকে হত্যা করেনি।[১৬৮]

---

[১৬৮] মোহা ঃ রোকনুজ্জামান : *জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ও বাংলাদেশের রাজনীতি*, মীরা প্রকাশন, ঢাকা; ফেব্রুয়ারি, ২০১০, পৃ. ৭৬-৭৭।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২৭ নভেম্বর, ১৯৭৫ তারিখের *দ্যা নিউইয়র্ক টাইমস* পত্রিকার প্রতিবেদন উদ্ধৃত করেন মহিউদ্দিন আহমদ। এর শিরোনাম ছিল : 'ছয়জনের এক অতর্কিত হামলায় ঢাকায় ভারতের সর্বোচ্চ দূত আহত।' এটি নিম্নরূপ :

'বাংলাদেশে ভারতের হাইকমিশনার ঢাকার দূতাবাসে এক অতর্কিত হামলায় গুরুতর আহত হয়েছেন। হাইকমিশনার সমর সেন; যিনি রাষ্ট্রদূত, তাঁর কাঁধের হাড় ভেঙে গেছে। অস্ত্রোপচার করে গুলি বের করা হয়েছে। তাঁর অবস্থা উন্নতির দিকে বলে জানা গেছে। তিনি গুলিবিদ্ধ হলে নিরাপত্তারক্ষীদের পালটা গুলিতে চারজন মারা যায় এবং দুজন আহত হয়। তাদের পরনে ছিল অসামরিক পোশাক। তাদের রাজনৈতিক পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

এক অভ্যুত্থানে ভারতপন্থি শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারের পতন হওয়ার পর গত তিন মাসে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হয়েছে। এই ঘটনায় বাংলাদেশ সরকার গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছে। হামলার পর নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনারের কাছে ভারত প্রতিবাদ জানিয়েছে। এক সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়—ভারত সরকার এ হামলার ঘটনায় গভীর উদ্‌বেগ প্রকাশ করছে এবং কড়া ভাষায় তার নিন্দা জানাচ্ছে।

ব্রিটিশ ভারতে ঢাকায় জন্ম নেওয়া ৬১ বছর বয়সি এই কূটনীতিককে ভারতে নিয়ে আসার জন্য ডাক্তারসহ বিমানবাহিনীর একটি উড়োজাহাজ পাঠানো হয়েছে। এ মাসের শুরু থেকে ক্ষমতার রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে ক্ষতবিক্ষত বাংলাদেশ সরকার অপরাধীদের শাস্তি এবং যেকোনো মূল্যে বিদেশি নাগরিকদের নিরাপত্তা দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে। গত সপ্তাহে ভারতীয় হাইকমিশন চত্বরে তল্লাশি চালিয়ে একটি অবিস্ফোরিত গ্রেনেড পাওয়া যায়। তখনই নিরাপত্তা জোরদার করার কথা ওঠে।'[১৬৯]

---

[১৬৯] মহিউদ্দিন আহমদ : *অপারেশন ভারতীয় হাইকমিশন*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা; মার্চ, ২০২১, পৃ. ৭৪।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পারস্পরিক সংঘাতের বলি

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য নিবেদিত নেতা-কর্মীরা শুধু শ্রেণিশত্রু খতমেই পারঙ্গম ছিলেন না, তারা নিজেদের মধ্যে হানাহানি করেও রেকর্ড গড়েছেন। তাদের পারস্পরিক সংঘাতের বলি হয়েছে অনেক নেতা-কর্মী-সমর্থক। আশরাফ কায়সারের দেওয়া মাদারীপুর অঞ্চলের বিবরণ থেকে জানা যায়, ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলার বিভিন্ন জায়গায় জাসদের সশস্ত্র গণবাহিনীর সঙ্গে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির ব্যাপক সংঘাত চলে। দুটি দলই পরস্পরের কর্মীদের ওই এলাকার বিভিন্ন জায়গায় হত্যা করে। প্রভাব বিস্তার নিয়ে সৃষ্ট এই দ্বন্দ্বে দল দুটির প্রায় শতাধিক কর্মী নিহত হয় চার বছরে।

১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে সিরাজ সিকদারের মৃত্যুর পর মাদারীপুরে সর্বহারা পার্টির তৎপরতা কমে আসে। অন্যদিকে এই সময়ে জাসদের সশস্ত্র দলগুলো এলাকায় ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয় এবং কর্মকাণ্ড শুরু করে। ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে কেন্দ্রীয়ভাবে সংগঠিত হয়ে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি পুনরায় ওই এলাকায় তৎপর হতে চেষ্টা করে এবং তখনই জাসদের সঙ্গে সংঘাত শুরু হয়। সর্বহারা পার্টির মতে, জাসদ প্রথমে মাদারীপুরের দেয়ারপুর ইউনিয়নে সর্বহারা পার্টির দুজন কর্মী ফজলু ও আইয়ুবকে হত্যা করে। তার পর থেকেই ওই জেলার গ্রামাঞ্চলগুলোতে দুই পার্টির সংঘাত তীব্র হয়ে ওঠে। এই দ্বন্দ্বের কারণে ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে মাদারীপুর জেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক হেলালুল ইসলাম, মজিদ জব্বারসহ বেশ কিছু কর্মীকে হত্যা করে সর্বহারা পার্টি। অন্যদিকে সর্বহারা পার্টির আকবর, বদিউর, সারোয়ার, মিজান, মামুন, সোহরাব, মাহতাবসহ অনেক কর্মী নিহত হয় জাসদের হাতে। পরবর্তী সময়ে সর্বহারা পার্টি তাদের মুখপত্র

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'স্ফুলিঙ্গে' মাদারীপুরে দলীয় তৎপরতাকে 'মাদারীপুর সংগ্রাম' হিসেবে বর্ণনা করে এবং ২৩ জন কর্মী নিহত হওয়ার তালিকা প্রকাশ করে।

১৯৮০-পরবর্তী সময়ে এই এলাকায় অসংখ্য হত্যাকাণ্ড ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটে এসব সংগঠনের পারস্পরিক বিরোধকে কেন্দ্র করে। সব কটি দলই সশস্ত্র পন্থায় ক্ষমতা দখলের আদর্শ প্রচার করলেও এর প্রক্রিয়া, বিপ্লবের স্তর, রাজনৈতিক চিন্তাধারায় সংশোধনবাদ প্রভৃতি বিষয়ে ভিন্নমত এবং দেশীয় পরিস্থিতির সঙ্গে অনেকাংশেই সম্পর্কহীন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তাত্ত্বিক প্রসঙ্গে বিতর্ক রয়েছে। এসব কারণে দেখা যায়, একদল আরেক দলকে 'প্রতিবিপ্লবী', 'দালাল' প্রভৃতি নামে অভিহিত করে থাকে। দলগুলোর মধ্যে সার্বক্ষণিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিদ্যমান এলাকার নিয়ন্ত্রণ-দখলকে কেন্দ্র করে। এসব কারণে 'শ্রেণিশত্রু' খতমের পাশাপাশি 'মতাদর্শিক শত্রু' নিধনেও সমান গুরুত্ব প্রদর্শন করে এই দলগুলো।

১৯৯৩ সালের প্রথম ৬ মাসে যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলে দলগুলোর সংঘাতে প্রাণ হারান ৭৪ জনের বেশি মানুষ। বন্দুকযুদ্ধে এক দিনে নিহত হন ১২ জন। ৯৩-এর ৩ মার্চ একসঙ্গে ৭ জনকে জবাই করার মতো নৃশংস ঘটনাও ঘটে। এই হানাহানি প্রধানত ঘটে বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি ও পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে।[১৭০]

জাসদের অনুসারীরাও যে স্বদেশিদের হিরো মনে করে চলতেন, তার নমুনাও পাওয়া যায়। মহিউদ্দিন আহমদ উল্লেখ করেন, ছাত্রলীগের যেসব কর্মী সিরাজুল আলম খানের প্রতি অনুগত ছিলেন, তারা এ সময় সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার সঙ্গে পরিচিত হতে থাকেন। কিন্তু মূল দর্শন ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদ। 'অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা' তখন তাঁদের আদর্শ। বাঘা যতীন, সূর্য সেন, প্রীতিলতা, সুভাষ বোস তাদের আইডল। একই সময় চে গুয়েভারা, ফিদেল কাস্ত্রো তাদের মনোজগতে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিতে থাকেন। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিভক্তির পর তখন যেসব রাজনৈতিক দল এ দেশে রুশ ও চীনা পার্টির লাইন অনুসরণ করত, সিরাজ গ্রুপের কর্মীরা তাদের ব্যাপারে ছিলেন নিরাসক্ত ও হতাশ।[১৭১]

---

[১৭০] আশরাফ কায়সার : *বাংলাদেশে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা; ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫, পৃ. ১৫৩-৫৪, ১৬০-৬১।

[১৭১] মহিউদ্দিন আহমদ : *জাসদের উত্থান-পতন : অস্থির সময়ের রাজনীতি*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা; অক্টোবর, ২০১৪, পৃ. ২১।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ওপরের বিবরণে দেখা যায়, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য 'নিবেদিতপ্রাণ' ক্যাডাররা সময়ের ব্যবধানে কীভাবে পরস্পরের প্রাণের শত্রু হয়ে ওঠে। সামষ্টিক 'আদর্শ' পরিণত হয় ব্যক্তিগত 'আধিপত্য' প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে। এই লড়াই কেবল দলগুলোর মধ্যেই নয়, সামাজিক আতঙ্ক ও রাষ্ট্রীয় মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পরিণতিতে একটি মতাদর্শ মানুষের মুক্তির পথ দেখানোর বদলে একটি ফ্রাংকেনস্টাইনের রূপ লাভ করে। শেষমেশ তা ইতিহাসের 'মৃত' অধ্যায়ের অংশ হয়ে যায়।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ষষ্ঠ অধ্যায়

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বাম হঠকারিতার পর্যালোচনা

বামপন্থি বিশ্লেষকরা তাদের ভিন্নমত ও মতভেদ প্রকাশ করতে গিয়ে সাধারণভাবে 'বাম হঠকারিতা', 'বাম বিচ্যুতি', 'সংশোধনবাদী', 'সস্তা বিপ্লব' প্রভৃতি শব্দবন্ধ ব্যবহার করে থাকেন। বাংলা অঞ্চলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ সময়ের সাধনার মধ্যে এমন বিভেদ-মতভেদগুলো প্রত্যক্ষ করা যায়। এখানে সে সম্পর্কিত কিছু মূল্যায়ন তুলে ধরা হলো।

একজন তাত্ত্বিকের মূল্যায়ন

সোভিয়েতপন্থি কমিউনিস্ট পার্টির কর্মকাণ্ডের একটি মূল্যায়ন প্রকাশ করে একটি সংবাদপত্র। এর বিবরণ দেন কমিউনিস্ট রাজনীতির বিশ্লেষক আমজাদ হোসেন। বলা হয়, সিপিবি (বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি) বিভক্ত অর্থাৎ তিন টুকরা হলে সিপিবির একজন বিশিষ্ট নেতা ফনীভূষণ দাশ দৈনিক *আজকের কাগজ*-এ 'বিপ্লবে ব্যর্থ সিপিবি দ্বিধাবিভক্ত' শীর্ষক এক প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে লেখক সিপিবি নেতাদের সম্পর্কে চমকপ্রদ সব মন্তব্য করেন। ওই মন্তব্যে তিনি বলেছেন—

> 'নেতারা চীন-রাশিয়া মতবিরোধ নিয়ে পার্টিকে চীনপন্থি, রাশিয়াপন্থি হিসেবে ভাগ করে ১৯৬৫ সনে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি প্রথমবারের মতো দুর্বল হয়ে পড়ে। কমিউনিস্ট নেতা এবং কর্মীরা এক পক্ষ অন্য পক্ষকে আক্রমণ করে বক্তব্য, বিবৃতি দিতে দিতে গোটা পাকিস্তান আমলটা অতিবাহিত করেন। চীনপন্থিরা আওয়ামী লীগবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেন। রুশপন্থিরা সর্বদা আওয়ামী লীগের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। আওয়ামী লীগ নড়লে রুশপন্থিরা নড়ে। মনোভাবটা এমন, আওয়ামী লীগ ছাড়া যেন এক পা

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আগানো যাবে না। পরগাছার ন্যায় নির্ভরশীল পার্টি আন্তর্জাতিকভাবে রুশপন্থিরা সোভিয়েতের ওপর নির্ভরশীল থাকে সর্বদা। রুশ নড়লে ওরা নড়ে। রুশরা হাসলে ওরা হাসে। রুশরা খেতে বললে ওরা খায়। ওরা মানে আজকের সিপিবির নেতারা। চীনপন্থিরা বেশি বুঝতে বুঝতে অনেক ভাগে বিভক্ত হয়ে আজ প্রায় বিলুপ্ত। রুশপন্থিরা জোড়াতালি দিয়ে আজও টিকে আছে ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে, অফিস আছে, টেলিফোন আছে, চেয়ার-টেবিল আছে, ব্যাংক অ্যাকাউন্টস আছে, গাড়ি-বাড়ি আছে। লেভি, চাঁদা ইত্যাদি মাসিক আয়ও আছে। নেই শুধু বৈপ্লবিক কর্মসূচি, সাহস, তেজ...এই পার্টিটা সারা পাকিস্তান আমল এবং বাঙলাদেশ আমলটা নানাভাবে মানুষকে, রাজনীতিকে, হাজার হাজার কর্মীবাহিনীকে বিভ্রান্ত করে নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করেছে; যা কোনো অবস্থাতেই বিপ্লব সাধন করার জন্য ছিল না।...জেলা ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কর্মীদের বিপ্লব আকাঙ্ক্ষাকে পুঁজি করে সোভিয়েতকে সন্তুষ্ট করা, নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন ও জীবিকাকে আরাম আয়াসে পরিচালনা করা, আওয়ামী লীগের সাথে থেকে রাজনীতির অঙ্গনে স্থান করে নেওয়া, চাঁদা, লেভি ইত্যাদি আয়ের সুষ্ঠু পথ সৃষ্টি করা, আওয়ামী লীগের ওপর নির্ভর করে নির্বাচনে গিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা আদায় করা, এমপি হয়ে জনগণের কাছে ইমেজ সৃষ্টি করে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি এবং আর্থিক সুবিধা পাবার পথ উন্মুক্ত করা। সোভিয়েত এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজেদেরকে শক্তিশালী পার্টিরূপে পরিচিত করা। বিপ্লবের নাম দিয়ে এই সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছেন সিপিবি নেতৃবৃন্দ। সিপিবি নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশে বিপ্লবের পরিবর্তে নিজেদের আখের গোছানোর কাজই করেছেন যুগ যুগ ধরে। যা কাউকে বুঝতে দেওয়া হয়নি।'[172]

একজন বিপ্লবীর মূল্যায়ন

কমরেড সিরাজ সিকদারের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি রইসউদ্দীন আরিফ। তিনি একজন লেখকও বটে। কারাগারে বসে নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে রচনা করেন *আন্ডারগ্রাউন্ড জীবন*। আন্দোলন-সংগ্রামের বিষয়ে নিজের মূল্যায়ন নিম্নরূপ তুলে ধরেন :

---

[১৭২] আমজাদ হোসেন : *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের রূপরেখা*, পড়ুয়া, ঢাকা: মার্চ ১৯৯৭, পৃ. ১৯৪।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'জেলের বাইরে গুপ্ত সংগঠনে থেকে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে আমরা যে কুয়োর ব্যাঙের মতো নিজেদের সীমাবদ্ধ চিন্তাচেতনার গণ্ডির ভেতর আটকা পড়ে, একই চিলেকোঠায় বৃত্তাকারে ঘুরেছি এটি বাইরের বিশাল জগতে থেকেও কেন যে টের পাওয়া যায়নি, তা ভাবতে সত্যি অবাক লাগে। আজ জেলখানার চার দেওয়ালের গণ্ডিতে আবদ্ধ থেকেও জীবন ও জগৎ সম্পর্কে মুক্তচিন্তার যতখানি সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে, বাইরের বিশাল জগতে থেকেও সে সুযোগ থেকে আমরা অনেক দূরে অবস্থান করেছি—এটা আজ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছি। পার্টিতে অবস্থান করে নিজেদের মনগড়া শৃঙ্খলা ও মার্কসবাদী তত্ত্বের গোড়ামিপনার এক "ব্ল্যাকহোল" তৈরি করেছিলাম আমরা নিজেরাই। পার্টির রোমান্টিক বিপ্লবী স্লোগানে আকৃষ্ট হয়ে প্রদীপ পাগল পতঙ্গের মতো কর্মীরা দলে দলে পার্টিতে এসে যেন এই ব্ল্যাকহোলের ফাঁদে আটকা পড়ে গেছে। নিজেদের হাতে তৈরি এই ব্ল্যাকহোলের ঘূর্ণাবর্তে আবদ্ধ হয়ে বিপ্লব করার আকাশকুসুম ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছি আমরা, ঠিক যেন কুপমণ্ডুকের মতো কুয়োর ক্ষুদ্র পরিসরকে বিপ্লবের বিশাল জগৎ ভেবে।

জেলের মধ্যে থেকে আমরা নতুন করে উপলব্ধ চিন্তাচেতনার বিষয়গুলো বাইরের পার্টি কমরেডদের বোঝানোর চেষ্টা চালিয়েছি, কিন্তু ফল হয়েছে উলটো। বিপ্লবী পার্টি ও বিপ্লবী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা অর্জনের জন্য পার্টিকে মাটির তলা থেকে মুক্ত আলো-বাতাসে তুলে আনতে হবে। এক অবারিত মুক্তচিন্তার দুয়ার খুলে দিতে হবে কর্মীদের সামনে, এমনকি জনগণের সামনে। এসব ধ্যানধারণা বাইরের পার্টি কমরেডদের বোঝানোর চেষ্টা করেছি, কিন্তু তাদের মনের ভিতর পার্টির দীর্ঘদিনের লালিত বিষবাষ্প নানা ধরনের সন্দেহপ্রবণতা দানা বেঁধে উঠেছে, যার ফলে একপর্যায়ে পার্টির সাথে আমাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে।

গ্রেফতার হয়ে জেলে এসে মূলত পার্টি নামের "ব্ল্যাকহোল" থেকে বেরিয়ে আসার ফলে লাভ হলো দুদিক দিয়ে। **এক.** শাসকগোষ্ঠীর নানা রং-বেরঙের বাহিনীর কাছে ফেরারি হয়ে থাকার নিরাপত্তাহীনতা এবং পার্টির মধ্যকার চরমপন্থিদের হাতে জান খোয়ানোর হাত থেকে আপাতত রক্ষা পাওয়া গেল। **দুই.** গুপ্ত সংগঠনের ছকবাঁধা গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাচেতনার জগতে হঠাৎ আলোর ঝলকানি খেলে গেল।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সে আলোতে তাকিয়ে দেখলাম, মার্কসবাদ ও বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের জগৎ এতই উদার এবং বিশাল, যার কাছে আমাদের দেশের গুপ্ত সংগঠনগুলোর কার্যকলাপ রীতিমতো ঠুনকো এবং হাস্যকর।

সত্য কথা বলতে কী, কেন জানি বারবার আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে—আমাদের দেশের আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনীতি কি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তের শিকার? নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমার কাছে কেবলই মনে হয়েছে, আমাদের দেশের বিপ্লবী পার্টিগুলো যেন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তের এক একটি অজ্ঞাত নাচের পুতুল। তফাত শুধু এটুকু—নাচের পুতুলেরা জানে তাদের গলায় নাচনেওয়ালার সুতাটি বাধা আছে; বিপ্লবী পার্টির নেতা-কর্মীরা যেন কোনো এক অদৃশ্য হাতের টানে নেচে চলেন, কিন্তু গলায় বাধা সুতাটির অস্তিত্ব টের পান না।

এ প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন হচ্ছে—আমরা মার্কসবাদী বিপ্লবীরা দেশের লক্ষ কোটি জনগণের মুক্তির স্বপক্ষে মুষ্ঠিমেয় অত্যাচারী শোষকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সত্য কথা বলব, তা চোরের মতো গোপনে কেন? আমরা কমিউনিস্টরা কোটি কোটি মানুষের মুক্তিসংগ্রামে প্রকাশ্যে আন্দোলনের পথে না গিয়ে গোপন ষড়যন্ত্রের কানাগলি পথে কেন? আমার প্রশ্নের জবাবে অনেক বিপ্লবী কমিউনিস্ট বন্ধুরা বলে উঠবেন—আমাদের দেশে সত্যিকারের কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের প্রকাশ্যে সত্য কথা বলার সুযোগ কোথায়? তারা আরও যুক্তি দেখাবেন, আমরা কমিউনিস্টরা প্রকাশ্যে সত্য কথা বলতে গেলেই তো প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী গ্রেফতার, গুম, হত্যা করে আমাদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আমার প্রশ্নটি হচ্ছে—আন্ডারগ্রাউন্ডে থেকে আমাদের কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা কি কম গ্রেফতার হয়েছে, কম খুন হয়েছে, কম নিশ্চিহ্ন হয়েছে? আন্ডারগ্রাউন্ডের দুর্জয় ঘাঁটিতে অবস্থান করেও কি এ দেশের হাজার হাজার বিপ্লবী কর্মীদের দ্বারা প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর জেলখানাগুলো ভরে ওঠেনি? প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর কালো হাতের থাবায় এ দেশের হাজার হাজার বিপ্লবী কর্মীর রক্তের ফল্গুধারা বয়ে যায়নি? আমাদের আন্ডারগ্রাউন্ড বিপ্লবের বিরাট বড়ো বড়ো মাস্টার প্লানগুলো কি প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর হাতে ছিন্নভিন্ন হয়নি? তাহলে কী উদ্দেশ্যে, কার স্বার্থে এ আন্ডারগ্রাউন্ড!'[১৭৩]

---

[১৭৩] রইসউদ্দিন আরিফ : *আন্ডারগ্রাউন্ড জীবন*, প্রকাশক : মুহাম্মদ মনীরুল আলম, ঢাকা: ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১, পৃ. ৭৫-৭৬।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'খতমের লাইন' সম্পর্কে বদরুদ্দীন উমর

'খতমের লাইন'-এর পরিণতি সম্পর্কে বদরুদ্দীন উমরের মূল্যায়ন :

> 'শ্রেণিশত্রু খতমের লাইন অনুসরণ করতে গিয়ে আমরা শত শত এবং পরের দিকে দুই একটি জেলাতেই কয়েক হাজার মানুষকে গ্রামাঞ্চলে নৃশংসভাবে খতম করেছি। আমাদের দেশের ভূমি মালিকানার পরিমাণ, মহাজনি কারবারের চরিত্র এবং জোতদার মহাজনদের নানা প্রকার নির্যাতনের সাথে যাদের কিছু পরিচয় আছে, তারাই জানেন—বড়ো ভূস্বামী বা জোতদার, বড়ো মহাজন ইত্যাদি যারা জনগণের ওপর চরম নির্যাতন চালায় এবং যাদের বিরুদ্ধে জনগণের চরম ঘৃণা আছে, সংখ্যায় তারা কত। নিশ্চয়ই দুটি একটি জেলাতে তাদের সংখ্যা শত শত নয়, হাজার হাজার তো নয়ই। কিন্তু তবু হাজার হাজার মানুষকেই 'শ্রেণিশত্রু' হিসেবে খতম করা হয়েছে এবং এই কাজকে মনে করা হয়েছে বিপ্লবী। মনে করা হয়েছে, এই কাজের মাধ্যমেই জনগণকে সাথে পাওয়া যাবে, গেরিলা যুদ্ধের বিস্তৃতি ঘটবে এবং বিপ্লবের বিকাশ হবে। কিন্তু এ খতমের দ্বারা বাস্তবক্ষেত্রে তার কিছুই হয়নি।'[174]

বাম আদর্শের পরিণতি সম্পর্কে

গবেষক ম. মনিরুজ্জামান উল্লেখ করেন, কয়েকটি বাম দল তাদের দর্শনে বিপ্লবী হওয়ার কারণে ওই দলগুলো সর্বদা সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য সহিংস উপায় অবলম্বন করেছিল। স্বাধীনতার পরে এই দলগুলোর বেশ কয়েকটি সশস্ত্র অভিযানে সক্রিয় ছিল, বিশেষত বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমের জেলাগুলোতে এরা তৎপর ছিল। আন্তঃগোষ্ঠী এবং আন্তঃদলীয় সহিংসতা তাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপগুলোর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে ব্যবহৃত হতো। তবে ১৯৮০-এর দশক শেষ না হওয়া পর্যন্ত দলগুলো বাংলাদেশের রাজনীতিতে মূলত অপ্রাসঙ্গিক থেকে যায়। এরশাদ শাসনামলে জেএসডির মতো এ জাতীয় কয়েকটি দলের সংসদে বিরোধী দল হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। ১৯৮০-এর দশকের শেষ দিকে এরশাদবিরোধী আন্দোলন এবং গণতন্ত্রের দিকে পরিবর্তনের সময় মূলধারার দলগুলো রাজনৈতিকভাবে প্রত্যাবর্তন করে। তবে এই সময়ের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের অবক্ষয়ের কারণে এ দেশে

---

[১৭৪] বদরুদ্দীন উমর : *একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙলাদেশের কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক ভূমিকা*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা; এপ্রিল, ১৯৯৬, পৃ. ৫৭।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাদের সমর্থন হ্রাস পেতে থাকে। ওই দলগুলো তাদের রাজনৈতিক রীতিনীতি অক্ষুণ্ন রেখে আওয়ামী লীগের সাথে জোট গঠনের কৌশল অবলম্বন করে। বামপন্থি এই দলগুলো ১৯৯০-১৯৯৫ এবং ২০০১-২০০৭ চলাকালীন সরকারবিরোধী পদক্ষেপে আওয়ামী লীগের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলে। ২০০৮ সালের নির্বাচনের পরে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের অংশীদার হওয়ার কারণে দলগুলো কার্যকরভাবে তাদের সমাজতান্ত্রিক আদর্শ থেকে সরে আসে।

২০১৩ সালের নির্বাচন পরবর্তী আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকারে দলগুলোকে বাদ দেওয়া হলে তাদের রাজনৈতিক মন্দা আবার শুরু হয়। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের সাথে তাদের সময়কালে দলীয় নেতৃত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামিক চিন্তাধারাকে মেনে চলে। মূল ভূখণ্ডে সমাজতন্ত্রের অবসান বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলগুলোকে আরও অপ্রাসঙ্গিক করে দেয়।[১৭৫]

মাওবাদীদের চরিত্র মূল্যায়ন

এককালের কমরেড নুরুল ইসলাম নাহিদ মাওবাদী সমাজতন্ত্রীদের সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন প্রদান করেন। তিনি উল্লেখ করেন—মাওবাদের বিরুদ্ধে পার্টির সংগ্রাম এক উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা। মাওবাদীরা কমিউনিস্ট আন্দোলনকে বিভ্রান্ত ও বিভক্ত করার জন্য যখন মরিয়া হয়ে ওঠে, তখন আমাদের পার্টি (কমিউনিস্ট পার্টি) মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পার্টি মাওবাদের বিরুদ্ধে ভূমিকা গ্রহণ করলেও মাওবাদীরা ১৯৬৫-৬৬ সালে পার্টি থেকে বের হয়ে যায় এবং পৃথক দল গঠন করে। গণসংগঠন ও আন্দোলনসমূহকেও বিভক্ত করতে থাকে। প্রতিক্রিয়া ও সুবিধাবাদীরা মাওবাদকে তাদের নিজেদের এক সুবিধাজনক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। মাওবাদ শুধু পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রামকেই দুর্বল ও ক্ষতিগ্রস্ত করেনি; এদের কার্যকলাপে সামগ্রিকভাবে আমাদের দেশের জাতীয় ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনেও অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে। পার্টির উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ক্যাডার হঠকারী স্লোগানে বিপথগামী হয়েছে। অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তির ভেতরে যারা প্রগতিশীল চিন্তায় আকৃষ্ট হয়েছিল, তাদের বিরাট অংশ 'সস্তা বিপ্লব'-এর স্লোগানে বিপথগামী হয়েছে। সাধারণভাবে কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয়েছে,

---

[১৭৫] ম. মনিরুজ্জামান : প্রবন্ধ : *বাংলাদেশে দলীয় রাজনীতি ও রাজনৈতিক সহিংসতার ৫০ বছর*, তারেক শামসুর রেহমান সম্পাদিত *বাংলাদেশ রাজনীতির ৫০ বছর*, শোভাপ্রকাশ, ঢাকা; ফেব্রুয়ারি, ২০২১, পৃ. ১২৩।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সুযোগ গ্রহণ করেছে। তারা জাতীয় আন্দোলনে মূল স্রোতধারার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে। মাওবাদীরা প্রতিক্রিয়ার সাথে হাত মিলিয়ে গণতন্ত্র ও মেহনতি মানুষের সংগ্রামকে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিভ্রান্ত করে এবং কমিউনিস্টদের জন্য খুবই জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। ষাটের দশকের শুরু থেকে বিভিন্ন সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ ক্যাডাররা পার্টিতে সমবেত হয়েছিল। এই সকল ক্যাডারদের উপযুক্তভাবে গড়ে তোলা এবং শ্রমিকশ্রেণি ও অন্যান্য মেহনতি মানুষের মধ্যে কাজে নিয়োজিত করার উপযুক্ত সময়গুলো কেটেছে মাওবাদের অশুভ তৎপরতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে।

কমিউনিস্ট পার্টি মাওবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম পরিচালনা করে। পার্টি নেতৃত্ব গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি অনুসরণ করে পার্টির অভ্যন্তরে মাওবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে পার্টিকে সংঘবদ্ধ ও শিক্ষিত করে। যার ফলে পার্টি আরও ঐক্যবদ্ধ ও সংহত হয়েছে। পক্ষান্তরে লেনিনবাদী সাংগঠনিক পার্টিনীতির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে যারা মাওবাদী নীতি অনুসরণ করে পার্টিকে বিভক্ত করল এই কথা বলে যে, ভিন্ন মত, তাই পৃথক পার্টি করতে হবে। তারা পরবর্তীকালে 'ভিন্ন মত হলে পৃথক পার্টি'—এই মাওবাদী শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে প্রায় প্রত্যেক 'নেতাই' একটা করে 'পার্টি' তৈরি করল। এইভাবে মাওবাদীরা বহু উপদলে ভাগ হয়ে যায়। বর্তমানে মাওবাদীরা প্রায় এক ডজন গ্রুপে বিভক্ত হয়েছে। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অভিজ্ঞতা ও প্রভাব এবং আমাদের পার্টির মাওবাদবিরোধী অবিচল সংগ্রামের ফলে এদের অনেকের মধ্যেই মাওবাদের মোহ অনেকাংশে কাটতে শুরু করেছে। এদের একাংশ তাদের অতীত ভূমিকা পরিবর্তন করে এখন আমাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করছে। অন্যান্য আরও কয়েকটি গ্রুপ মাওবাদের অসারতা ও বিপদ উপলব্ধি করতে শুরু করেছে এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মূল স্রোতাধারায় ফিরে আসতে শুরু করেছে।[১৭৬]

---

[১৭৬] নুরুল ইসলাম নাহিদ : *রাজনীতির সুস্থধারা পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম*, চারুলিপি প্রকাশনী, ঢাকা: ২০০৯, পৃ. ১০৫।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙন

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিতে ভাঙন প্রসঙ্গে ড. মর্তুজা খালেদ উল্লেখ করেন, ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির একাংশকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। তারা মনে করে, সামগ্রিকভাবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন ঘটেছে। সুতরাং দলের নাম পরিবর্তনসহ বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ তারা গ্রহণ করেন। ১৯৯২-৯৩ সালে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সদস্যদের মধ্যে অধিকাংশ এই মতাবলম্বী ছিলেন। তারা কমিউনিস্ট পার্টিকে বিলোপ করে নতুন ধারায় রাজনীতি করার প্রস্তাব রাখা শুরু করেন। কেন্দ্রীয় কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদলকে বিলোপ করার পক্ষপাতী ছিল। এ অবস্থায় মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় কমিটির একাংশ এই ধারার বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। তাঁরা কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ কংগ্রেসের প্রণীত রাজনৈতিক লাইন অনুসরণের প্রস্তাব রাখেন।

বিষয়টি মীমাংসার উদ্দেশ্যে ১৯৯৩ সালের ২৬-২৮ ফেব্রুয়ারি দলের কেন্দ্রীয় কমিটির তিন দিনব্যাপী সভা বসে। সভায় মৌলিক প্রশ্নে দলের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা হয়। মৌলিক প্রশ্নে ন্যায়সংগত সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির মতে কমিউনিস্ট পার্টি নতুনভাবে রূপান্তরিত পার্টি হবে, তাদের ভাষায়—

> 'উন্নয়ন, গণতন্ত্র, সামাজিক ন্যায়বিচার ও জাতীয়তাবাদ এই চারটি সাধারণ লক্ষ্য বাস্তবায়নের অপরিহার্য মৌল উপাদান ও বিষয়গুলো সম্পর্কে এবং এর সাথে সংগতিপূর্ণ কর্মসূচি প্রণয়ন ও পদক্ষেপ সম্পর্কে স্বচ্ছ ও সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন হবে এবং কর্মসূচি প্রণয়নে দেশীয় বাস্তবতায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করবে।... রূপান্তরিত পার্টি বাঙালি জাতির প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক,

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মানবিক ঐতিহ্যকে সব সময় সমুন্নত রাখতে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারাকে এগিয়ে নিতে সচেষ্ট হতে হবে।'

কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মত অনুযায়ী রূপান্তরিত পার্টিতে থাকবে নানা মত, নানা চিন্তার ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সমাবেশ। মতামতের ভিত্তিতে স্বাধীন গ্রুপ গঠনের অধিকার থাকবে এ দলে। দলকে বিলোপবাদীদের বিপরীতে মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টির কিছু সদস্য শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেন। তাদের মতে যদিও দলের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য সমাজতন্ত্র; কিন্তু এই মুহূর্তে বাংলাদেশে তার বিষয়গত শর্তগুলো অনুপস্থিত। এই শর্তগুলো পূরণের জন্য তারা প্রথমে সমাজের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রূপান্তরের একপর্যায় অতিক্রম করার কথা বলেন। এই পর্যায় হলো সমাজতন্ত্রে উপনীত হওয়ার পূর্ববর্তী এক স্তর। যেহেতু বাংলাদেশে আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট পশ্চাৎপদ তাই সমাজতন্ত্র নয়, সমাজতন্ত্রের পূর্ববর্তী এই প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রূপান্তরের জন্য কাজ করে যাওয়া উচিত। তাদের মতে—'এই মুহূর্তে দলের সমাজতন্ত্র নয়; বরং আশু কর্তব্য হলো সার্বিক পশ্চাৎপদতা দূর করা; গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কাজকে অগ্রাধিকার দেওয়া।'

তারা আরও প্রস্তাব করেন—বিশ্বব্যাপী মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আন্দোলনের যেসব অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে, তা বিবেচনায় এনে মার্কসীয় মতাদর্শগত ধারার সৃজনশীলভাবে প্রয়োগ করে দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করা। তারা কমিউনিস্ট পার্টিকে বিলোপ না করে বরং বাংলাদেশে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র কমিউনিস্ট পার্টি থাকার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। তাদের মতে, আমাদের দেশে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র কমিউনিস্ট পার্টির প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিকে আমাদের গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাস্তব পরিস্থিতির বিষয়গত প্রয়োজনের ভিত্তিতেই এ দেশে কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত ও বিকশিত হয়ে আসছে এবং ভবিষ্যতেও তা হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। বাস্তব ইতিহাস থেকে এও দেখা যায় যে, 'গরিব ও মেহনতি মানুষের' গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া বাংলাদেশে উদারনৈতিক গণতন্ত্র বা সামাজিক গণতন্ত্র নিরবচ্ছিন্নভাবে অগ্রসর হতে পারবে না।

মতপার্থক্য আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কমিউনিস্ট পার্টি বিলোপের পক্ষে থাকায় দল দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। শুধু দল বিভক্ত নয়, দলীয় সম্পত্তি বিভক্ত করা হয়।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিকের নেতৃত্বে বিলোপবাদীরা দল ত্যাগ করেন এবং মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টির মূল অংশ ১৯৯৩ সালের ১৫ জুন বিশেষ জাতীয় সম্মেলন করে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রূপান্তরের ধারা ও মার্কসবাদের সৃজনশীল অনুশীলনের প্রত্যয় ব্যক্ত করে কমিউনিস্ট পার্টিকে পুনর্গঠন শুরু করেন।

কমিউনিস্ট পার্টির এই বিভক্তি সারা বাংলাদেশেই এ সংগঠনের নেতা-কর্মীদের প্রভাবিত করে। সর্বত্র দলের ভাঙন দেখা যায়। রাজশাহীতে শফিকুর রহমান বাদশার নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টির বেশ কিছু সদস্য দল ত্যাগ করে। তারা দলীয় সম্পত্তি ভাগাভাগির প্রস্তাব করেন। দলীয় সম্পত্তির পরিমাণ বেশি না হওয়াতে এ বিষয়টি বেশি দূর গড়ায়নি।[১৭৭]

লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, কমিউনিস্ট পার্টিতে বিভেদ-মতভেদ এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, একেবারে পার্টি বিলুপ্ত করে ফেলার দাবিও উত্থাপিত হতে দেখা যায়। এই মতভেদের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে অনেকেই পার্টি ত্যাগ করেন, দল বদল করে ফেলেন এবং অনেকেই নিষ্ক্রিয় হয়ে যান।

---

[১৭৭] ড. মর্তুজা খালেদ : *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট ও বাম আন্দোলনের বিকাশধারা এবং রাজশাহী জেলা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা; জানুয়ারি, ২০২২, পৃ. ২১০-২১২।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উপসংহার

বর্ণিত অধ্যায়সমূহের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ থেকে যে সকল পর্যবেক্ষণ পাওয়া গেল, সেগুলো ক্রমানুসারে সাজালে নিম্নরূপ উপসংহারে উপনীত হওয়া যায় :

১. সন্দেহ নেই যে, একদা বামপন্থা সারা পৃথিবীজুড়ে আলোড়ন তুলেছিল; কিন্তু তত্ত্বগতভাবে এবং কর্মপদ্ধতিতে তা ব্যর্থ হয়েছে।

২. বিশেষত এর প্রয়োগ-কৌশল জবরদস্তিমূলক হওয়ায় কোনো পর্যায়ের মানুষের কাছেই তা গ্রহণযোগ্যতা পায়নি।

৩. 'শ্রেণিশত্রু খতম' করার লাইন মানুষকে ভীত-সন্ত্রস্ত, আতঙ্কিত করেছে। ফলে এই মতবাদের কাছে ভিড়তে জনগণ সাহসী হয়নি।

৪. 'শ্রেণিশত্রু' নামক একজন মানুষের প্রধান অপরাধ—সে ধনিক শ্রেণির লোক, সে জোতদার-জমিদার, মহাজন বা মোড়ল। এগুলো 'অপরাধী' হওয়ার যোগ্য কোনো বৈশিষ্ট্য নয়, যদি না সে অন্যের সম্পদ-সম্পত্তি জুলুম করে গ্রাস করে। তাকে কেবল 'জোতদার-মহাজন' হওয়ার জন্য হত্যা করা রাষ্ট্রীয় আইনে ফৌজদারি অপরাধ। এর শাস্তি কেবল রাষ্ট্রের বিচার বিভাগই দিতে পারে—বমপন্থিরা সেই সচেতনতাটুকু এড়িয়ে গেছেন।

৫. আদর্শ বা মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তি বা দলীয়ভাবে অস্ত্রের ব্যবহার ও প্রয়োগ কখনোই গ্রহণযোগ্য হয়নি।

৬. এ দেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদী আন্দোলনের কৌশলের সূত্রপাত করে স্বদেশিরা এবং এই কৌশল হস্তগত করে ব্যবহার করে বামপন্থিরা। আর তারই প্রয়োগ ঘটে দুই বাংলায়।

৭. জঙ্গিবাদ, উগ্রবাদ, সন্ত্রাসবাদ, চরমপন্থা প্রভৃতি অস্বাভাবিক পথ ও পন্থার প্রচলনকারী হলো বামপন্থি আন্দোলনের অগ্রসৈনিকরাই।

৮. এরাই এ দেশে বোমা উৎপাদনের সূচনা করে, বিস্ফোরণ ঘটায়, আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির ওয়ার্কশপ পর্যন্ত স্থাপন করে। এটিকে তারা কুটির শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যায়।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৯. থানা ও ফাঁড়ি লুট করে অস্ত্র সংগ্রহ করার কৌশল তারাই চালু করে।

১০. পুলিশ হত্যা ও ঘায়েল করার পদ্ধতির প্রয়োগের সূচনা হয় এদের মাধ্যমে।

১১. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে লুটপাট চালিয়ে বিপ্লবের তহবিল সংগ্রহ করার নিয়মও তাদেরই চালু করা।

১২. তথাকথিত 'গণ আদালত' স্থাপন করে এবং গ্রামে-গঞ্জে বিচারসভা বসিয়ে মৃত্যুদণ্ড প্রদান ও তা কার্যকর করে বিচারবহির্ভূত হত্যার পদ্ধতি চালু করে বামপন্থার অনুসারীরা।

১৩. বেআইনি ও অবৈধ অস্ত্রের আমদানি, সংরক্ষণ ও অপব্যবহারের প্রচলন করে এরাই।

১৪. বিদেশি রাষ্ট্রের দূতাবাসে হামলা ও কূটনীতিককে জিম্মি করে দাবি আদায়ের মতো রাষ্ট্রদ্রোহী কর্মকাণ্ডও করে এই বামপন্থার অনুসারীরা।

১৫. এই আন্দোলনের শুরুর দিকের অধিকাংশ নেতা ও নীতিনির্ধারকই সশস্ত্র, জঙ্গিবাদী ও চরমপন্থি পদ্ধতি ও কৌশলের মধ্য থেকে আগত। তাদের জঙ্গিবাদী কৌশল দ্বারা সমৃদ্ধ।

১৬. সমাজে কিছু জোতদার-মহাজন উৎপীড়ক-জুলুমবাজ চিরকাল ছিলই; আজও আছে। এদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা সৃষ্টি হওয়া আপাতদৃষ্টিতে ন্যায়সংগত মনে হবে। এই ঘৃণা উৎপাদনকে কর্মকৌশল হিসেবে ব্যবহারও যুক্তিযুক্ত মনে হতে পারে। কিন্তু এই শোষণ-নির্যাতন বন্ধের জন্য খুনের চর্চা ও লুটপাটের সংস্কৃতি চালু করে সামাজিক পর্যায়ে অস্থিরতা তৈরিতে কোনো সমাধান দেওয়ার বিষয়টি কোনো ক্ষেত্রেই সমর্থন পেতে পারে না।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পরিশিষ্ট

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

০১

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে একটি মূল্যায়ন

আমজাদ হোসেন

(কমরেড আমজাদ হোসেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের একজন শীর্ষ ব্যক্তিত্ব ও তাত্ত্বিক হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর একটি মূল্যায়ন এখানে পত্রস্থ করা হলো।)

এ দেশের কমিউনিস্টদের উচিত ছিল কোনো পন্থি না হওয়া, স্বাধীন চিন্তা নিয়ে এ দেশে মার্কসবাদকে প্রয়োগ করা। তাহলে তারা সফলতার পথে এগোতে পারতেন। এ দেশে পন্থি হওয়ার প্রবণতা এখনও কম নয়। চীনপন্থি, রুশপন্থি, ভারতপন্থি, হোজাপন্থিসহ আরও নানা পন্থির খোঁজ পাওয়া যায়। কিন্তু কোনো পন্থি না হয়ে কমিউনিস্টদের উচিত ছিল এই দেশের মাটিতে বসে নিজস্ব চিন্তাকে আশ্রয় করা। ১৯৭১ সনের হাতিয়ার গ্রুপ এ ব্যাপারে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিল। রাজনৈতিক নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে, এই পার্টির নেতারা কলকাতায় বসেও ভারত ও রাশিয়ার প্রতি বিগলিত লাইন গ্রহণ করেননি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নেতারা তাদের লাইনে অনড় থাকেননি। এ দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অনেক নেতা ও কর্মী 'পন্থি' হওয়ার বিরোধিতা করেছেন সব সময়।

কমিউনিস্টদের উচিত ছিল এ দেশের মাটি ও মানুষ সম্পর্কে অবহিত হওয়া। তারা এ দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও ঐতিহ্য ইত্যাদি অনুসন্ধান করতে পারতেন। আর সে অনুযায়ী কর্মপন্থা গ্রহণ করতে পারতেন। কে যেন বলেছিলেন ১৯৫৫ সালে—(The CPI does not understand the mind of India.) এ দেশে বাস করলেও তারা রাশিয়া বা চীনের কথাই বেশি ভেবেছেন এবং কর্মপন্থা নির্ধারণের ক্ষেত্রে দেশের চেয়ে বিদেশের কথাই বেশি করে ভেবেছেন।

কমিউনিস্টদের উচিত পার্টি ক্ষমতায় রদবদল করা। বারবার ভুল করার পরও একই ব্যক্তি যুগ যুগ ধরে নেতৃত্ব করবেন—এমন না হওয়াই উচিত। আবদুল হক, তোয়াহা, অমল সেনসহ আরও অনেকের কথাই বলা যায়, যারা সর্বদাই নেতৃত্বে থেকেছেন বারবার ভুল করার পরও। এই অবস্থার বদল হওয়া দরকার।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এই অবস্থার বদল না হওয়ার ফলে নির্ভুল বা কম ভুল সম্পন্ন নতুন নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটেনি। পুরানো নেতারা নতুন নেতাদের দূষিত করেছেন। আমাদের দেশের কমিউনিস্ট নেতারা দীর্ঘ সময় ধরে আন্দোলনে পরিশীলিত নন। পার্টির ক্ষমতা রদবদলের ক্ষেত্রে এ দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি বিজ্ঞানসম্মত নয়। একবার নেতা নির্বাচিত হলে তিনি স্থান ছাড়েন না, তাকে বদল করা হয় না। তাকে কেন্দ্র করে চক্র গড়ে ওঠে। এখানে প্রধানত নেতৃত্বে আসেন শহরে অনুষ্ঠানকারী বা শহরবাসী এবং সাধারণত উচ্চশিক্ষিত। তত্ত্বজ্ঞানের বিচার হয়, বাস্তব জ্ঞানের বিচার করা হয় না। সুখেন্দু ও তোয়াহার চেয়ে আবদুল হক যোগ্য ছিলেন, অথচ নেতা ছিলেন তোয়াহা ও সুখেন্দু। যে নেতার অর্থ সংস্থান আছে বা অর্থ সংস্থানের ক্ষমতা আছে, তাকে পার্টি নেতৃত্বের কেন্দ্রে থাকতে দেখা যায়। একই নেতা যুগ যুগ ধরে ক্ষমতায় থাকলে তোষামোদি গ্রুপ তৈরি হয়। নেতা ও কর্মীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয়। এর ফলে নেতারা অনেক বিষয় জানতেও পারেন না। জনগণের সাথে নেতাদের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে তোষামোদি চক্র হচ্ছে বিনাশের বিশিষ্ট সোপান। আনোয়ার হোজা, স্তালিন, মাও সেতু, ক্যাস্ট্রো ও কিম ইল সুং প্রমুখ নেতারা দীর্ঘকাল ক্ষমতায় থেকেছেন। এদের সম্পর্কে বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই।

কমিউনিস্ট পার্টির থাকা উচিত জাতীয় প্রশ্নে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি। উপমহাদেশের জাতি সমস্যার সমাধান ব্রিটিশ যুগে যেমন হয়নি, তেমনি এখনও হচ্ছে না। ভারতের বিভিন্ন ভাষী অঞ্চল আজ স্বাধীনতার স্লোগান নিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের উদ্ভব হলেও এখনও জাতীয় সমস্যা রয়ে গেছে। বাঙালি জাতি এখনও বিভক্ত। তারা নানা জায়গায় নিগৃহীত। বাঙালিরা বাস করছে আসামে, ত্রিপুরা, উড়িষ্যা, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে। নানা জাতি আজ বাঙালি জাতিকে জাতিগতভাবে ও সংস্কৃতিগতভাবে নিপীড়ন করছে। সুতরাং জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি বাদ দিয়ে এখানকার কমিউনিস্টরা জনগণের আস্থা অর্জন করতে পারবে—এমন মনে হয় না। এখানকার কমিউনিস্টরা জাতীয় প্রশ্নকে অবহেলা করেছে বারবার। ষাটের দশকে বাঙালি যুবকদের একাংশ ৬ দফার পতাকাতলে সমবেত হয়, একাংশ নকশালবাড়ী কৃষক অভ্যুত্থান দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়।

এ দেশের কমিউনিস্ট নেতারা জাতীয় সমস্যাকে ঠিক মতো বুঝতে পারেননি। জাতীয়তাবাদ বিষয়টিকে তারা সম্পূর্ণ দূরে রেখেছেন। অথচ এটা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। ষাটের দশকে তা ব্যাপ্তি লাভ করে এবং এটাকে সুকৌশলে ব্যবহার করে আওয়ামী লীগ। কমিউনিস্টরাও এ নিয়ে তেমন ভাবেননি, তারা কেবল লেনিন-স্তালিন ও মাও সেতুং-এর জাতীয় প্রশ্ন সম্পর্কিত রচনাগুলো

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ক্রমাগত আউড়িয়ে গেছেন। এখনও বাঙালি, সিন্ধি, পাঞ্জাবি, বেলুচ, অসমিয়া, গুর্খা, চাকমা ও সাঁওতালসহ বিভিন্ন জাতির জাতীয় প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যায়নি। অথচ এ নিয়ে বাংলাদেশের কমিউনিস্টদের কোনো বক্তব্য নেই।

এখানকার কমিউনিস্টদের উচিত ছিল দেশের উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণের কর্মসূচি নেওয়া। এর ফল হতো অন্য রকম। কমিউনিস্টদের বক্তব্য বা দাবি-দাওয়া পড়লে মনে হয় তারা ক্ষমতায় গিয়েই সবকিছু করবেন। দেশ জাতি ও জনগণের প্রতি ক্ষমতায় না যাওয়া পর্যন্ত তাদের যেন কোনো দায়িত্ব নেই। কীভাবে তারা দেশের বেকার সমস্যা দূর করবেন, দেশের উন্নতি ঘটাবেন ও দেশকে স্বনির্ভর করবেন—এ সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য জনগণের কাছে দেওয়া উচিত। এতে উন্নয়নকামী মানুষ আগ্রহবোধ করে। দেশপ্রেমিক লোকেরা আগ্রহী হয়ে ওঠে। এখানকার কমিউনিস্টদের উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি নেই।

কমিউনিস্টদের থাকা উচিত পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি। নামকাওয়াস্তে কিছু দাবি বা দফা—এটাই যথেষ্ট নয়। বাস্তব, বিজ্ঞানসম্মত ও পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি দরকার। কমিউনিস্টদের থাকতে হবে শিল্প, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক পলিসি। থাকতে হবে ভূমি ও কৃষিনীতি। অর্থাৎ থাকবে পূর্ণাঙ্গ একটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও উন্নয়নের লাইন।

এখানকার কমিউনিস্ট আন্দোলনে সকলেই ঐক্যের কথা বলেছেন। আবার পার্টি ভেঙেছেন সকলেই। ভাঙা ও গড়া এবং ভাঙা এটাই এখানকার কমিউনিস্ট পার্টির বৈশিষ্ট্য তা বলা যায়। এরা ছোটো বিষয়কে বড়ো বিতর্কে পরিণত করেছেন। বড়ো বিষয়ের বিতর্ককে ছোটো ভেবেছেন। ঐক্যর জন্যই বিতর্ক করা উচিত। অন্যের থেকে নিজেকে বেশি মাত্রায় তফাত করে দেখানোর প্রবণতা এখনও এ দেশে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। অনেক নেতাই নিজের কথা পার্টির চেয়ে বেশি ভাবেন। তারা নিজের আস্থা অনুসন্ধান করেন ও সে রকম জায়গায় নিজেকে স্থাপন করার জন্য চেষ্টা করেন। এরা রাজনৈতিকভাবে অসৎ। মার্কসবাদ শিক্ষা দেয়, ব্যক্তিস্বার্থ বড়ো নয়, পার্টির স্বার্থ বড়ো। লেনিন ও মাও সেতুং এ কথা বারবার বলেছেন।

বর্তমানে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সবচেয়ে বড়ো দায়িত্ব হলো উপমহাদেশের বিগত ৭% বছরের কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন করা। ভুল কোথায় হয়েছে তা বের করা এবং তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া। যদিও এটা কঠিন কাজ। তবুও এটা করা দরকার। এটা করা যেতে পারে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাও সেতুং চিন্তাধারার ভিত্তিতে, বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐতিহাসিক শিক্ষাবলির ভিত্তিতে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আর এটা মেলানো দরকার বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জাতীয় মানসিকতার সঙ্গে। বাস্তব অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণ করে। যদিও এ কথাগুলো তাত্ত্বিক। বাংলাদেশের সব দলই তাদের দলিলে এ কথা লিখেছেন। কিন্তু এরপরও তারা তা যথাযথভাবে করতে পারেননি। বহু ক্ষেত্রে শ্রেণি দৃষ্টিতে না করে বৈক্তিক দৃষ্টি ও চিন্তার ভিত্তিতে করা হয়েছে। এই বইয়ের গ্রন্থপঞ্জিতে যেসব দলিলের তালিকা দেওয়া হয়েছে, তা পড়ে আমার এ কথাই মনে হয়েছে।

এখানকার কমিউনিস্ট নেতারা ইতিহাস পড়েন খুবই কম। তারা এখানকার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও জাতীয় ইতিহাস খুব কমই পড়েন। তারা পড়েন মার্কস-এঙ্গেলস লেনিন-স্তালিন-মাও সেতুং-এর রচনাবলি আর এর ফলে কেবলমাত্র একদেশদর্শী ধারণাই পড়ে ওঠে। এ ছাড়া তারা সমাজতন্ত্র-মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে সমালোচনা করে যেসব বই লেখা হয়েছে তা আদৌ পড়েন না। এর ফলে দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হয় না। তাই এখানকার কমিউনিস্ট আন্দোলনে গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতাবাদ একটি ক্ষতিকর উপাদান হিসেবে বিরাজ করছে।

আগেই বলেছি, এখানকার কমিউনিস্ট আন্দোলন পেটি বুর্জোয়া বৃত্তের মধ্যে সব সময় আবদ্ধ থেকেছে। তারা কখনো এই বৃত্ত ভাঙতে পারেননি। এখনও কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব রয়েছে শহরবাসী উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির হাতে। এদেরই কারণে কমিউনিস্ট পার্টি বারবার ভেঙেছে। ভাঙতে ভাঙতে দৈন্যদশায় পৌঁছেছে। আর এই শ্রেণির দ্বারাই অন্ধ আনুগত্য, দুর্নীতি ও প্রতারণা সবই সম্ভব।

এখানকার কমিউনিস্টরা কৃষি প্রশ্নকে যতটুকু গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার তা দেখেননি। কৃষি ও কৃষি সম্পর্কিত বিষয়গুলো সম্পর্কে তাদের ধারণায় যথেষ্ট ঘাটতি আছে। এ ছাড়া এখনও কৃষক সংগঠনগুলোর নেতৃত্বে রয়েছেন শহরের শিক্ষিত লোকেরা, যারা গ্রামের সঙ্গে সম্পর্কহীন। মাও সেতুং ও লেনিনের রচনাবলি গ্রামের কৃষকদের ভূমিকা কতটুকু তা স্পষ্ট বর্ণনা করেছে। অতীতের কৃষক আন্দোলনগুলো থেকে তারা প্রকৃত পক্ষে কিছুই শেখেননি। গ্রাম এলাকায় ঘাঁটি তৈরি করতে হলে ভূমি, কৃষি ও কৃষকদের বুঝতে হবে। কৃষকদের ওপর ভিত্তি করা ছাড়া কমিউনিস্টরা কখনোই শক্তি অর্জন করতে পারবেন না ।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রশ্নে কমিউনিস্টরা কখনোই দৃঢ় ছিলেন না। এটাকে তারা দেখেছেন ভাসাভাসাভাবে। তাই তারা কখনো বলেছেন 'গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও' করার কথা, কখনো বলেছেন 'গণ অভ্যুত্থানে'-এর কথা, কখনো বলেছেন নির্বাচনের কথা।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট নেতারা 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা'-এর কথা বলেছেন ও লিখেছেন তাদের গঠনতন্ত্রে। কিন্তু মানেননি কখনো। তারা কেবল মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্তালিন ও মাও সেতুং-এর উদ্ধৃতি আওড়িয়েছেন। নেতারা পার্টি ঐক্যের কথা বলেছেন, কিন্তু ভেঙেছেনও। (আমজাদ হোসেন : *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের রূপরেখা*, পড়ুয়া, ঢাকা; মার্চ ১৯৯৭, পৃ. ২৭২-২৭৫।)

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

০২

বিদ্রোহ

মহিউদ্দিন আহমদ

(জাসদ-গণবাহিনীর কথিত 'বিপ্লবী' কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরেছেন গবেষক মহিউদ্দিন আহমদ তাঁর *জাসদের উত্থান পতন : অস্থির সময়ের রাজনীতি* গ্রন্থে। সেখান থেকে 'বিদ্রোহ' উপ-শিরোনামে উল্লিখিত রচনার অংশবিশেষ এখানে প্রদান করা হলো।)

বিপ্লবী গণবাহিনীর তাত্ত্বিক ধারণা ও কেন্দ্রে একটা সাংগঠনিক কাঠামো. গড়ে উঠলেও আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে এর কোনো সদস্য সংগ্রহের কার্যক্রম তখনও শুরু হয়নি। দিনক্ষণ ঠিক করেও এর কোনো পরিকল্পনা ও কার্যক্রম নেওয়া হয়নি। গণবাহিনী ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে। কেউ কাউকে বলে দেয়নি, তুমি গণবাহিনীর সদস্য। ব্যাপারটা হয়ে উঠেছে। প্রথাগত গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সংগ্রামের বাইরে গিয়ে অন্য কোনোভাবে কিছু কার্যক্রম নেওয়াটাকেই দেখা হতো 'বিপ্লবী' কর্মকাণ্ড হিসেবে। আর যাদের বিরুদ্ধে এসব কার্যক্রম পরিচালিত হতো, তাদের দৃষ্টিতে গণবাহিনী ছিল 'অগণতান্ত্রিক' ও 'বেআইনি'।

নিখিল রঞ্জন সাহা বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্নাতক। মেধাবী এই তরুণ সবেমাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যন্ত্রকৌশল বিভাগে লেকচারার হিসেবে যোগ দিয়েছেন। উনসত্তর সাল থেকেই তিনি ছাত্রলীগের সিরাজপন্থিদের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। চুয়াত্তরের ২৬ নভেম্বরের হরতালের প্রস্তুতি উপলক্ষ্যে ঢাকা শহরে একটা শক্তির মহড়া দেওয়ার পরিকল্পনা হয়। নিখিল দায়িত্ব নেন বোমা বানানোর।

নিখিল এর আগেও বোমা তৈরি করেছেন, পদ্ধতিটি ছিল খুবই স্থূল। পাতলা এক টুকরা মার্কিন কাপড় চিনি দিয়ে ভিজিয়ে এবং পরে শুকিয়ে মাড় দেওয়া কাপড়ের মতো শক্ত করা হতো। এর ভেতরে ধাতব স্প্লিন্টার ঢুকিয়ে দেওয়া হতো। এর সঙ্গে মেশানো হতো পটাশিয়াম ক্লোরেট। পরে জিনিসটা একটা

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জ্যাকেটের মধ্যে পুরে দেওয়া হতো। জ্যাকেটের মধ্যে কয়েকটা ফোকর রাখা হতো। প্রতিটি ফোকরে অ্যাম্পুলের ভেতরে থাকত সালফিউরিক অ্যাসিড। এটা ডেটোনেটরের কাজ করত। টাইম বোমা বানানোর জন্য কনডম ব্যবহার করা হতো। অ্যাম্পুলগুলো কনডমের ভেতরে রাখা হতো। পরীক্ষা করে দেখা গেল, অ্যাম্পুল ফেটে গেলে অ্যাসিড একটা কনডম থেকে বেরিয়ে আসতে প্রায় দুই মিনিট সময় নেয়। যদি পরিকল্পনা থাকত বোমাটা চার মিনিট পরে ফাটানো হবে, তাহলে দুটো কনডম ব্যবহার করা হতো। জ্যাকেটের মুখে একটা সলতে দেওয়া হতো। সলতের মধ্যে আগুন দিয়ে জ্যাকেটবন্দি বোমাটি ছুড়ে ফেলে দিলে বিস্ফোরণ হতো। কনডম না থাকলে বিস্ফোরণ হতো তাৎক্ষণিক।

চুয়াত্তরের ২৪ নভেম্বর রাতে যাত্রাবাড়ীতে গফুর মেম্বারের বাড়িতে নিখিল তাঁর দুই সহযোগী গোলাম মোরশেদ নয়ন ও কাইয়ুমকে নিয়ে বোমা বানানো শুরু করেন। বেশ কয়েকটি বোমা বানানো হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ দুর্ঘটনা ঘটে। একটি বোমা ভুলক্রমে বিস্ফোরিত হয়ে যায়। তারপর আরও কয়েকটি। কাইয়ুম ঘটনাস্থলেই মারা যান। নিখিল আহত হন। তাঁর শরীরের বেশ কিছু অংশ ঝলসে যায়। নয়ন নিখিলকে কাঁধে নিয়ে প্রথমে পোস্তগোলা যান। সেখান থেকে একটা অ্যাম্বুলেন্স জোগাড় করে নিখিলকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। ২৫ তারিখ ঢাকা নগর গণবাহিনীর সদস্য বাদল খান হাসপাতালে নিখিলকে দেখতে যান। নিখিল তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 'আমার ডায়েরিটা সম্ভবত পুলিশের হাতে পড়েছে। রাতে বাড়িতে থেকো না।' ২৬ নভেম্বর হাসপাতালে নিখিলের মৃত্যু হয়। দলের মধ্যে কেউ কেউ সন্দেহ করেন, নিখিল বেঁচে থাকলে অনেক গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যেতে পারে। তাই তাঁকে হাসপাতালেই মেরে ফেলা হয়। নিখিলের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর থানার বিটঘর গ্রামে। পরিবারটি ছিল হতদরিদ্র। নিখিলের বাবা ছিলেন খেতমজুর। নিখিলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই পরিবারটির স্বপ্নের মৃত্যু হলো।

কাইয়ুম পলাশী কলোনিতে থাকতেন। রেডিওতে খবর শুনে তাঁর মা গফুর মেম্বারের বাড়ির কাছে যান। সেখানে তখন আরও মানুষ ভিড় করেছিল। কাইয়ুমের বাবা ছিলেন সরকারি কর্মচারী। তাঁরা সরকারি কোয়ার্টারে থাকতেন। চাকরি এবং সরকারি বাসা নিয়ে ঝামেলা হতে পারে বলে কাইয়ুমের মা সন্তানের পরিচয় পর্যন্ত দেননি, তাঁর লাশ নিয়ে আসার সাহস পাননি। বেওয়ারিশ লাশ হিসেবে কাইয়ুমকে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামের তত্ত্বাবধানে দাফন করা হয়। ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জেলায়, বিশেষ করে ছোটো শহরগুলোতে জাসদের কর্মীদের প্রায় সবাইকে তখন পুলিশ ও রক্ষীবাহিনী খুঁজছে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পুলিশের হাতে ধরা পড়লে তবু রক্ষা, তাঁদের থানাহাজতে কিংবা জেলখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হতো। কিন্তু রক্ষীবাহিনীর হাতে ধরা পড়লে জীবিত ফিরে আসার সম্ভাবনা ছিল কম। কতজনকে যে তারা গুলি করে বা পিটিয়ে মেরেছে, তার কোনো হিসাব নেই। 'এনকাউন্টার' শব্দটা তখনই চালু হয়। 'বেআইনি অস্ত্র নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময়' কিংবা 'আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে', 'কতিপয় দুষ্কৃতকারী নিহত হয়েছে', রক্ষীবাহিনীর এই বয়ান ছিল গৎবাঁধা।

চুয়াত্তরের নভেম্বরের শেষে কুষ্টিয়ায় একটা ঘটনা ঘটে। এটা ছিল রীতিমতো একটা যুদ্ধ। রক্ষীবাহিনীর অত্যাচারে জাসদের কর্মীরা কেউ বাড়িতে থাকতে পারতেন না। স্থানীয় সংসদ সদস্যরা সব সময় তাঁদের পেছনে রক্ষীবাহিনী লেলিয়ে দিতেন বলে অভিযোগ ছিল। এ ব্যাপারে একটা হেস্তনেস্ত করার জন্য জাসদের কর্মীরা অধৈর্য হয়ে পড়েন। তাঁদের মূল অভিযোগ ছিল স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতা আক্কাস উকিল, শামসুল হুদা দুদু, আহসান, আফাজ ও কোব্বাতের বিরুদ্ধে। তাঁদের প্ররোচনায় রক্ষীবাহিনী জাসদের কর্মীদের হয়রানি করত বলে ধারণা করা হয়। জাসদের কর্মীরা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েন। একদল প্রস্তাব করে, আওয়ামী লীগের সব সংসদ সদস্যকে মেরে ফেলা ছাড়া উপায় নেই। আরেক দলের প্রস্তাব হলো, রক্ষীবাহিনীর ওপর হামলা করে তাদের শিক্ষা দেওয়া দরকার।

স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাদের মধ্যে তাঁদের প্রধানতম শত্রু ছিলেন কুষ্টিয়া জেলার খোকসা-কুমারখালী অঞ্চলের সংসদ সদস্য গোলাম কিবরিয়া। তাঁর বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুদের জমি দখল এবং নানা ধরনের অনাচারের অভিযোগ ছিল। কুষ্টিয়া জেলা মুজিব বাহিনীর অন্যতম কমান্ডার এবং গণবাহিনীর নেতা মারফত আলীর প্রস্তাব অনুযায়ী গোলাম কিবরিয়াকে 'মৃত্যুদণ্ড' দেওয়া হয়। এই প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য ঢাকায় জাসদের সাংগঠনিক সম্পাদক এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান নেতা নূরে আলম জিকুর কাছে পাঠানো হয়। নূরে আলম জিকুর সঙ্গে জাসদের কর্মী শাহাবুব আলম চিরকুট আদান-প্রদান করেন। ঢাকায় গণবাহিনীর হাইকমান্ডের সঙ্গে আলাপ করে জিকুকে 'হ্যাঁ' অথবা 'না' এই সিদ্ধান্ত দিতে বলা হয়। সিদ্ধান্ত আসে 'হ্যাঁ'।

একদিন রাতে গণবাহিনীর ৭৩ জন সদস্য কুষ্টিয়ার মিরপুর থানার ছাতারপাড়া গ্রামে মরা নদীর পারে সমবেত হন। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রক্ষীবাহিনীর ওপর কীভাবে আক্রমণ করা হবে, তার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করাই ছিল এ সমাবেশের উদ্দেশ্য। হঠাৎ তাঁরা বুঝতে পারেন, রক্ষীবাহিনী তাঁদের ঘেরাও করে ফেলেছে। শুরু হয় 'যুদ্ধ'। গোলাগুলি চলে আড়াই ঘণ্টা। গণবাহিনীর মূল নেতা

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শামসুল হাদীসহ সাতজন নিহত হন। নিহত অন্য ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন মুসা, উম্মত, খলিল, জিলানী, কুদ্দুস ও ছোটো মন্টু। তাঁরা সবাই ছিলেন একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধা। আহত হন ছয়জন। রক্ষীবাহিনীর ১৭ জন নিহত হন। গোলাগুলিতে তিনজন নিরীহ কৃষক মারা যান। তাঁরা মাথায় করে পাট নিয়ে যাচ্ছিলেন।

গণবাহিনী গোলাম কিবরিয়ার 'মৃত্যুদণ্ড' কার্যকর করার চেষ্টা চালিয়ে যায়। তাদের পরিকল্পনা ছিল, দিনের বেলায় প্রকাশ্যে তাঁকে হত্যা করা হবে। অবশেষে চুয়াত্তরের ২৫ ডিসেম্বর সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়। সেদিন ছিল কোরবানির ঈদ।

এই অপারেশনে গণবাহিনীর মোট ৪৩ জন অংশ নেন। এর আগে কুমারখালী ও খোকসা থানার পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করার পরিকল্পনা করা হয়। হান্নান, আলাউদ্দিন, অধীর, মজনু ও গনি কুমারখালী থানায় গিয়ে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বলেন, 'সারেন্ডার করবেন, না আমরা থানা দখল করব?' ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বললেন, 'আমাদের জানে মারবেন না। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে কিছু বলব না। প্রয়োজনে একটি-দুটি ফাঁকা আওয়াজ করব।' কুমারখালী থানার ওসি নজরুল ইসলাম এভাবেই পুলিশের ২২ জন সদস্যসহ আত্মসমর্পণ করেন। একই পদ্ধতি নেওয়া হলো খোকসা থানার ক্ষেত্রেও। সেখানে আবুল দারোগাসহ ১৮ জন পুলিশ সদস্য আত্মসমর্পণ করেন।

কুমারখালী থানার সামনে ঈদগাহ। থানার নিয়ন্ত্রণ নেওয়া হয় রাত একটায়। ২৫ ডিসেম্বর বুধবার সকালে ঈদের জামাত। লোকে লোকারণ্য, হাজার দশেক মানুষ। জামাত শুরু হবে, সবাই দাঁড়িয়ে গেছেন। সবার সামনে দিয়ে কয়েকজন হেঁটে গেলেন। তাঁদের পরনে শার্ট-লুঙ্গি, গায়ে চাদর। সামনের কাতারে দাঁড়ানো গোলাম কিবরিয়ার বুকে অস্ত্র ঠেকিয়ে একজন গুলি করলেন। ঘটনাস্থলেই তিনি নিহত হন। তাঁর দেহরক্ষী আজম খান ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যান। মানুষ যে যেদিকে পারে ছুটে পালায়। ঈদের জামাত আর হয়নি।

পুরো অপারেশনটি কয়েক মিনিটের মধ্যে শেষ হয়। দলটি গড়াই নদ পার হয়ে সোনাদিয়া বাজারে চলে যায়। সেখান থেকে একেকজন একেক জায়গায়।

(মহিউদ্দিন আহমদ : *জাসদের উত্থান-পতন : অস্থির সময়ের রাজনীতি*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা; অক্টোবর, ২০১৪, পৃ. ১৪৪-১৪৭)

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

০৩

বাংলাদেশের বাম রাজনৈতিক দলের পরিচয়

আমজাদ হোসেন

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) : এই দল মার্কর্সবাদ-লেনিনবাদের অনুসারী বলে আত্মপরিচয় দেয়। বাংলাদেশে এই দল 'মস্কোপন্থি' তথা 'রুশ-ভারতে'র সমর্থক বলে পরিচিত। এই পার্টি গণচীনের বিরুদ্ধে সোচ্চার এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী। এই দল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার ঘোষণা দিয়েছে। মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির জন্য এই দল সংগ্রাম করছে। এই দলকে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের পুরো ভাগেও থাকতে দেখা যায়। যদিও এই দলকে বহুদিন ধরে গণ আন্দোলনে স্বাধীন ভূমিকা রাখতে দেখা যায় না। তারা কাজ করেন অন্য দলের লেজুড় হয়ে। তাদের সাংগঠনিক শক্তি আছে। তারা স্বাধীনভাবে কাজ করলে, লেজুড়বৃত্তি ও সুবিধাবাদ পরিত্যাগ করলে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা রাখতে সক্ষম হতেন বলে কেউ কেউ মনে করেন। এই দল শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত আট দলীয় জোটের শরিক দল। এই দলের বিশিষ্ট নেতা সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক।

বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল [মা-লে] (আসাদ্দর-বড়ুয়া) : এই দল মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাসী এবং সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদবিরোধী। এই দল বাংলাদেশকে আধা ঔপনিবেশিক ও আধা সামন্তবাদী বলে মনে করে এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ব্যাখ্যা করে। এই দলের অন্যতম নেতা মোহাম্মদ তোয়াহা সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন। আসাদ্দর আলী, খন্দকার আলী আব্বাস প্রমুখ এই দলের নেতা। ১৯৭৬ সালে এই পার্টি প্রকাশ্য কার্যকলাপ শুরু করে। এর পূর্বে এই দল গোপন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে।

বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (ইয়াকুব-নুরুন্নবী) : ১৯৮৩ সনের অক্টোবরে এই দলের সূত্রপাত। তোয়াহার নেতৃত্বে পরিচালিত দলের ভাঙনের মধ্য দিয়েই এই দলের জন্ম। এই দল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তোয়াহার বিরুদ্ধে বিক্ষোভই মূলত এই দলের সূত্রপাত ঘটিয়েছে। এই দলের মতে, সোভিয়েত ইউনিয়ন সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী দেশে অধঃপতিত হয়েছে। এই দল কমিউনিস্টদের ঐক্য গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে।

বাংলাদেশের ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগ (অমল সেন) : সম্প্রতি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট লীগ ও বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি (নজরুল) এক যৌথ সম্মেলনে বাংলাদেশের ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগ গঠন করেছে। এ হচ্ছে ঐক্যের ফলশ্রুতি। এই দলের নেতা অমল সেন। এই দলের নেতৃত্বে রয়েছেন বিমল বিশ্বাস, টিপু বিশ্বাস, আব্দুল মতিন, শরদিন্দু দস্তিদার, আনিসুর রহমান মল্লিক প্রমুখ। এই দল মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাসী। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে বিশ্বাসী এই দল কৃষক শ্রমিক মেহনতি জনতার রাজনৈতিক সংগ্রাম জোরদার করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে। এই দল মনে করে যে, কমিউনিস্টদের স্বাধীনভাবে দাঁড়ানো উচিত এবং কোনো পন্থি হওয়ার দরকার নেই। এই দল কৃষক শ্রমিকদের শ্রেণিসংগ্রামে বিশ্বাস করে। এই দল 'রুশপন্থি' বা 'চীনপন্থি' হওয়াকে সংগত মনে করে না। দলটি সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদবিরোধী। এই দল কমিউনিস্ট ঐক্য ও বাম মোর্চার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল [মা-লে] (মোস্তাক) : শিক্ষাবিদ মোস্তাকের নেতৃত্বে গোপন দলটি ১৯৮২ সালে গঠিত ও পরিচালিত। বাংলাদেশের সাম্যবাদী দলের (মা-লে) ভাঙনের মধ্য দিয়ে এই দলের জন্ম। এই দল মার্কসবাদ লেনিনবাদের অনুসারী এবং এই সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদবিরোধী নয়া গণতন্ত্রবাদী বলে আত্মপরিচয় দেয়। এদের মতে, চীনা কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ পরিত্যাগ করেছে।

বাংলাদেশ জনমুক্তি পার্টি : এই পার্টির সভাপতি মাহফুজ ভূঁইয়া। তোয়াহার নেতৃত্বে পরিচালিত বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল থেকে বহিষ্কৃত হয়ে ১৯৭৯-তে তিনি এই দল গঠন করেন। এই দল মার্কসবাদী লেনিনবাদী হিসেবে পরিচিত। এই দলের মতে, সর্বহারা ও আধা সর্বহারারই কেবল বিপ্লবী ভূমিকা আছে। এই দলের মূল্যায়ন হচ্ছে—আমলাতান্ত্রিক শোষকেরা জনগণের শত্রু। এদের মতে, এই দেশের সরকার বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণি ও মধ্য শ্রেণির উচ্চস্তরের প্রতিনিধিত্ব করে। এই দল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের বিরোধী। এই দলের নেতারা মনে করেন যে, বাংলাদেশে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির অস্তিত্ব নেই। এদের মতে, বাংলাদেশে সামন্তবাদেরও অস্তিত্ব নেই।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বাংলাদেশ মজদুর পার্টি (দেবেন) : মূল দলের ভাঙনের মধ্য দিয়ে দেবেন সিকদারের নেতৃত্বে ১৯৮০ সনে এই দলের জন্ম। বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী এই দল মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাস করে। এই দল সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদবিরোধী।

বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল) : আবদুল হকের নেতৃত্বে পরিচালিত এই গোপন দল মার্কসবাদ লেনিনবাদে বিশ্বাসী। এই দল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, রুশ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও সামন্তবাদের বিরোধী। এই দলের মতে, চীন ও সোভিয়েত রাশিয়া উভয়ই মার্কসবাদ লেনিনবাদ থেকে সরে গেছে। এই পার্টি রুশ-চীন-মার্কিন-ভারতবিরোধী মোর্চা গঠন করতে আগ্রহ প্রকাশ করে। তাদের মতে, বাংলাদেশ আধা ঔপনিবেশিক ও আধা সামন্তবাদী দেশ।

পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল) : জনৈক আবদুর রশিদের নেতৃত্বে এই গোপন দলটি বেরিয়ে এসেছিল আবদুল হকের নেতৃত্বে পরিচালিত দল থেকে ১৯৭৯ সালে। এই দলের মতে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের ওপর সাম্রাজ্যবাদী হামলা চলে, ফলে বাংলাদেশের জন্ম। বাংলাদেশ সৃষ্টি করেছে সাম্রাজ্যবাদীরা। এদের মতে, জাতীয় দ্বন্দ্বই প্রধান, রুশ-ভারতবিরোধী জাতীয় সংগ্রাম তাদের প্রধান কর্তব্য। এই দল ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনকে বুর্জোয়া আন্দোলন বলে অভিহিত করে।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল) : চিন্তাবিদ বদরুদ্দীন উমরের নেতৃত্বে এই পার্টির জন্ম ১৯৭৬ সনে। এই দল মার্কসবাদ লেনিনবাদের অনুসারী। এই দল মনে করে যে, চীন-রাশিয়া কেউই এখন আর মার্কসবাদ লেনিনবাদ অনুসরণ করছে না। বাংলাদেশে সামন্তবাদ নেই, অনুন্নত পুঁজিবাদী ও নয়া ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা বিদ্যমান। এই দল সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, মুৎসুদ্দি আমলা পুঁজি ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের বিরোধী। তারা গণবিপ্লবের মাধ্যমে শোষক শ্রেণিগুলোকে উৎখাত করে ক্ষমতায় যেতে চান।

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি (মেনন) : রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বে পরিচালিত এই দল মার্কসবাদ লেনিনবাদে বিশ্বাসী ও জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে আস্থাশীল। তাদের মতে, চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক দেশ। বাংলাদেশ একটি নয়া ঔপনিবেশিক দেশ এবং ক্ষমতার কেন্দ্রে রয়েছে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া শ্রেণি। এই দলের আশু লক্ষ্য হচ্ছে, জনগণের প্রতিনিধিত্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি প্রশাসন, আমলাতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন ও বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন, রাষ্ট্রীয় পুঁজি সুদৃঢ়করণ, স্বাধীন নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি : এই দলের কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান হচ্ছেন তারেক জানি। এই দল বৈপ্লবিক পদ্ধতিতে বিশ্বাসী এবং মার্কসবাদী লেনিনবাদের অনুসারী বলে আত্মপরিচয় দেয়।

পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল) : মোফাক্কার চৌধুরীর নেতৃত্বে পরিচালিত এই পার্টি মার্কসবাদ লেনিনবাদ মাও সেতুং চিন্তাধারার অনুসারী বলে দাবি করে। বাংলাদেশে একমাত্র এই দল ভারতের কমিউনিস্ট নেতা চারু মজুমদারের অনুসারী। সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ, মুৎসুদ্দি আমলা পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে এই দলের কর্মনীতি ও কর্মকৌশল রয়েছে।

পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি : প্রয়াত নেতা সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে ১৯৬৮ সালে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন নামে এক গোপন 'বিপ্লবী' দল গঠিত হয়। এই দলই ১৯৭১ সালে পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টিতে রূপান্তরিত হয়। '৭১-এ এই দল স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে। ১৯৭৫ সালে সিরাজ সিকদার মুজিব সরকারের নির্দেশে নিহত হন। সিরাজ সিকদারের মৃত্যুর পর এই দল অস্থায়ী পরিচালনা কমিটি (অপক) এবং সর্বোচ্চ বিপ্লবী পরিষদ (সবিপ)—এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। বর্তমানে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি নামে যে দল আছে, তার নেতৃত্বে রয়েছেন কবীর আনোয়ার। এই দল মার্কসবাদ লেনিনবাদ ও মাও সেতুং চিন্তার অনুসারী। এই পার্টি সন্ত্রাসবাদ পরিত্যাগ করার এবং গণলাইনে কাজ করার চেষ্টা করছে।

বাংলাদেশের সর্বহারা পার্টি (জিয়াউদ্দিন) : অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্নেল জিয়াউদ্দিনের নেতৃত্বে পরিচালিত এই দলের উদ্ভব সিরাজ সিকদারের মৃত্যুর পর। এই দল মার্কসবাদ লেনিনবাদের কথা বলে। তারা সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ বিরোধী। এই দল মনে করে, জাতীয় শত্রু খতম করা সঠিক নয়। গ্রামে সশস্ত্র তৎপরতা চালানো উচিত নয়। মাও সেতুংকে তারা সংশোধনবাদী বলে মনে করেন। এই দলের মতে, সিরাজ সিকদার জাতীয়তাবাদী ছিলেন। এই দল মনে করে যে, যদি পূর্ব থেকে পাকিস্তানভিত্তিক রণনীতি ও রণকৌশল নিয়ে কাজ করা হতো তাহলে বুর্জোয়ারা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন করতে সক্ষম হতো না। একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনকে তারা উগ্র জাতীয়তাবাদী কাজ বলে মনে করেন।

বাংলাদেশের সর্বহারা পার্টি (কামরুল) : জিয়াউদ্দিনের নেতৃত্বে পরিচালিত সর্বহারা পার্টি ভেঙে গিয়ে ১৯৮৭ সনে এই দলের উদ্ভব। জনৈক কামরুল এই দলের নেতা। এই দল মার্কসবাদ লেনিনবাদের কথা বলে। এই দলের মতে,

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বুর্জোয়াদের নির্বাচনে অংশ নেওয়া যায়, প্রকাশ্যে পার্টিও করা সম্ভব। এই দল মনে করে যে, মাও সেতুং সংশোধনবাদী ছিলেন। এই দল মার্কসবাদ লেনিনবাদে বিশ্বাসী।

শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল : ১৯৬৯ সনে এই দলের জন্ম। নির্মল সেন এই দলের নেতা। মার্কসবাদী লেনিনবাদী দল। চীন বা রাশিয়া কারও প্রতি এই দলের বিশেষ অনুরাগ নেই। এই দল শোষিতের গণতন্ত্র চায়। তাদের মতে, শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রের কর্মজীবীদের যৌথ নেতৃত্বে। এই দলের মতে, ভূমিহীন ও গরিব কৃষক, ক্ষুদে ব্যবসায়ী এবং স্বল্প আয়ের লোকেরা শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবে। দেশে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির কোনোরূপ অস্তিত্ব নেই। এই দল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের বিরোধী। এই দল সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ঐক্য প্রয়াসী।

আদি সাম্যবাদী দল : এই দলের নেতা আমিনুর রহমান। এই দল সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের বিরোধী। তাদের মতে, বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থা প্রাক পুঁজিবাদী পর্যায়ে রয়েছে এবং সামন্তবাদী কাঠামো বিদ্যমান। এই দল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কথা বলে। এই দল মনে করে যে, চীন ও রাশিয়া উভয়েই মার্কসবাদ পরিত্যাগ করেছে।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট কর্মী সংঘ : পাকিস্তানি আমলে এই দলের জন্ম। দাউদ হোসেন এই দলের নেতা। এই দল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অনুসারী। এই দল বিপ্লবী রীতিতে সমাজ পরিবর্তনের কথা বলে।

কমিউনিস্ট পার্টি থেকে উদ্ভূত দল

এই পর্যায়ে বর্ণিত দলগুলোর নেতারা পূর্বে কোনো না কোনো কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং কমিউনিস্ট হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। পরবর্তীকালে এদের কেউ কেউ কমিউনিস্ট পার্টি পরিত্যাগ করেছেন।

গণতান্ত্রিক পার্টি (তাজুল) : নূরুল হুদা কাদের বক্স, আনোয়ার জাহিদ, সিরাজুল হোসেন খান প্রমুখ নেতৃবর্গ ১৯৮০ সালের ডিসেম্বরে গণতান্ত্রিক পার্টি গঠন করেন। পরবর্তীকালে আনোয়ার জাহিদ ও সিরাজুল হোসেন খানের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক পার্টির একাংশ সরকারি দলে লীন হয়ে যায়। তাজুল ইসলাম এখন দলের নেতা। এই দল সমান্তবাদ বিরোধী, গণতন্ত্রী, নির্বাচনের রাজনীতির অনুসারী। মূল ধ্বনি হচ্ছে—জাতীয় স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সামাজিক

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রগতি এবং এরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে প্রচার চালায়।

ইউনাইটেড পিপলস পার্টি [ইউপিপি] (সাদেক) : ১৯৮৩ সালের এপ্রিলে মিয়া সাদেকুর রহমানের নেতৃত্বে পিপলস পার্টির কাজী জাফর বিরোধীদের নিয়ে এই দল গঠিত হয়। সাদেকুর রহমানই এই দলের নেতা। এই দল সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদবিরোধী, রুশবিরোধী। এই দল কাজী জাফর ও তার অনুসারীদের সুবিধাবাদী রাজনীতির বিরোধিতা করে।

ইউনাইটেড পিপলস পার্টি [ইউপিপি] (আরেফিন) : শামসুল আরেফিন খান এই দলের চেয়ারম্যান। কাজী জাফর আহমেদ সরকারি দলে লীন হলে এই দলের নেতারা দলীয় পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেন। ১৯৮৬ সনের জানুয়ারিতে এক দলীয় বৈঠকে কাজী জাফর আহমেদের সুবিধাবাদী ভূমিকার নিন্দা করা হয় ও দলকে পুনর্গঠিত করা হয়। এই দল জাতীয় স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক মুক্তির কথা প্রচার করে। এই দল আধিপত্যবাদ ও রুশ-ভারতবিরোধী। সমাজতন্ত্র এই দলের মূল লক্ষ্য বলে ঘোষিত।

গণতান্ত্রিক কর্মীশিবির : নূরুল হক চৌধুরীর (মেহেদী) নেতৃত্বে ১৯৭৮ সালের ২ জুলাই এই দল গঠিত হয়। তিনি এই দলের আহ্বায়ক এবং তাত্ত্বিক। এই দল ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র প্রভৃতির কথা প্রচার করে। এই দল গণমানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দাবিকে তুলে ধরে।

সূত্র : আমজাদ হোসেন : *বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল*, পড়ুয়া, ঢাকা; জুলাই, ১৯৯৬, পৃ. ২০-২৩।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

08

বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টির তালিকা

১. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)
২. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল বাসদ
৩. জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল
৪. জাতীয় গণতান্ত্রিক গণমঞ্চ
৫. নয়া গণতান্ত্রিক গণমোর্চা
৬. জাতীয় গণফ্রন্ট
৭. বাংলাদেশের ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগ (ইউসিবিএল)
৮. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি
৯. গণসংহতি আন্দোলন
১০. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)
১১. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ (মাহবুব)
১২. গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি
১৩. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন
১৪. শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল
১৫. সিপিএমএলএম-বাংলাদেশ
১৬. পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি (সিসি/আনোয়ার কবির)
১৭. পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি (এমবিআরএম)
১৮. পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল)
১৯. পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (লাল পতাকা)
২০. পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল-জনযুদ্ধ)
২১. জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এনডিএফ)
২২. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি (আ স ম রব)

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২৩. বাংলাদেশ কমিউনিস্ট ইউনিয়ন
২৪. গণমুক্তি ইউনিয়ন
২৫. সমাজতান্ত্রিক মজদুর পার্টি
২৬. বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি
২৭. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ (ইনু)
২৮. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ (আম্বিয়া)
২৯. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল বাসদ (সৈয়দ রেজাউর রশিদ খান)
৩০. বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল এমএল (দিলীপ বড়ুয়া)
৩১. কমিউনিস্ট কেন্দ্র
৩২. গণ-আজাদী লীগ
৩৩. গণতান্ত্রিক মজদুর পার্টি (জাকির)
৩৪. গণতন্ত্রী পার্টি
৩৫. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-ন্যাপ (মোজাফফর)।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গ্রন্থ ও তথ্যপঞ্জি

গ্রন্থ

- সিরাজুল ইসলাম, প্রধান সম্পাদক কর্তৃক সম্পাদিত *বাংলাপিডিয়া* (খণ্ড-১), ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৪। ISBN 984-32-0590-1.
- *বাংলাপিডিয়া* (খণ্ড-৩), ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৪। ISBN 984-32-0591-1.
- *বাংলাপিডিয়া* (খণ্ড-৬), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৪। ISBN 984-32-0591-x.
- *বাংলাপিডিয়া* (খণ্ড-৭), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৪। ISBN 984-32-0590-1.
- *বাংলাপিডিয়া* (খণ্ড-৮), (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৪)। ISBN 984-32-0591-x.
- হারুনুর রশীদ : *রাজনীতিকোষ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা; জুলাই, ২০১৩। ISBN 984 410 125 5.
- কমরেড মুজফফর আহমদ : *আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি*, চারদিক প্রকাশনী, ঢাকা; ফেব্রুয়ারি, ২০১৩। ISBN 984-802-112-4.
- আবু সালেক সম্পাদিত চারু মজুমদার সমগ্র, *ঘাস ফুল নদী*, ঢাকা, ১৯৯৭। ISBN 984-8215-00-1.
- এবনে গোলাম সামাদ : *রচনা সংগ্রহ-২*, পরিলেখ প্রকাশনী, রাজশাহী, ২০২২। ISBN 978-984-96236-5-6.
- বদরুদ্দীন উমর : *একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙলাদেশের কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক ভূমিকা*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা; এপ্রিল, ১৯৯৬। ISBN 984-560-026-3.

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

- আমজাদ হোসেন : *বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল*, পড়ুয়া, ঢাকা: জুলাই, ১৯৯৬। ISBN 984-8141-08-10.
- *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের রূপরেখা*, পড়ুয়া, ঢাকা; মার্চ, ১৯৯৭। ISBN 984-8141-13-8.
- শৈলেন্দ্রনাথ সেন : *চন্দরনগর* (ফরাসি শাসন ও তার অবসান), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০২০। ISBN 978-93-89876-44-4.
- জগলুল আলম : *বাংলাদেশে বামপন্থি রাজনীতির গতিধারা* (১৯৪৮-৮৯), প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯০।
- খোকা রায় : *সংগ্রামের তিন দশক*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬।
- অমর ভট্টাচার্য : *লাল তমসুক* (নকশাল বাড়ি আন্দোলনের প্রামাণ্য তথ্য-সংকলন), অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা; মার্চ, ২০১৬। ISBN 978-984-91449-7-7.
- লে. কর্নেল (অব.) এম. এ. হামিদ পি.এস.সি : *তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা*, হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা; ফেব্রুয়ারি, ২০১৩। ISBN 978-984-8964-58-3.
- মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী (অব :) বীর বিক্রম : *এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য : স্বাধীনতার প্রথম দশক*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা; ফেব্রুয়ারি, ২০০০। ISBN 984 410 175 1.
- ড. মো: মাকসুদুর রহমান : *বঙ্গভঙ্গ ও বাঙালি ঐক্য*, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০১৪। ISBN 978-984-8794-24-1.
- ড. সুলতান মাহমুদ ও বিবি মরিয়ম : *রাজনীতি ও কূটনীতিকোষ*, আলেয়া বুক ডিপো, ঢাকা; ফেব্রুয়ারি, ২০১৫। ISBN 978 984 8934 86 9.
- সুপা সাদিয়া : *অগ্নিযুগ*, দ্যু প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৭। ISBN 978-984-92382-1-7.
- আশরাফ কায়সার : *বাংলাদেশে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা; ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫। ISBN 984 410 049 6.
- মহিউদ্দিন আহমদ : *জাসদের উত্থান পতন : অস্থির সময়ের রাজনীতি*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা; অক্টোবর, ২০১৪। ISBN 978 984 90747 5 5.
- *অপারেশন ভারতীয় হাইকমিশন*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা; মার্চ, ২০২১। ISBN 978 984 95400 5 2.

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

- *প্রতিনায়ক সিরাজুল আলম খান*, প্রথমা, ঢাকা, মার্চ ২০২১ । ISBN 978 984 95400 07.
- *লাল সন্ত্রাস : সিরাজ সিকদার ও সর্বহারা রাজনীতি*, বাতিঘর, ঢাকা; এপ্রিল, ২০২১ । ISBN 978-984-95336-1-0.
- আলতাফ পারভেজ : *মুজিব বাহিনী থেকে গণবাহিনী-ইতিহাসের পুনর্পাঠ*, ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা; ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ । ISBN 978-984-776-205-0.
- মোহা : রোকনুজ্জামান : *জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ও বাংলাদেশের রাজনীতি*, মীরা প্রকাশন, ঢাকা; ফেব্রুয়ারি, ২০১০ । ISBN 984-775-080-7.
- ড. মর্তুজা খালেদ : *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট ও বাম আন্দোলনের বিকাশধারা এবং রাজশাহী জেলা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা; জানুয়ারি, ২০২২। ISBN 984-70000-0449-9.
- রইসউদ্দিন আরিফ : *আন্ডারগ্রাউন্ড জীবন*, প্রকাশক : মুহাম্মদ মনীরুল আলম, ঢাকা; ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১ ।
- পংকজ চক্রবর্তী : *বীরকন্যা প্রীতিলতা*, শব্দাঙ্গন, ঢাকা; ফেব্রুয়ারি, ২০২১। ISBN 978-984-95642-9-3..
- সরদার আবদুর রহমান : বরেন্দ্র চরিতকোষ, হেরিটেজ রাজশাহী, ২০১৭। ISBN 978-984-34-5352-5.
- তারেক শামসুর রেহমান সম্পা. *রাজনীতির ৫০ বছর*, শোভাপ্রকাশ, ঢাকা; ফেব্রুয়ারি, ২০২১ । ISBN 978 984 94731 7 6.
- আনোয়ারুল আলম : *রক্ষীবাহিনীর সত্য-মিথ্যা*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা; অক্টোবর, ২০১৩ । ISBN 978 984 90253 9 9.
- নুরুল ইসলাম নাহিদ : *রাজনীতির সুস্থধারা পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম*, চারুলিপি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯ । ISBN 984 70187 0015 4.
- সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি বসু সম্পাদিত *সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা; ডিসেম্বর, ১৯৮৮ ।
- মো: রফিকুল হক আজাদ : *বৃহত্তর ময়মনসিংহের ইতিহাস*, নবরাগ প্রকাশনী, ঢাকা; ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ । ISBN 978-984-92447-8-3.

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অভিসন্দর্ভ

আব্দুল কুদ্দুস সিকদার : বাংলাদেশের বাম রাজনীতি : ১৯৪৭-১৯৭১, পিএইচ.ডি অভি : ২০১২-২০১৩, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মুর্শিদা বিন্‌তে রহমান : বাংলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ধারা (১৯৬৬-১৯৯১), পিএইচ.ডি অভি :, ২০১৫-১৬, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সংবাদপত্র/ম্যাগাজিন

- দৈনিক *ইনকিলাব*, ঢাকা; ১ জুন, ২০০৪।
- দৈনিক *সমকাল*, ঢাকা; ২৮ আগস্ট, ২০০৬।
- দৈনিক *নয়া দিগন্ত*, ঢাকা; ৩১ আগস্ট, ২০০৬।
- দৈনিক *নয়া দিগন্ত*, ঢাকা; ৭ নভেম্বর, ২০১৪।
- দৈনিক *নয়া দিগন্ত*, ঢাকা; ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২১।
- দৈনিক *যুগান্তর*, ঢাকা; ২৭ এপ্রিল, ২০০৩।
- *আজকালের খবর*, ২৩ নভেম্বও, ২০২১।
- দেশ, ২ আগস্ট ২০২২, কলকাতা, ভারত।
- *দেশব্রতী*, ৪ ডিসেম্বর, ১৯৬৯।
- *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ১৮ জুন, ১৯৯৩।
- বিবিসি বাংলা, ঢাকা; ৯ এপ্রিল, ২০১৯।

ওয়েবসাইট

- bn.wikipedia.org/wiki.
- www.bishleshon.com/5753/
- https://roar.media/bangla/main/book-movie/new-awareness-blooms-with-pather-dabi.
- http://saifspeakblog.blogspot.com/2017/09/blog-post_19.html-September 29, 2017.
- http://www.kholakagojbd.com/prints/25906.
- www.a2notespoint.com/2022/08/class-nine-history-chapter-4.
- https://educalingo.com/bn/dic-bn/santrasa.